নীহাররঞ্জন গুপ্ত

কিরীটী অম্‌নিবাস

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

কিরীটী অম্‌নিবাস

৮

মিত্র ও ঘোষ

কিরীটী অমনিবাস

শ্রীহীরক্ষ রায়

অষ্টম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ★ কলিকাতা-৭৩

প্রথম 'মিত্র ও ঘোষ' সংস্করণ, কার্তিক ১৩৯৭
পঞ্চম মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪০৯

—একশ কুড়ি টাকা—

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন ঃ আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রণ ঃ অটোটাইপ

KIRITI OMNIBUS VOL VIII
An anthology of detective fictions by Niharranjan Gupta
published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.,
10, Shyama Charan Dey Street, Calcutta-700073.

Price Rs. 120/-

ISBN : 81-7293-220-0

প্রথম প্রকাশ, [অমর সাহিত্য প্রকাশন] ভাদ্র ১৩৮৩

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও এসসি অফসেট, ৩০/২বি হরমোহন ঘোষ লেন,
কলকাতা-৮৫ হইতে সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা	প্রণয়কুমার কুন্ডু		ক
রিপু সংহার	...	...	১
নাগপাশ	...	...	৮৩
সেতারের সুর	...	...	১২৩
ওরা তিনজন	...		২৭৫
ছোরা	...	...	৩১৩

ভূমিকা

আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ডিটেকটিভ গল্পের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব পালন করা হয়েছিল, একথা অনেকেই বিস্মৃত হয়েছেন। তার অর্থ এই, ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসেই বস্তুত ডিটেকটিভ কাহিনীর জন্ম এবং সেটা ঘটেছিল এড্গার এ্যালান পো-র হাতে। ঐ বছরেই ফিলাডেলফিয়ার একটি জার্নালে, গ্রাহামস্ ম্যাগাজিনে, এড্গার অ্যালান পো-র সেই বিখ্যাত গল্পটি ছাপা হয়, যার নাম 'দি মার্ডারস্ ইন্ দি রু মর্গ'। এই গল্পটিকেই প্রথম ডিটেকটিভ গল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, কেউ কেউ প্রথম ছোট গল্প হিসেবেও গল্পটির উল্লেখ করেছেন। পো তারপর আরো দুটি এই ধরনের গল্প লিখলেন: 'দি মিস্ট্রি অফ্ মেরী রজেট' (১৮৪৩) এবং 'দি পার্লইন্ড্ লেটার' (১৮৪৫)। এই গল্পগুলি একত্রিত হয়ে 'টেল্স' নামে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় এই বছরেই। এইভাবে এড্গার এ্যালান পো য়ুরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাসে যে নতুন একটি রূপকল্প সৃষ্টি করলেন, তা আজ শতাব্দীর পরিসীমা অতিক্রম করে আরো অনেক দূরে এগিয়ে এসেছে।

ডিটেকটিভ গল্পের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে অবশ্য কেউ কেউ গথিক সাহিত্যের আতঙ্ক কাহিনীগুলির সঙ্গে এই ধরনের গল্পের যোগসূত্রের কথা বলেছেন, কেউ বলেছেন ভৌতিক গল্পের সঙ্গে যোগসূত্রের কথা। কেউ কেউ আরব্য রজনীর গল্পের মধ্যে এই ধরনের গল্পের উৎস সন্ধান করেছেন, কেউ উল্লেখ করেছেন প্রাচীনতম লোকযানের গল্পগুলির কথা। এমন কি ঈশপ, হেরোডেটাস্, সিসেরো, ভার্জিল, বোককাচিও, চসার প্রভৃতি লেখকের রচনার মধ্যে ডিটেকটিভ গল্পের সূত্র অন্বেষণ করেছেন। কিন্তু এই জাতীয় কাহিনীর, সাহিত্যের এই ধারাটির নেপথ্যবর্তী ইতিবৃত্ত যাই হোক না কেন, এড্গার এ্যালান পো-কেই এই জাতীয় সাহিত্যের রূপকল্পের মর্যাদা দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, এইচ্ ডগ্লাস টম্সনের মতে, গোড়াতেই পো-রচিত এই গল্পগুলির মধ্যে ডিটেকটিভ গল্পের একটা আদর্শ ও পরিণত রূপ সৃষ্টি হয়ে গেছে।

পো-এর অনুসরণে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এমিল গাব্যেরিয়ু আরো বড় আকারে গল্প লিখলেন এবং তাঁর হাতে আর এক দফায় ডিটেকটিভ গল্পের পরিব্যাপ্তি ঘটল। ইতিমধ্যেই ডিটেকটিভ গল্পের ধারাটি ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ইংলণ্ডে পেঁছেছিল। দেখতে দেখতে ইংরেজি সাহিত্যের বেশ কিছু লেখক এই জাতীয় রচনায় হাত দিলেন। ১৮৬৮ সালে উইল্কি কলিন্সের 'দি মুনস্টোন' বইটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে ডিটেকটিভ উপন্যাসের জন্ম হল, এবং ডিটেকটিভ উপন্যাসের ক্ষেত্রে বইটি স্মরণীয় গ্রন্থ। ইংরেজিতে লিখিত এই গ্রন্থটি প্রথম

পূর্ণায়ত ডিটেকটিভ উপন্যাস এবং ক্লাসিকও বটে। এই গ্রন্থে চিত্রিত সার্জেণ্ট কাফ-এর ভিতর দিয়েই গোয়েন্দা কাহিনীর চরিত্র সৃষ্টির একটা নিদর্শন পাওয়া গেল।

ইতিমধ্যে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রবার্ট পীল-এর চেষ্টায় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের জন্ম হয়েছিল। ১৮৪২ সালে এর মধ্যে একটা গোয়েন্দা বিভাগ খোলা হয়েছিল। এই ভাবে ডিটেকটিভ উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটা বাস্তব কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত হল। সমাজের অপরাধ দমনে দেখা দিল পেশাদার গোয়েন্দার দল। চার্লস ডিকেন্স তো সরাসরি তাঁর বন্ধু ইনস্পেক্টর ফিল্ডকে লক্ষ্য করে 'ব্লিক্ হাউস'-এ তাঁকে বাকেট চরিত্র রূপে চিত্রিত করলেন, বাস্তব জীবন থেকে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে সোজা চলে এল একটি চরিত্র। ডিকেন্স লিখতে শুরু করলেন 'দি মিস্ট্রি অফ্ এডুইন্ ড্রুড্', কিন্তু অকস্মাৎ মৃত্যু এসে সে লেখা অসমাপ্ত রেখে দিল। তবু সেই অসমাপ্ত গ্রন্থ যখন ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হল, তখন দেখা গেল—ডিটেকটিভ উপন্যাসের একটা নব দিগন্ত খুলে গেছে।

ওদিকে আনা ক্যাথারিন গ্রীণ নামে এক তরুণী আমেরিকান লেখিকা অপরাধমূলক ডিটেক্টিভ কাহিনী লিখে চলেছেন। ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত তাঁর বইটির নাম 'দি লিভেনওয়ার্থ কেস' বইটি একজন তরুণী লেখিকার রচনা হিসেবেই নয়, আমেরিকান ডিটেকটিভ উপন্যাস হিসেবেও বিখ্যাত। কিন্তু ১৮৮৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার লেখক ফার্গুস্ হিউম্-এর 'দি মিস্ট্রি অফ্ এ হ্যান্‌জম্ ক্যাব' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর আগের সমস্ত বইয়ের গৌরব ম্লান করে দিলে। অন্ততঃ জনপ্রিয়তার দিক থেকে, কেননা দেখা গেল—১৯৩২ সালে যখন তিনি মারা যান, তখন পাঁচ লক্ষ কপি বিক্রি হয়ে গেছে। অপরাধমূলক গল্পের বইয়ের এই ধরনের ব্যবসায়িক সাফল্য আর আগে দেখা যায়নি। এ বই হয়ত আজ পড়াই যায় না, কিন্তু বইটির একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে, তা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না।

এর পরেই ডিটেকটিভ উপন্যাসের ইতিহাসে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—শার্লক হোমসের আবির্ভাব। সম্ভবত এখনো পর্যন্ত অপরাজেয় নাম। আর্থার কোনান ডোয়েল, যিনি মূলত ছিলেন একজন চিকিৎসক কিন্তু তাতে পসার জমাতে না পেরে লেখায় হাত দিয়েছিলেন, সেই স্কট আইরিশ চিকিৎসকই শার্লক হোমসের লেখক। ১৮৮৭-তে তিনি লিখলেন, 'এ স্ট্যাডি ইন্ স্কারলেট্'। কিন্তু তেমন স্বীকৃতি পেলেন না। অতঃপর ১৮৯০ সালে প্রকাশিত হল 'দি সাইন্ অফ্ ফোর'। ইংলণ্ডে তেমন সাড়া না জাগলেও, আমেরিকার পাঠকসমাজের মন জয় করে নিল বইটি। তারপর প্রকাশিত হতে থাকল 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার্স্ অফ্ শার্লক হোমস্'। আর্থার কোনান ডোয়েলের নাম অচিরে চিরকালের মত স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে গেল। লেখক, যে কোন কারণেই হোক, হয়ত বা কাহিনীর ছেদ টানবার জন্য, শেষ পর্যন্ত শার্লক হোমস্‌কে নিহত করলেন। কিন্তু শার্লক হোমস্ পাঠকসমাজের মনের গভীরে এমন এক স্থায়ী আসন অধিকার করে নিয়েছিলেন যে তাঁর মৃত্যু কিছুতেই তারা স্বীকার করে নিতে পারল না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য

হয়েই লেখক শার্লককে আবার বাঁচিয়ে তুললেন, যেমনটি ঘটেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে। সেখানে অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র নিজে তাঁর নায়িকাকে বাঁচাবার জন্য জলে ঝাঁপ দেননি, দিয়েছিলেন দামোদর মুখোপাধ্যায়। কপালকুণ্ডলাকে গঙ্গাবক্ষ থেকে তুলতে গিয়ে লিখলেন 'মৃন্ময়ী'। সে যাই হোক, শার্লক হোমস্ সেই যে মরেও বেঁচে উঠলেন, তারপর থেকে তিনি বেঁচেই রয়েছেন পাঠকের মনে। আর্থার কোনান ডোয়েলের কথা বলতে গিয়ে ডরোথি এল্ সেয়ার্স বলেছেন যে, প্রায় চল্লিশ বছর আগে যে বলটি ছিল পো-র হাতে, অবশেষে তা ডোয়েলের মধ্যে এসে 'অ্যান্ আভালান্স্ অফ্ মিস্ট্রি ফিক্শন্-এ' পরিণত হল।

বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে ডিটেকটিভ গল্প ও উপন্যাস শুধু যে জনপ্রিয়তার চরমে পৌঁছেছে তাই নয়, সাহিত্যের এই ধারাটি অসংখ্য লেখকের দ্বারা অভাবনীয়রূপে পরিপুষ্ট হয়েছে। এই শতাব্দীতে শার্লক হোমসের অনুসরণে আর অস্টিন ফ্রিম্যানের 'দি রেড্ থাম্ব্ মার্ক' (১৯০৭)-এর ডকটর জন থর্নডাইক; এ. ই. ডবলিউ ম্যাশনের 'অ্যাট্ দি ভিলা রোজ' (১৯১০)-এর হানাউদ; জি. কে চেস্টারটনের 'দি ইনোসেন্স অফ্ ফাদার ব্রাউন' (১৯১১) গ্রন্থের ফাদার ব্রাউন প্রভৃতি চরিত্র রচিত হল। এসব চরিত্র পাঠকসমাজের খুবই পরিচিত। এর পর একে একে লিখেছেন ইংলণ্ড-আমেরিকার লেখকসমাজঃ আর্নেস্ট ব্রামা, জ্যাকুইস্ ফুট্রেল, মেরী রবার্ট রাইন্হার্ট, ক্যারোলিন্ ওয়েলস্, রিচার্ড হার্ডিং ডেভিস্ প্রমুখ লেখক। বিশেষভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী অসংখ্য লেখক সাহিত্যের এই বিশেষ ধারাটিকে পরিপুষ্ট করে তুলেছেন। এঁদের মধ্যে জে. এস. ফ্লেচার, ফ্রিম্যান উইলস্ ক্রফ্টস্-এর নাম লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

তবু যেন য়ুরোপীয় ডিটেকটিভ ফিক্শনের ইতিহাসে আর একটি অধ্যায় আসতে বাকি ছিল। সেই অধ্যায় আবির্ভূত হল ১৯২০ সালের পর থেকে আগাথা ক্রিস্টির লেখার ভিতর দিয়ে। এই বছরে প্রকাশিত তাঁর 'মিস্ট্রিয়াস্ অ্যাফেয়ার অ্যাট স্টাইলস্' পাঠকের মন জয় করে নিল এবং আগাথা ক্রিস্টির নামও স্মরণীয় লেখকদের নামের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হল। শেষের এই পর্বটিকে ডিটেকটিভ উপন্যাসের স্বর্ণযুগ বলা যায়। এড্গার অ্যালান পো থেকে শুরু করে ১৯২০ সাল পর্যন্ত ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে তেরশ'র মতো গ্রন্থ, কিন্তু তারপর ১৯২১ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে লিখিত হয়েছে আট হাজার ডিটেকটিভ ফিক্শন। এবং প্রায় সতেরোশো লেখক এই পর্বে লিখেছেন। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে ১৯২৯ সালে প্রকাশিত 'ক্রাইম্ অম্নিবাস্'-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

২

প্রাচীন রূপকথা, লোকগাথা অথবা ভৌতিক গল্পের মধ্যে যেমন য়ুরোপীয় ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাসের উৎস সন্ধান করা হয়েছে, তেমনি বাংলা সাহিত্যের

এই রূপকল্পটির সঙ্গে এগুলির যোগসূত্র থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু একথা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, ইংরেজি ডিটেকটিভ গল্প ও উপন্যাসের অনুসরণেই প্রত্যক্ষভাবে বাংলা ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাসের জন্ম। এবং উনিশ শতকের শেষের দিকেই আমরা বেশ কিছু লেখককে এই জাতীয় রচনায় হাত দিতে দেখছি। তারপর থেকে বাংলা সাহিত্যের এই ধারাটি পরিপুষ্ট হয়ে চলেছে খ্যাত-অখ্যাত অসংখ্য লোকের রচনায়।

সেকালে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় অনেকগুলি ডিটেকটিভ কাহিনী লিখেছিলেন। ১৮৮৭-তে তাঁর 'আদরিনী' প্রকাশিত হয়, এ ছাড়া 'তান্তিয়া ভীল' 'পাহাড়ে মেয়ে' 'ডিটেকটিভ পুলিস' দুখণ্ডে সমাপ্ত। ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৯-এর মধ্যে তিনি 'দারোগার দপ্তর' পর্যায়ের গল্পগুলি লেখেন। শরৎচন্দ্র সরকার ১৩০১ সাল থেকে 'গোয়েন্দা কাহিনী' শীর্ষক রচনা শুরু করেন। তখন বটতলায় যেসব বই ছাপা হত, তার মধ্যে এই জাতীয় বইয়ের সংখ্যা ছিল সব চেয়ে বেশী। সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য অনেকগুলি ডিটেকটিভ ও রোমাঞ্চকর বই লিখেছিলেন। বটতলার অন্যতম লেখক ছিলেন ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, তিনি ইংরেজি ডিটেকটিভ উপন্যাসের অনুসরণে অনেকগুলি বই লেখেন—জেলেখা বা যমের ফেরৎ, প্রতাপচাঁদ, প্রভাতকুমারী, প্রমোদা, ফিরোজা বিবি, বিপন্ন ব্যারিস্টার ইত্যাদি। ১৩১৫ সালে অম্বিকাচরণ গুপ্ত 'গোয়েন্দা গল্প' রচনা করেন। কিন্তু সেকালে গোয়েন্দা কাহিনীর যিনি ছিলেন একচ্ছত্র সম্রাট তিনি হচ্ছেন পাঁচকড়ি দে। তাঁর 'হত্যাকারী কে', 'নীলবসনা সুন্দরী' প্রভৃতি ডিটেকটিভ উপন্যাস একসময় পাঠকসমাজের হৃদয় লুঠ করে নিয়েছিল।

তারপর একে একে লিখেছেন দীনেন্দ্র রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকেরা।

বাংলা সাহিত্যের এই বিশিষ্ট ধারাটির সঙ্গে আরো একজনের নাম অবশ্য উল্লেখ্য—তিনি কিরীটী রায়ের জন্মদাতা নীহাররঞ্জন গুপ্ত। আর্থার কোনান ডোয়েলের মত তিনিও চিকিৎসক। কিরীটী রায় বাংলা সাহিত্যের শার্লক হোমস্। যদিও দুই গোয়েন্দার প্রকৃতি ও আচরণে বিস্তর তফাৎ।

সাম্প্রতিককালে এই আসরে আবির্ভূত হয়েছেন সত্যজিৎ রায়।

৩

য়ুরোপীয় ও বাংলা ডিটেক্‌টিভ ফিক্‌শনের এই ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি রাখলে দেখা যাবে, কথাসাহিত্যের মত সাহিত্যের এই ধারাটিরও একটি বিস্তৃত ভূমিকা রয়েছে। শুধু তাই নয়, তার একটি বিশেষ চরিত্রও রয়েছে যা ডিটেকটিভ ফিক্‌শনের মৌল প্রকৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই রূপকল্পের উদ্ভব এড্‌গার এ্যালান পো-র রচনায়, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই জাতীয় রচনার পিছনে বিরাজ করছে মানুষের আদিম কিছু প্রবৃত্তি ও প্রবণতা। মানুষের অন্যান্য প্রবৃত্তির মধ্যে ভয়, ঘৃণা, হিংসা, প্রতিহিংসা সম্ভবত সব চেয়ে বেশী সক্রিয়। সমাজজীবনের অনুশাসনে মানুষ এইসব প্রবৃত্তি প্রশমিত করতে চেষ্টা করলেও অন্তরে এগুলি সুপ্ত অবস্থায় থেকেই যায়। কিন্তু তবু ঘটনার আবর্তে, পরিবেশের চাপে মানুষের অন্তরের নগ্নতা মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে। সেই মুহূর্তে মানুষ পশুর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠে। এই প্রবৃত্তিগুলি ঢেকে রাখার চেষ্টাই মানবসভ্যতার মূল কথা; মানুষ তার শিক্ষার ভিতর দিয়ে একদিকে যেমন সংস্কৃত হতে চেষ্টা করে, অন্যদিকে তেমনি পশু-সুলভ নগ্ন প্রবৃত্তিগুলি ঢেকে রাখতেও যত্নবান হয়। তথাপি মানুষ এক এক সময় এমন সব কাজ করে বসে—যা সমাজের চোখে অপরাধ বলে গণ্য হয়। এইসব ভয়াবহ ঘটনার ব্যাপ্তি যাতে না ঘটে, তার জন্যই আইনের সৃষ্টি। বলা বাহুল্য, তবু মানুষ অপরাধ করে, পাপ করে। তন্ত্রশাস্ত্রে বলে, মানুষ তার জন্মমুহূর্তে যোনিগহ্বর থেকে বেরিয়ে আসে বলেই যোনির প্রতি জন্মগত একটা আকর্ষণ থেকে যায়। তেমনি ভয় ঘৃণা ইত্যাদি নগ্ন প্রবৃত্তিগুলির অধিকারী বলেই, মানুষ যেমন অপরাধ করে বসে, তেমনি সে ভয়াবহ অপরাধমূলক কাহিনির প্রতি একটা গভীর আকর্ষণ অনুভব করে, এই ধরনের ঘটনার প্রতি তার একটা জন্মগত আকর্ষণ থেকে যায়, এই ধরনের কাহিনী শুনতে সে ভালবাসে। মানুষের এই আদিম প্রবৃত্তিই সাহিত্যের ভিতর দিয়ে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে থাকে এবং এই আদিম প্রকৃতিই বিশেষভাবে ডিটেকটিভ ফিক্‌শনের মৌল প্রেরণা ও উপাদান।

কিন্তু একালে আধুনিককালে কেন যে বিশেষভাবে এই কাহিনী ও রূপ-কল্পের উদ্ভব, তার কারণ কী? তার জনপ্রিয়তারই বা কি কারণ হতে পারে? তার কারণ হয়ত এই যে, একালে আমরা বৈজ্ঞানিক চেতনার সঙ্গে বিশ্লেষণধর্মী মনোবৃত্তির অধিকারী হয়েছি। প্রাচীনকালে যখন একজন মানুষ কোন অপরাধ করত, তা সে যত ছোট অথবা বড় হোক না কেন, সমাজ তাকে নির্বিচারে শাস্তি দিত এবং সেখানেই তার কর্তব্য দায়িত্ব শেষ হত। কিন্তু একালে, মনোবিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মানুষের জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সমস্ত ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চাই, সেই বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে জানতে চাই—মানুষ কেন অপরাধ করে, কোন অবস্থায় অপরাধ করে। একালের এই জিজ্ঞাসা থেকেই সম্ভবত ডিটেকটিভ ফিক্‌শনের জন্ম। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, কল্পিত কাহিনী হওয়া সত্ত্বেও ডিটেকটিভ উপন্যাসের ভিতর দিয়ে আধুনিক কালের মানুষের একটি মৌল প্রশ্নই বার বার বিচিত্রভাবে রূপায়িত হয়েছে। লেখক তাঁর কাহিনীর জাল বুনতে গিয়ে যেভাবেই অগ্রসর হোন না কেন, মূলতঃ তাঁর সামনে এই প্রশ্নই বিরাজিত থাকে। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে ডিটেকটিভ গল্প উপন্যাস নিছক কিশোর ও শিশুপাঠ্য মনে হলেও, বস্তুত এই সাহিত্য হালকা রচনা নয়। এই সাহিত্যের ভিতর দিয়ে আসলে মানুষের আদিম প্রবৃত্তির

আধুনিক রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে ডিটেকটিভ ফিক্‌শনে মানুষের জিঘাংসা, রহস্যময় ও অপরাধমূলক ঘটনার সমাবেশ থাকলেও এই সাহিত্য বাস্তবিকপক্ষে মানুষের আদিম প্রবৃত্তির আধুনিক বাক্‌চিত্র।

৪

'কিরীটী অমনিবাস'-এর অষ্টম খণ্ডটির দিকে তাকালে এই সত্যই যেন নতুন করে অনুভব করা যায়। এই সংকলনে রয়েছে পূর্ণায়ত তিনটি ডিটেকটিভ উপন্যাস এবং দুটি গল্প। এগুলি যথাক্রমে ঃ রিপুসংহার, নাগপাশ, সেতারের সুর এবং ওরা তিনজন ও ছোরা। সাধারণভাবে অন্যান্য ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাসের মত এগুলির কাহিনীও এক-একটি রহস্যময় হত্যাকে কেন্দ্র করেই বিধৃত এবং বর্তমান বাংলা সাহিত্যের প্রিয়তম গোয়েন্দা কিরীটী রায় আগের কাহিনীগুলির মতই এই সব কাহিনীর মঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে হত্যার রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ এবং নাটকীয় মুহূর্তের জমজমাট আবহাওয়ার মধ্যে কাহিনীগুলি নিঃসন্দেহে রোমাঞ্চকর, আকর্ষণীয়। কিন্তু মনে হয়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত এইসব কাহিনীর ভিতর দিয়ে আরো একটা গভীর কথা বলতে চেয়েছেন এবং ডিটেকটিভ ফিক্‌শনের লেখক হিসেবে এখানেই তাঁর অনন্যতা। যেন নিছক একটা রোমাঞ্চকর গল্প শোনানোই তাঁর উদ্দেশ্য নয়, গল্পের ভিতর দিয়ে তিনি একালের জীবনযন্ত্রণার, কিছু জীবনজিজ্ঞাসার পরিচয় দেবার জন্য আগ্রহী। সেইজন্যই এইসব কাহিনীর অন্তরালে তাঁর এমন একটা গভীর সহানুভূতিশীল মনের পরিচয় পাই যা তাঁকে রোমাঞ্চকর গল্পলেখকের অনেক ঊর্ধ্বে তুলে দিয়েছে।

'রিপুসংহার'-এর কথাই ধরা যাক। এই কাহিনীর নায়ক আশু বিশ্বাস ধনী, বিশেষ রাজনৈতিক দলের নেপথ্যবর্তী নেতা। শত্রুঘ্নকে সে একসময় নিজের কাছে স্থান দিল তার কাজের সহায়তার জন্য। কিন্তু সে জানত না শত্রুঘ্ন তারই আত্মজ। তারপর ঘটনাচক্রে সে নিহত হল। সেই মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন করতে এসে কিরীটী যখন শত্রুঘ্ন ও আরতির জীবনের কাহিনী জানতে পারল, তখন হত্যাকারিণী আরতি ও শত্রুঘ্ন তথা প্রফুল্ল তার কাছে অপাপবিদ্ধ মনে হল। আশু বিশ্বাসের মৃত্যু এই কাহিনীর কেন্দ্রীয় ঘটনা হলেও তার মৃত্যু মনকে স্পর্শ করে না, বরং আরতি-প্রফুল্লর প্রতি গভীর সহানুভূতি জাগে। মনে হয় লেখক যেন হত্যা ও হত্যাকারীর প্রশ্নটি অন্য চোখে দেখছেন।

'নাগপাশ'-এর কাহিনীর মূলেও রয়েছে একটি হত্যাকাণ্ড, অরবিন্দ চৌধুরীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই সমগ্র কাহিনী দানা বেঁধেছে। এই কাহিনীর মধ্যে একে একে

এসে দাঁড়ায় মলয়, বকুল, মালতী এবং ধীরেন। কিরীটীর অন্বেষণে যখন প্রকৃত হত্যাকারীর পরিচয় জানা গেল, তখন তার প্রতি পাঠকের ঘৃণা জাগে না ; বরং হত্যাকারী হওয়া সত্ত্বেও হতভাগ্য ধীরেনের প্রতি একটা অপরিসীম করুণা ও সমবেদনা জাগে। যে আত্মগ্লানিতে 'রিপুসংহারে'র প্রফুল্ল দগ্ধ হয়েছে, সেই একই আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হয়েছে ধীরেন। শেষ পর্যন্ত অবৈধ সন্তানের হাতে অবৈধ জন্মদাতার মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু এখানেও লেখক মানবজীবনের অন্তরালবর্তী একটি মৌলিক ট্র্যাজেডিরই ছবি এঁকেছেন।

তেমনি 'সেতারের সুর'। এ কাহিনীর মর্মমূলে বাসবী এবং তার পাঁচ বন্ধু। তাদেরই একজনকে যখন সে জীবনসঙ্গী নির্বাচন করে বসল তখন অন্যান্যরা হতাশ হল। তাদেরই একজন রঞ্জন সে কিছুতেই ব্রজেনের কাছে তার পরাজয়কে মেনে নিতে পারল না। সেই সূত্র ধরেই নেমে এল বাসবীর মৃত্যু। কিরীটী যখন সেই মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন করল, তখন দেখা গেল আসলে মানুষের নগ্ন আদিম প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করেছে বটে, কিন্তু পরিবেশও তার জন্য অনেকাংশে দায়ী। এই গ্রন্থেও একটি ট্র্যাজিক প্রেমের ছবি অঙ্কিত হয়েছে।

'ওরা তিনজন' গল্পটিও একটি প্রেমের কাহিনী। প্রমীলার মৃত্যুই এ কাহিনীর কেন্দ্রভূমি। প্রিয়রঞ্জন, নির্মল ও শিবেন—এরা তিনজনই ভালবাসে প্রমীলাকে। প্রেমের অবমাননায় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে শিবেনের হাতেই মৃত্যু ঘটে প্রমীলার। কিরীটী যখন শেষ পর্যন্ত রহস্য উদ্ঘাটন করল, তখন আত্মহত্যা ছাড়া শিবেনের আর কোন উপায় রইল না। কিন্তু মৃত্যুর আগে সে জেনে গেল —প্রমীলা তাকেই ভালবাসত।

এদিক থেকে 'ছোরা' গল্পটির স্বাদ একটু আলাদা। এই গল্পের নায়ক সমীর, যে শেষ পর্যন্ত পরিবেশের চাপে ছিনতাইকেই জীবিকার্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু নিয়তির পরিহাস এমনিই—ছিনতাই করতে গিয়ে তারই হাতে তার বোন লতার মৃত্যু ঘটল। লতা তাদের পরিবারের অন্নসংস্থানের জন্য জীবনের পঙ্কিল পথ বেছে নিয়েছিল। কিন্তু কে জানত, মিথুনলগ্ন অবস্থায় তার নিজের দাদা তার সামনে এসে দাঁড়াবে। এবং বিনিময়ে মৃত্যু দিয়ে তার মূল্য দিতে হবে!

বস্তুতঃ এই সব কাহিনীর আয়োজন ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাসের উপযোগী: হত্যা, হত্যাকারীর তদন্ত, হত্যাকারীর রহস্যোদ্ঘাটন—এ সবই আছে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে লেখক যেভাবে কাহিনীর বিন্যাস করেছেন, তাতে নাটকীয় মুহূর্তের মুখোমুখি হয়ে রুদ্ধশ্বাসে পাঠক রোমাঞ্চকর অনুভূতি লাভ করেন। কিন্তু তবু যেন মনে হয়, এই সব কাহিনী যেন নিছক ক্রাইম স্টোরি বা অপরাধমূলক কাহিনী নয়। এই কাহিনীগুলির প্রত্যেকটির এমন এক বাস্তব ভিত্তি আছে, যা এগুলিকে আমাদের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি করে তুলেছে। এখানে গতানুগতিক ভাবে হত্যার অবতারণা আছে, কিন্তু সেই সব হত্যার পিছনে যে সব কারণ নিহিত, মানবজীবনের যে সব ট্র্যাজেডি নিহিত, লেখক তাও দেখিয়েছেন।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার করলে এই সব হত্যার হয়ত একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় এবং তখন হত্যাকারীকে আর ঘৃণ্য মনে হয় না। আধুনিক উপন্যাসের মতই এই সব কাহিনীর মূলে নিহিত আছে মানুষের জীবনের সেই সব অসহায় মুহূর্ত, সেই সব বেদনার ইতিহাস—যার জন্য পাঠক গভীর সহানুভূতি বোধ না করে পারে না। মনে হয় অসহায় মানুষের জন্য এই সমবেদনা, একটা গভীর মানবতাবোধই এই সব রচনার মৌল প্রেরণা এবং এখানেই লেখক হিসেবে নীহাররঞ্জন গুপ্তের অনন্যতা। এখানেই কিরীটী চরিত্রের বিশিষ্টতা। এবং এইভাবেই নীহাররঞ্জন গুপ্ত গতানুগতিক রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ উপন্যাসের আদর্শ থেকে সরে গিয়ে যথার্থ ঔপন্যাসিকের ভূমিকা নিয়েছেন। এই সব কাহিনী তাই কল্পিত কাহিনী বলে মনে হয় না, মনে হয়—এ কাহিনী আমাদেরই জীবনকাহিনী, এইসব নরনারী সংসারের আর পাঁচজন নরনারীর মতই সুখেদুঃখে, আনন্দ বেদনায়, পাপেপুণ্যে সৃষ্ট।

এদিক থেকে, বাংলা ডিটেকটিভ ফিক্‌শনের ইতিহাসে 'কিরীটী অমনিবাসে'র একটি উল্লেখযোগ্য অনন্যসাধারণ ভূমিকা রয়েছে। এই অমনিবাসে চড়ে যেতে যেতে যাদের দেখা পাই, তারা নিদ্রাহরণকারী কল্পিত কাহিনীর কাল্পনিক কোন চরিত্র নয়, তারা আমাদেরই প্রতিবেশী, তারা আমাদের মতোই সুখেদুঃখে পাপেপুণ্যে গড়া মানুষ।

শ্রীপ্রণয়কুমার কুণ্ডু

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রিপু সংহার

॥ এক ॥

তাহলে এই আপনার শেষ কথা ?

আশু বিশ্বাস সন্তোষ সিংহের মুখের দিকে তাকালেনও না।

বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার গদিমোড়া ঘুরন্ত চেয়ারটার উপর গা-টা ঢেলে দিয়ে বসে চুরোট মুখে সামনে খোলা একটা ফাইলের উপর নিবিষ্ট মনে কি যেন দেখতে লাগলেন।

সুন্দর আধুনিক রুচিসম্মতভাবে ঘরটি সাজানো। টেবিলের উপরে দু'পাশে দুটি ফোন—কাগজপত্র ইতস্তত ছড়ানো। একটা কলমদানীতে গোটাচারেক পার্কার সেফার্স ও সোয়ান পেন।

টেবিলের উপরে সুদৃশ্য টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। তারই খানিকটা আলো আশু বিশ্বাসের মুখের উপরে এসে পড়েছে। বয়স পঞ্চান্ন ও ষাটের মাঝামাঝি হবে। বেশ গোলগাল চেহারা—পরনে ফিনফিনে তাঁতের ধুতি, গায়ে গরম পাঞ্জাবি। তার উপর জহর কোট। কোটের বোতামগুলো খোলা। মাথার দু'-পাশে সামান্য টাক পড়েছে। রগের দু'পাশে চুলে পাক ধরেছে। বেশ সাদা। হাতে ধরা একটা লাল-নীল পেনসিল।

সন্তোষ তার শেষ কথাটা উচ্চারণ করবার পরও কিন্তু ঘর থেকে গেল না।

চেয়ে রয়েছে তখনো হাত পাঁচেক দূরে চেয়ারে উপবিষ্ট আশু বিশ্বাসের মুখের দিকে। মনে হয় মানুষের মুখ নয়—মুখটা যেন অনেকটা সিংহের মুখের মত। গোলালো ও চৌকোর সংমিশ্রণ। পুরুষ্টু একজোড়া গোঁফ। চোখে দামী সোনার ফ্রেমের চশমা।

সন্তোষ তার শেষ কথাটা যা মুহূর্তপূর্বে বলেছিল সেটাই আবার পুনরুচ্চারণ করল, তাহলে এই আপনার শেষ কথা আশুবাবু ?

বিরক্ত করো না আর সন্তোষ। আমার যা বলবার বলেছি। আশু বিশ্বাস মুখ না তুলেই কথাগুলো বললেন।

সন্তোষ সিংহ যেন একটু থমকে রইল, তারপর পূর্ববৎ শান্ত গলায় বললে, আর একবার বোধ হয় ভেবে দেখলে ভাল করতেন আশুবাবু। কারণ—

কারণ ? আশু বিশ্বাস এতক্ষণে মুখ তুলে তাকালেন।

দু'চোখে যেন জ্বলন্ত দৃষ্টি।

রোমশ ভ্রূর নীচে চোখের মণি দুটো যেন হিংস্র শ্বাপদের চোখের মত।

কি হে থামলে কেন, বল ! আশু বিশ্বাস কথাটা বলে সন্তোষের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কারণ শেষে হয়ত আপনাকে পস্তাতে হবে—

ভয় দেখাচ্ছ সন্তোষবাবু ?

না।

তবে ?

শুধু সময় থাকতে—

সাবধান করে দিচ্ছ ?

মনে করুন তাই, যদি সেইরকম ভেবে থাকেন—

দেখ হে ছোকরা, তোমাদের মত ইয়ং ফড়েকে অনেক আমি দেখেছি এ জীবনে। আশু বিশ্বাসকে তুমি চিনলে তার সামনে দাঁড়িয়ে ঐ ধরনের বাচালতা প্রকাশ করবার নিশ্চয়ই সাহস হত না ! তারপরই একটু থেমে বললেন, চলে যাবে, না দারোয়ান ডাকতে হবে ?

দারোয়ান আপনার আছে আশুবাবু, তা আমি জানি। তাছাড়া আপনার এখানে থাকবার জন্যও আমি আসিনি। চলে যাচ্ছি তবে যাবার আগে বলে যাচ্ছি, খুব শীঘ্রই আবার আমাদের দেখা হবে—

সন্তোষ সিংহের কথাটা শেষ হবার আগেই আশু বিশ্বাসের একান্ত সচিব শত্রুঘ্ন ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করছিল। তার কানে সন্তোষ সিংহের শেষের সব কথাগুলোই প্রবেশ করেছিল।

সন্তোষ সিংহ কথাগুলো বলে আর দাঁড়াল না, গটমট করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

অবরুদ্ধ একটা চাপা আক্রোশে যেন আশু বিশ্বাস ফেটে পড়লেন, লোফার—একটা street-dog !

আশু বিশ্বাস তাঁর একান্ত সচিবের দিকেই তাকিয়ে রইলেন কথাগুলো বলে।

শত্রুঘ্ন এগিয়ে এলো আরো দু'পা।

শত্রুঘ্নর বয়স ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যে। রোগা লিকলিকে চেহারা। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। নাকটা খাড়া হয়ে সামনের দিকে টিয়াপাখির ঠোঁটের মত যেন একটু বেঁকে আছে। উপরের ঠোঁট-টার মাঝামাঝি কাটা—জন্ম থেকেই 'হেয়ারলিপ'। ছোটবেলায় অপারেশন করলে হয়ত ভাল হয়ে যেত কিন্তু অপারেশন করা আর শত্রুঘ্নর হয়ে ওঠেনি। কেন যে হয়নি সে আর এক ইতিহাস। বর্তমান কাহিনীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। কাটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সামনের উপরের দুটো পাটির দাঁত স্পষ্ট দেখা যায়, যেন সামান্য ঠেলে বের হয়ে আছে সর্বক্ষণই। বাঁ চোখটা সামান্য টেরা। পরনে লংস ও গলাবন্ধ কোট।

আশু বিশ্বাসের ওখানে চাকরি নেবার পর আশু বিশ্বাস অনেকদিন বলেছেন, ঠোঁটটা রিপেয়ার করিয়ে নাও প্লাস্টিক সার্জারি করে শত্রুঘ্ন !

কি হবে আর স্যার এ বয়সে হাঙ্গামা করে ? শত্রুঘ্ন খুব শান্ত গলায় জবাব দিয়েছে।

হাঙ্গামা কি ? বিশ্রী দেখায় ! আয়নায় মুখ দেখ তো ?

শত্রুঘ্ন জবাব দেয়নি।

আশু বিশ্বাস বলেছেন, এখন না হলেও বিয়ের পর হয়ত দেখবে—

আশু বিশ্বাসকে যেন কতকটা থামিয়ে দিয়েই শত্রুঘ্ন জবাব দিয়েছিল, আমার জীবনে বোধ হয় ঐ বিশেষ জাতটার কোন প্রয়োজন হবে না।

বল কি হে! তুমি তো দেখছি ভীষণ নারীবিদ্বেষী! আশু বিশ্বাস বলেছেন।

শত্রুঘ্ন জবাব দেয়নি কোন।

পার্টির অফিসে বছর তিনেক আগে একসময় পরিচয় হয় শত্রুঘ্নর সঙ্গে আশু বিশ্বাসের। এম. এ. পর্যন্ত পড়েছে ছেলেটি—কিন্তু কোথাও চাকরিবাকরির কোনো সুবিধা না করতে পেরে আশু বিশ্বাসের পার্টিতে এসে কেমন করে না-জানি ঢুকেছিল।

পার্টির একটা কাগজ ছিল—সাপ্তাহিক—বজ্রধ্বনি। তাও নিয়মিত কখনো বেরুত না, ইলেকশনের মুখোমুখি ছ-সাত মাস নিয়মিত বেরুত—তারপর মধ্যে মধ্যে কখনও-সখনও।

পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী অনিমেষ পাল ওকে যোগাড় করেছিল। এবং লেখায় বেশ হাত আছে ও কিছু পড়াশুনাও আছে পলিটিক্সে তাই অনিমেষ যদিও নিজে ছিল বজ্রধ্বনির সম্পাদক, নেপথ্যে সব ভার ছিল অর্থাৎ সম্পাদনা ও গরম গরম সব প্রবন্ধ লেখা ঐ শত্রুঘ্নর উপরই।

এক কথায় শত্রুঘ্নই কাগজটা চালাত।

বছর তিনেক আগে ইলেকশনের মুখে একদিন পার্টি অফিসে গিয়ে আশু বিশ্বাস অনিমেষকে বললেন, এ সপ্তাহের সম্পাদকীয়টা বেশ ঝাঁজালো হয়েছে তো হে অনিমেষবাবু—বেড়ে লিখেছ!

ভাল লেগেছে আপনার? অনিমেষ শুধায় গদগদ হয়ে।

ভাল মানে, একেবারে যাকে বলে টু দি পয়েন্ট! আমাদের অপনেন্ট পার্টির ব্যাপারটা খুব ট্যাক্টফুলি প্রচার করা হয়েছে। তোমার কলমে যে এত জোর আছে তা জানতাম না হে অনিমেষবাবু!

অনিমেষ লোকটি অত্যন্ত সৎপ্রকৃতির। সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, ওটা কিন্তু আমার লেখা নয় আশুবাবু।

বল কি! তবে কার?

একটি নতুন ছেলের।

নতুন ছেলে! কে বল তো?

মাস তিন-চার পার্টিতে এসে যোগ দিয়েছে।

বটে! নামটা কি?

শত্রুঘ্ন—

শত্রুঘ্ন কি—মানে পদবী কি?

ওর নাকি কোন পদবী নেই।

কি রকম!

তাই তো বলে।

হুঁ, তা লেখাপড়া কতদূর করেছে?

শুনেছি এম. এ. পর্যন্ত পড়ে পরীক্ষা দেয়নি।

আছে নাকি অফিসে এখন ছেলেটি ?

নীচের প্রেস-ঘরে বোধ হয় আছে—ঐখানেই তো থাকে—

ডাক তো একবার !

অনিমেষ বেল বাজিয়ে বেয়ারা গোপালকে বলে, নীচের প্রেস থেকে শত্রুঘ্নকে ডেকে আনতে।

একটু পরেই শত্রুঘ্ন এসে ঘরে ঢুকল।

সাধারণ একটা ধুতি, ময়লা একটা ছিটের শার্ট গায়ে, পায়ে চপ্পল। এক চোখ ট্যারা—হেয়ারলিপ। শত্রুঘ্নর মুখের দিকে তাকিয়েই কিন্তু কেমন যেন আশু বিশ্বাসের মনের মধ্যে একটা বিতৃষ্ণার উদয় হয়েছিল। রোগা লিকলিকে, ঠোঁটটা কাটা, বাঁ চোখটা ট্যারা। কেমন যেন আশু বিশ্বাসের মনটা বিরূপ হয়ে উঠেছিল প্রথম দৃষ্টিতেই শত্রুঘ্নর উপরে।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে যায় তাঁর, ঐদিনকার লেখা সম্পাদকীয়টা। জোরালো আগুনের মত ভাষা যেমন, তেমনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অতীব চাতুর্যের সঙ্গে বিপক্ষের সব ত্রুটিগুলো চমৎকার ভাবে ছত্রে ছত্রে আর্টিকেলটার মধ্যে যেন হুল ফোটাচ্ছে।

কি নাম তোমার হে ?

আজ্ঞে শত্রুঘ্ন—

পদবী কি ?

পদবী কিছু নেই।

কেন বল তো ?

কারণ কিছু নেই, এমনিই। শত্রুঘ্ন বললে।

গলাটা কিন্তু ভারী কোমল ও একটু মেয়েলী ধরনের।

তুমি এম. এ. পর্যন্ত পড়েছ ?

পড়েছিলাম—

কোন্ ইউনিভার্সিটি ?

কলকাতায়।

তা পরীক্ষাটা দিলে না কেন ?

ইচ্ছা হল না তাই দিলাম না।

এর আগে কোথায় চাকরি করেছ ?

পাটনায়।

পাটনাতেই ছিলে তাহলে কিছুদিন ?

ছিলাম।

কোথায় ?

একটা মেসে থাকতাম।

কি সাবজেক্টে এম. এ. পড়েছিলে ?

ইংরাজীতে—

পলিটিক্সে ইনটারেস্‌টেড্‌ ?

শত্রুঘ্ন কোন জবাব দেয়নি।

বাড়িতে কে কে আছে ?

বাড়িও নেই, কেউ নেইও।

একা ?

হ্যাঁ, চোদ্দ বছর পর্যন্ত অনাথ আশ্রমে পালিত হই।

বল কি !

কাটা ঠোঁটের ফাঁকে একটু দেঁতো হাসি হেসেছিল শত্রুঘ্ন, জবাবে কোন কথা না বলে।

এখানে থাক কোথায় ?

ঐ প্রেসের মধ্যেই একপাশে পড়ে থাকি।

হুঁ।

কি যেন ভাবতে লাগলেন কিছুক্ষণ আশু বিশ্বাস, তারপর হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন এবং বললেন অনিমেষকে, চলি হে অনিমেষবাবু—

পরশু মিটিং আছে পার্টির—আসছেন তো ? অনিমেষ শুধায়।

আসব।

শত্রুঘ্নর দিকে আর তাকালেনও না আশু বিশ্বাস, ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

কিন্তু না তাকালেও শত্রুঘ্নর কথাটাই ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। সারাটা দিনের নানান কাজের মধ্যেও বার বার শত্রুঘ্নর কথাই মনে পড়তে লাগল। সামান্য দু'চারটে কথাতেই বুঝতে পরেছিলেন আশু বিশ্বাস, বুদ্ধি ছেলেটির তীক্ষ্ণ এবং পড়াশুনাও আছে। তবে তলোয়ারটা একটু বাঁকা হলেও ধারাল। নিজের আয়ত্তে থাকলে কাজে লাগানো যাবে। রাত্রেই মনস্থির করে ফেললেন আশু বিশ্বাস শত্রুঘ্ন সম্পর্কে। এবং পরের দিনই আশু বিশ্বাসের নিউ সি. আই. টি. স্কীমের সাততলা বিরাট বাড়ির দোতলার অফিসঘরে বেলা দশটা নাগাদ শত্রুঘ্নকে ঢুকতে দেখা গেল।

আশু বিশ্বাস কেবল একজন রাজনৈতিক নেতাই নন—স্বনামে বেনামে নানা ধরনের ব্যবসার মালিক। নানা কারবার।

নিজে অ্যাসেমব্লীতে কখনও দাঁড়াননি। দলের লোকদের দাঁড় করিয়ে অ্যাসেমব্লীর রশিটা নেপথ্যে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে ইচ্ছামত তাঁর খেলা খেলেন। এবং বলাই বাহুল্য, পার্টির যাবতীয় ব্যয়ভার আশু বিশ্বাসই সানন্দে বহন করে থাকেন।

দলের লোকেরা কত সময় বলেছে, এবারে ইলেকশনে আপনি দাঁড়ান না স্যার—

না হে, ওসব ঝামেলা আমার পোষাবে না। তা ছাড়া তোমাদের দাঁড়ানো যা আমার দাঁড়ানোও তো তাই—তোমরা কি আর আমাকে ফেলে দেবে !

কি যে বলেন স্যার—

দেখো হে, সেরকম মতিগতি হলে আগে থাকতেই একটু ওয়ার্নিং দিয়ে দিও—

মানে মানে সরে পড়ব। হাসতে হাসতে বলেছেন আশু বিশ্বাস।

মনে মনে যদিও আশু বিশ্বাসের কিছুটা ভয় ছিল, কারণ তিনি জানতেন রাজনীতির ব্যাপারটা এমনই জটিল যে কখন কোন্ দিকে অকস্মাৎ মোড় নেয়, কখন কোন্ ঝুলি থেকে সাপ বের হয়ে ছোবল দেবে তা বুঝি চিন্তারও অতীত।

অবিশ্যি অতীব ধূর্ত আশু বিশ্বাস সর্বদা চারিদিকে আটঘাট বেঁধেই কাজ করতেন। তবু ভয় একটা তাঁর ছিল বৈকি।

শত্রুঘ্নকে দেখে কেন না-জানি মনে হয়েছিল পার্টি অফিস থেকে বাড়ি ফিরবার পর লোকটার কথা চিন্তা করতে করতে অবচেতন মনে, লোকটাকে যদি ট্যাকল করতে পারেন ঠিকমতো তাহলে ওকে দিয়েই তিনি অনেক কিছুই করাতে পারবেন।

কথাটা মনে হতেই পরের দিন সকালে অনিমেষকে টেলিফোন করেছিলেন শত্রুঘ্নকে পাঠিয়ে দেবার জন্য।

বেশ বড় সাইজের ঘরটি। মেঝেতে পুরু কার্পেট বিছানো, বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল, অনেক চেয়ার সোফা সেটি, দুটো ফোন।

আশু বিশ্বাস ঐদিনকার সংবাদপত্রগুলো উলটে-পালটে দেখছিলেন।

মাস পাঁচেকের মধ্যে ইলেকশন। সংবাদপত্রগুলো বেশ গরম গরম খবর ছাপাচ্ছে প্রত্যহ।

॥ দুই ॥

পদশব্দে মুখ তুলে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে নজর পড়ল শত্রুঘ্নের উপরে।

দরজার বাইরে বেয়ারা সনাতনকে বলাই ছিল শত্রুঘ্নর চেহারার ডেসক্রিপশন দিয়ে যে, ঐ ধরনের কোন লোক শত্রুঘ্ন নাম বললে ঘরে যেন পাঠিয়ে দেয়।

সনাতন তাই শত্রুঘ্নকে যেতে বলেছিল সোজা ঘরের মধ্যে।

আমাকে ডেকেছেন স্যার?

কে শত্রুঘ্নবাবু! এসো, এসো—তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

কোন প্রয়োজন ছিল কি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ বস না ঐ চেয়ারটায়।

শত্রুঘ্ন কিন্তু বসেনি। দাঁড়িয়েই ছিল আগাগোড়া। কেবল ঐ দিনটি কেন, পরবর্তীকালেও কখনো সে আশু বিশ্বাসের সামনে বসেনি।

বলুন স্যার কি বলছিলেন?

দেখ তোমাকে আমি আমার একান্ত সচিব—বুঝলে, পারসোন্যাল সেক্রেটারি নিযুক্ত করতে চাই, আর আজ থেকেই।

পারসোন্যাল সেক্রেটারি!

হ্যাঁ। কেন, তোমার কোন আপত্তি আছে? Are you not willing?

কিন্তু স্যার—

বল ?

আমি কি ঐ গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারব ?

পারবে বলেই আমি স্থির করেছি। শোন, আপাততঃ চারশ টাকা করে তুমি মাস মাস পাবে, আর এখানেই থাকবে। এই বিলডিংয়ের একটা ফ্ল্যাটের দুটো কামরা তোমাকে দেওয়া হবে তোমার নিজস্ব ব্যবহারের জন্য।

কিন্তু বজ্রধ্বনি—

সেটার জন্য যা লেখাপড়ার কাজ, তুমি তো এখানে থেকেও করতে পারবে। বরং নিরিবিলিতে তোমার কাজের সুবিধাই হবে।

অনিমেষবাবু—

তাকে যা বলবার আমিই বলব। হ্যাঁ আর একটা কথা, তোমার বাপু ঐ ড্রেসটা বদলে ফেলতে হবে। বলতে বলতে পাশের টানা থেকে একশো টাকার দুখানা নোট বের করে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, এই টাকাটা রাখ। আজই কিছু ভাল জামাকাপড় কিনে নাও। ঐ কাগের বাসা মাথার চুলগুলো আর দাড়িগোঁফগুলোর একটু সংস্কার কর। যাও, কাল আবার দেখা হবে। হ্যাঁ, আজ থেকেই তুমি কাজে বহাল হলে। সনাতন ?

সনাতন এসে ঘরে ঢুকল।

সনাতন ?

আজ্ঞে—

এই শত্রুঘ্নবাবু আজ থেকে নীচের তলার পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাটে থাকবেন যেটা খালি আছে। খাট বিছানাপত্র সব দিবি আর ঠাকুরকে বলে দিবি আজ থেকে ও এখানেই খাবে, বুঝলি ?

আজ্ঞে।

যাও শত্রুঘ্নবাবু।

সেই থেকেই শত্রুঘ্নর আশু বিশ্বাসের বাড়িতে অবস্থান। এবং আশু বিশ্বাস যে মানুষ চিনতে ভুল করেননি সেটা বুঝতে তাঁর দেরি হয়নি। ক্রমে এমন হয়েছে যে শত্রুঘ্ন না হলে তাঁর কোন কিছুই হয় না। ফলে শত্রুঘ্ন ক্রমশঃ আজ তাঁর দক্ষিণ হস্ত হয়ে উঠেছে।

সন্তোষ সিংহ ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই শত্রুঘ্ন বললে, লোকটাকে না চটালেই বোধ হয় ভাল ছিল স্যার !

Don't worry—I know how to tackle them !

বিপক্ষকে কখনো underestimate না করাই বোধ হয় ভাল—

ওই লোফারটা হবে আমার শত্রু ! হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন আশু বিশ্বাস।

শত্রুঘ্ন তার ট্যারা চোখটা দিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে মনে হলেও, কিন্তু আসলে সে চেয়েছিল আশু বিশ্বাসের গোলালো বিকৃত মুখের হাসির ভঙ্গিমার দিকে।

আজ প্রায় তিন বছর কি কিছু বেশীই হলো কাজ করছে শত্রুঘ্ন আশু

বিশ্বাসের কাছে। অনেকভাবে লোকটাকে জানবার অবকাশ হয়েছে শত্রুঘ্নর। লোকটার প্রকৃতি যে কী তাও জানতে আজ আর শত্রুঘ্নর বাকী নেই।

তাছাড়া—যাক সে কথা, সেটা তার একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। আর সেই কারণেই হয়ত গত কয়েক মাস ধরে ভিতরে ভিতরে তার একটা চাপা আক্রোশ ফেনায়িত হয়ে উঠছিল মানুষটার প্রতি।

কিন্তু শত্রুঘ্নর মুখ দেখে তা বোঝবার উপায় ছিল না। যেন পাথরে কোঁদা নিষ্প্রাণ একখানি মুখ।

হাসি থামিয়ে আশু বিশ্বাস বললেন, দেখো শত্রুঘ্নবাবু, আমার কতটুকু ক্ষমতা তা আমি জানি। যাক সে কথা, সামনের শনিবার আমাদের ময়দানের পার্টি মিটিংয়ে ভাষণ দেবার জন্যে যে তোমাকে একটা বক্তৃতার খসড়া করতে বলেছিলাম, করেছ?

হ্যাঁ, স্যার।

বেশ জোরালো হয়েছে তো?

পড়ে দেখবেন।

বুঝলে শত্রুঘ্নবাবু, এবার ইলেকশনে আমাদের পার্টি যদি মেজরিটি পায়—আমরা যদি গদি দখল করতে পারি—

পারবেন না কেন স্যার—আপনাদের প্রোপাগাণ্ডা—

না হে শত্রুঘ্নবাবু, দীর্ঘকাল ধরে রাজনীতি করে আসছি, রাজনীতি যে কি বস্তু তা আমি জানি। তাই দলের অন্যান্যদের মত আমি ইলেকশনের ভোটাভুটির ব্যাপারে আগে থাকতেই অত স্যাঙ্গুইন হতে পারি না। ওই ভোটদাতারা—ওদের কার পেটে যে কি আছে—শেষ মুহূর্তে ব্যালট পেপারে যে কার নামের পাশে টিক বসাবে, counting না হওয়া পর্যন্ত তুমি জানতেও পারবে না।

গতবার তো আপনাদের মেজরিটি ছিল!

ছিল, কিন্তু হালটা কি? ছয় মাসের মধ্যেই সব ভেস্তে গেল। যাক, ও নিয়ে আমি ভাবি না—এ রাজনীতির খেলায় হার-জিত উত্থান-পতন আছেই। তুমি আমার আজকের বক্তৃতার খসড়াটা টাইপ করে আমাকে পাঠিয়ে দিও শত্রুঘ্নবাবু।

ঠিক আছে স্যার।

হ্যাঁ আর একটা কথা, আজ আর কোথাও বের হয়ো না। আমার তোমাকে দরকার হতে পারে।

ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে শত্রুঘ্ন ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচের তলায় নিজের ঘরে এসে ঢুকতেই দেখল আরতি বসে আছে। আরতির বয়স তেইশ-চব্বিশ হবে। রোগা পাতলা চেহারা, গায়ের রংটা কালোই, তাহলেও চোখের-মুখের অপূর্ব শ্রী ও দেহের উদ্ভিন্ন যৌবন-প্রাচুর্যে ঐ বয়সের মেয়েদের সাধারণতঃ যে আকর্ষণটা থাকে আরতির তার চাইতেও একটু বেশী আকর্ষণ আছে।

সাধারণ একটা মিলের শাড়ি কায়দাদুরস্ত ভাবে পরা, মাথার পর্যাপ্ত চুল আলগা বেণীর আকারে বাঁদিককার উপরে ঝোলানো। হাতে দুগাছি করে সোনার চুড়ি। হাতে একটা ব্যাগ।

ঘরে ঢুকে আরতিকে বসে থাকতে দেখেই শত্রুঘ্নর মেজাজটা বেশ বিগড়ে যায়। ভ্রূদুটো কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

আবার কেন এসেছ?

আরতির দিকে তাকিয়ে শত্রুঘ্ন প্রশ্ন করল। কণ্ঠে বিরক্তি।

কুণ্ঠিত ভাবে আরতি বললে, দাদা, তোমাকে যে বলেছিলাম—

কিন্তু আরতির কথাটা শেষ করতে দিল না শত্রুঘ্ন—মাঝপথেই তাকে থামিয়ে কর্কশ গলায় বলে উঠল, কতবার না বলে দিয়েছি তোমাকে আরতি, 'দাদা' বলে আমায় ডাকবে না কখনো, দরকার হলে শত্রুঘ্নবাবু বলবে!

আরতি কাচুমাচু মুখ করে বললে, মনে থাকে না—কতদিনের অভ্যাস—

অভ্যাস আবার কি! শত্রুঘ্ন বললে, একটা ভুলকে কিছুদিন প্রশ্রয় দিলেই সেটাকে একটা অভ্যাসে পরিণত করতে হবে নাকি? তোমাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই—তোমাদের আমি কেউ নই—কথাটা তোমাদের মনে থাকে না কেন?

আরতির চোখের কোল দুটো ছলছল করে ওঠে। সে মাথাটা নীচু করে।

আর ভুল হবে না। ম্লান গলায় আরতি জবাব দিল।

হ্যাঁ, আর যেন ভুল না হয়। হ্যাঁ শোন, আর একটা কথা, এবার থেকে এখানে তোমাকে টাকার জন্য আসতে হবে না।

আসব না?

না। প্রতি মাসে যা দিই তা আমিই পাঠিয়ে দেবো। ঘরে বসেই টাকাটা পাবে।

আরতি চুপ করে থাকে।

শত্রুঘ্নর বোধ হয় আরতির মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন একটু মায়াই হয়। তাছাড়া সত্যিই তো আরতির কোন অপরাধ নেই। ঘটনাচক্রেই না সে তার বোন হয়ে জন্মেছে।

শত্রুঘ্ন ওর বিষণ্ণ বিব্রত মুখখানির দিকে তাকিয়ে বললে, মিঃ বিশ্বাসকে আমি বলেছি তোমার চাকরির কথা—

বলেছ? আরতি উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ।

কি বললেন তিনি?

কিছু বলেননি।

আমার সম্পর্কে কি বলেছ তুমি?

বলেছি জানাশোনা বি. এ. পাস একটি মেয়ের জন্য—

আরতির আর প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। মনে মনে কেবল ভাবে, নিজের বোন কথাটা না বললেও নিকট-আত্মীয় সে তার সে কথাটাও তো অন্তত বলতে পারত!

কিন্তু আরতি কি জানে না, সেকথা কখনো বলবে না তার দাদা? তবে ও

কথাই বা সে ভাবে কেন ?

সমস্ত সম্পর্কই তাদের সঙ্গে সে মুছে ফেলেছে। তবু সে দয়া করে মাসে দু'শো করে টাকা সাহায্য করে তাদের জন্য—নচেৎ আজকের দিনে হয়ত তাদের তিন বোন ও এক ভাই এবং মাকে উপোস করেই থাকতে হত।

আরতিই যা বড়, বয়স হয়েছে—আর সবার তো একজনের পনের, একজনের তেরো ও একজনের এগার ও শেষের জন মাত্র নয় বৎসরের।

শত্রুঘ্ন যে কেবল মাসে মাসে দু'শো টাকাই ওদের দেয় তা নয়, মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন হলে আরো কিছু পাওয়া যায়।

ওদের বাবা মারা যাবার মাসখানেক পরেই, ওর সতের বছর বয়সে হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করার পর থেকে বলতে গেলে বাড়িতে বসেই ছিল। এবং এক কুটীরশিল্প প্রতিষ্ঠানে সারাদিন কাজ করে যা পেত তাই দিয়েই ওদের কোনমতে দু'মুঠো খাওয়া চলছিল অতগুলো প্রাণীর। তারপর বছর তিনেক আগে আসতে শুরু হল শত্রুঘ্নর কাছ থেকে টাকা—তখনই ও কলেজে ভর্তি হয়। ওদের বাবা যখন মারা যান, শত্রুঘ্নর সেবার বি. এ. পরীক্ষা দেবার কথা।

ওদের বাবা অবিনাশবাবুর মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই হঠাৎ ওদের দাদা বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল। দীর্ঘ তিন-তিনটে বছর তারপর আর কোন সন্ধানই কেউ শত্রুঘ্নর পায়নি। এবং বাপ অবিনাশ চক্রবর্তী মারা যাওয়ায় এবং দাদা হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ায় ওদের সংসারের যখন নিদারুণ দৈন্যঅবস্থা চলছে, একা আরতি সামলাতে পারছে না—ভাগ্যে বাপের আমলের ছোট একতলা একটা বাড়ি ছিল, তাই বস্তীতে যেতে হয়নি বা রাস্তায়ও গিয়ে দাঁড়াতে হয়নি, ঠিক তখনই হঠাৎ একদিন শত্রুঘ্ন নামে কোন এক ব্যক্তির কাছ থেকে শ'দুই টাকার একটা মনি-অর্ডার এল।

আরতির মা বাসন্তী বুঝতে পারেনি কে ঐ শত্রুঘ্ন! কেনই বা সে ওদের টাকা পাঠিয়েছে!

কয়েক মাস নিয়মিত টাকা আসবার পর আরতিই শেষ পর্যন্ত খুঁজে খুঁজে শত্রুঘ্নকে আবিষ্কার করেছিল একদিন 'বজ্রধ্বনি' কার্যালয়ে।

দেখা হতেই কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু চোখের ইশারায় বারণ করে শত্রুঘ্ন আরতিকে ডেকে নিয়ে পাশের একটা ছোট ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল।

দাদাকে প্রণাম করতে গিয়েছিল আরতি, কিন্তু শত্রুঘ্ন প্রণাম নেয়নি ওর। পিছিয়ে গিয়ে বলেছিল, থাক—থাক।

দাদা!

আমার সঙ্গে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আর দাদা তোমাদের আমি কোনদিন ছিলামও না, আজও নই। আমার বর্তমান পরিচয় শত্রুঘ্ন। তা কি করে আমার ঠিকানা পেলে? কেমন করে জানলে এখানে আমি আছি?

আরতি সেকথা জানায়নি, শত্রুঘ্ন আর কেউ নয় তারই দাদা প্রফুল্ল চক্রবর্তী সন্দেহে কেমন করে সে শত্রুঘ্নর বর্তমান ঠিকানাটা যোগাড় করেছিল! কেবল

বললে, আমরা প্রতি মাসেই টাকা পাচ্ছি—

তবে আবার কি জন্য এখানে এসেছ ?

মা বলছিল তুমি না টাকা পাঠালে আমাদের সবাইকে না খেয়ে মরতে হত !

শত্রুঘ্ন কোন জবাব দেয়নি।

আরতি আবার বললে, মা বলছিল—

ভ্রূ কুঞ্চিত করে ট্যারা চোখটা দিয়ে তাকায় শত্রুঘ্ন আরতির দিকে।

আরতির কেমন ভয়-ভয় করে, কিন্তু সাহসে ভর করে বললে, তুমি যদি—

কি আমি যদি ?

বাসায় একবার যাও !

না।

কঠিন রূঢ় একটি শব্দ অত্যন্ত মৃদুভাবে উচ্চারিত হলেও, আরতির সেদিন যেন মনে হয়েছিল একটা হাতুড়ির ঘা পড়ল।

আর কোন কথা বলবার সাহস হয়নি।

আর কোন কথা আছে ?

না।

এখানে কাউকে তোমার পরিচয় দিয়েছ ?

না।

তারপরও আর দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না। আরতিরও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল।

আরতি বললে, তাহলে আমি যাই ?

হ্যাঁ।

আরতি ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল শত্রুঘ্ন। মনের উপর ভেসে উঠছিল সেই ভদ্রমহিলার মুখটিরই ছবি। যে মহিলাটির গর্ভেই নাকি তার জন্ম।

আর সেইটাই শত্রুঘ্নর জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় ক্ষোভ। শুধু কি ক্ষোভ, অবিমিশ্র একটা ঘৃণাও—যে ঘৃণার দহন আজ পাঁচ বছর ধরে তাকে দগ্ধাচ্ছে !

কতবার মনে হয়েছে শত্রুঘ্নর, সে আত্মহত্যা করে ঐ ঘৃণাটা জীবন থেকে মুছে ফেলবে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছে—না।

তার কর্তব্যটুকু শেষ না করা পর্যন্ত তার নিষ্কৃতি নেই।

ভাগ্যে তার বাবার মৃত্যুর পর তাঁর ডাইরিটা শত্রুঘ্নর হাতে পড়েছিল হঠাৎ একদিন একটা ভাঙা ট্রাংক ঘাঁটতে ঘাঁটতে ! যত রাজ্যের পুরনো বই কাগজপত্র স্তূপীকৃত করা ছিল এলোমেলো ভাবে ট্রাংকটার মধ্যে।

ঘরের এক কোণে অব্যবহার্য ট্রাংকটা পড়ে থাকত, কেউ কখনো নজর দেয়নি ট্রাংকটার দিকে। দেবার প্রয়োজনও হয়নি। হঠাৎ কি খেয়াল হতেই এক দ্বিপ্রহরে শত্রুঘ্ন ট্রাংকটা খুলে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে বইকাগজপত্রগুলো, কালো মলাটে বাঁধানো একটা পুরাতন ডাইরি তার হাতে এসেছিল।

বাবার ডাইরি—

কি খেয়াল হয়েছিল, ডাইরিটার পাতা উল্‌টে উল্‌টে পড়তে শুরু করে এবং হঠাৎ যেন ডাইরির কটা লাইন একটা বিষাক্ত ছোবল হানে শত্রুঘ্নকে। আরো কয়েকটা লাইন তারপর রুদ্ধশ্বাসে পড়ে চলে দ্রুত। সব দিনের আলোর মতই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে তখন।

ডাইরিটা হাতে করে কতক্ষণ সে পাথরের মত ঘরের মেঝেতে ভাঙা ট্রাঙ্কটার সামনে ছত্রাকার পুরনো বই ও কাগজের মধ্যে বসেছিল খেয়াল ছিল না। হঠাৎ বাসন্তী দেবী—ওর মার কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে।

কি করছিস রে এখানে বসে খোকা?

ট্যারা চোখের শূন্য দৃষ্টি তুলে তাকায় শত্রুঘ্ন বাসন্তী দেবীর দিকে।

কিছুদিন আগে মাত্র অবিনাশ চক্রবর্তী মারা গিয়েছেন—মাথার চুল সবে গজাতে শুরু করেছে। ছোট ছোট, খোঁচা খোঁচা।

শত্রুঘ্নকে চুপ করে থাকতে দেখে বাসন্তী দেবী আবার প্রশ্ন করে, কি হয়েছে রে? তোর মুখটা অমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন?

ইচ্ছা হয়েছিল উঠে তখনি লাফিয়ে পড়ে বাসন্তীর গলাটা দু'হাতের দশ আঙুলে টিপে ধরে চিৎকার করে ওঠে, কেন—কেন – কেন?

কিন্তু পারেনি শত্রুঘ্ন তা। মানুষের মন যখন যা চায়, তখুনি কি তা পারে! না, পারে না।

ভিতরে ভিতরে একটা দুঃসহ অবরুদ্ধ জ্বালায় ছট্‌ফট করতে থাকলেও বাইরে সে যেন পাথরের মতই স্তব্ধ অনড় হয়ে বসেছিল, কিছুই করতে পারেনি শত্রুঘ্ন।

তোর সঙ্গে কটা কথা ছিল। বাসন্তী দেবী আবার বলে।

পরে হবে।

শত্রুঘ্নর গলার স্বরটা যেন কেমন ভারী-ভারী। বাসন্তী দেবী আর কথা বলেনি। ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল।

কি জানি কেন, বাসন্তী দেবীরও হয়ত শত্রুঘ্নর তখনকার মুখের দিকে তাকিয়েই কথা বলতে সাহস হয়নি।

তারপর তিন-চারটে দিন ও রাত—কি দুঃসহ এক যন্ত্রণা ও ঘৃণার মন্থনের মধ্য দিয়েই না কেটেছে শত্রুঘ্নর! কি অসহায়, কি নিরালম্ব এক শূন্যতা! চারিদিকে একটা অন্ধকার সমুদ্র তাকে যেন গ্রাস করছে, তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোন্ অতল তলে!

বার বার অবিনাশ চক্রবর্তীর শেষ মুহূর্তের কথাগুলো মনে পড়েছে, যেন ভেসে উঠেছে ঐ শূন্যতার মধ্যে।

ওদের দেখিস খোকা! বাবার সেই অনুরোধ।

হ্যাঁ, অবিনাশ চক্রবর্তীকে সে কথা দিয়েছিল। মানুষটা সত্যিই দেবতা। নচেৎ এত বড় জঘন্যতাকে কেউ ক্ষমা করতে পারে?

শত্রুঘ্ন নিশ্চয়ই পারত না। কিছুতেই পারত না। আরো মনে হয়েছে শত্রুঘ্নর

এ হয়ত কেবল উদারতাই নয়, ক্ষমাও নয়—দুর্বলের অসহায়নীয়তা, একটা ক্লীবত্ব।

তারপর চতুর্থ রাত্রে এক কাপড়ে এক জামা গায়ে অন্ধকারে বাড়ির দরজা খুলে বের হয়ে এসেছিল শত্রুঘ্ন। বুকের মধ্যে তার কেবল আগুনের অক্ষরে একটা নাম তখন লেখা হয়ে গিয়েছে।

বের করতে হবে! খুঁজে বের করতে হবে ঐ মানুষটাকে!

কিন্তু কেমন করে? কোথায় সে খুঁজে পাবে তাকে? একুশ বছরের আগেকার একটা মানুষকে—তার নামটাই শুধু জানে—তাও সেটা তার সঠিক নাম কিনা তাই বা কে জানে? হয়ত মানুষটার মতই তার সেই নামটাও মিথ্যা! নামটার মধ্যেও রয়েছে তার একটা প্রতারণার দলিল।

একটা মিথ্যা দলিল!

না জানে তার চেহারা কেমন, না জানে বর্তমানে লোকটা কোথায় থাকে? উদ্‌ভ্রান্তের মত রাস্তায় রাস্তায় ক'টা দিন ঘুরে বেড়াল, কলেজেও গেল না। হঠাৎ একদিন ইকনমিক্সের প্রফেসার সীতেশবাবুর সঙ্গে কলেজ স্ট্রীটে দেখা হয়ে গেল।

সীতেশবাবুর প্রিয় ছাত্র শত্রুঘ্ন।

প্রফুল্ল না?

সন্ধ্যার অন্ধকার শহরে নেমেছে। রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে, তবু সীতেশবাবুর প্রফুল্লকে দেখে চিনতে কষ্ট হয় নি।

ময়লা একটা শার্ট গায়ে—একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি—ছোট ছোট খোঁচা খোঁচা মাথার চুলগুলো। প্রফুল্ল সীতেশবাবুকে দেখে পাশ কাটাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারে নি।

সীতেশবাবু এগিয়ে এসে প্রফুল্লকে ধরে ফেলেছিলেন, প্রফুল্ল!

প্রফুল্লকে অতঃপর থামতেই হয়েছিল।

এ কি চেহারা হয়েছে তোমার হে? পরীক্ষা তো এসে গেল—কেমন প্রিপারেশন হল?

পরীক্ষা দেব না স্যার।

পরীক্ষা দেবে না? কেন—পরীক্ষা দেবে না কেন? কি ব্যাপার বল তো?

বাবা মারা গেছেন, আপনি তো স্যার জানেন।

জানি বইকি। বাবা তো কতজনারই থাকে না, তাই বলে কি সবাই পড়াশুনা করে পরীক্ষা দেয় না?

সীতেশবাবু ব্যাপারটা না বুঝলেও বোধ হয় কিছুটা অনুমান করতে পেরেছিলেন প্রফুল্লর ছন্নছাড়ার মত চেহারা দেখে, তার কথাবার্তা শুনে। তাই প্রশ্ন করলেন, তা কোথায় চলেছ?

কোথাও না স্যার—

এস আমার সঙ্গে।

সীতেশবাবু অতঃপর প্রফুল্লকে যেন একপ্রকার জোর করেই টেনে নিয়ে শিয়ালদহে গিয়ে ট্রেনে চেপেছিলেন বেলঘরিয়ায় যাবার জন্য। সীতেশবাবু

বেলঘরিয়াতেই থাকতেন।

সীতেশবাবুর স্ত্রী অনেকদিন আগেই মারা গিয়েছিলেন একটি মেয়ে শমিতাকে রেখে। সীতেশবাবু আর বিবাহ করেননি।

শমিতা সেবারে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দেবে। সে-ই সংসার দেখে, তার মাথার উপরই সংসারের ভার—অবশ্য একটা বুড়ো চাকর আছে অনেকদিনের।

সীতেশবাবু তো সর্বদা তাঁর কলেজ, অধ্যাপনা আর বই নিয়েই ডুবে থাকতেন। ট্রেনেই বসে বসে সীতেশবাবু একসময় জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি কথা বল তো প্রফুল্ল, পরীক্ষা দেবে না কেন? ফি জমা দিয়েছ?

হ্যাঁ, স্যার।

তবে?

পরীক্ষা দেবার আর আমার ইচ্ছে নেই।

পাগল নাকি! পরীক্ষা তোমায় দিতেই হবে। তা বাড়িতে তোমার মা নেই?

মা—

হ্যাঁ, ভাই-বোন?

না, কেউ নেই।

কেউ নেই আর?

না। সংসারে একমাত্র ঐ বাবাই ছিলেন।

বাবাই তার সংসারে একমাত্র আপনার জন ছিলেন—আর কেউ সংসারে নেই—মা তার জন্মের পরেই মারা গিয়েছিলেন।

কোন সংকোচ বা দ্বিধাই ছিল না প্রফুল্লর গলার স্বরে। পরিষ্কার স্বচ্ছ সহজ গলায় মিথ্যে কথাগুলো বলে গিয়েছিল প্রফুল্ল।

একবারও মনে হয়নি সে কোন পাপ বা অন্যায় করছে—মিথ্যাচরণ করছে।

সীতেশবাবু সহানুভূতিতে যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলেন। মনে মনে বার বার হয়ত উচ্চারণ করেছিলেন, সত্যিই ছেলেটা নিদারুণ হতভাগ্য।

ঠিক আছে, এ দুটো মাস তুমি আমার বাড়িতেই থাকো।

আপনার বাড়িতে!

হ্যাঁ। পরীক্ষা তোমায় দিতেই হবে।

কিন্তু, স্যার—

না, কোন কথাই তোমার আমি শুনব না। এভাবে তোমার ক্যারিয়ারটা তোমায় আমি নষ্ট করতে দেব না।

কোন কথাই শোনেননি সীতেশবাবু। সঙ্গে করেই প্রফুল্লকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর গৃহে।

সীতেশবাবু গৃহে প্রবেশ করেই ডাকলেন, শমি মা!

শমিতা এসে দরজা খুলে বাবার সঙ্গে প্রফুল্লকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। চোখে তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

এ আমার ছাত্র প্রফুল্ল চক্রবর্তী মা। আজ থেকে ও আমাদের এখানেই থাকবে।

স্যার! প্রফুল্ল আবারও কিছু বলবার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু সীতেশবাবুর পরবর্তী কথায় সেটা চাপা পড়ে যায়, দক্ষিণের ছোট ঘরটায় ও থাকবে—সেখানে তো একটা খাট আছে না মা?

হ্যাঁ, বাবা।

একটা টেবিল-চেয়ার দিতে হবে। ঘরের আলোটা ঠিক আছে তো মা?

হ্যাঁ, বাবা।

তাড়াতাড়ি আমাদের চা-জলখাবারের ব্যবস্থা একটু করতে পারবে মা?

কেন পারব না!

যাও, আগে ওকে ঘরটা দেখিয়ে দাও।

আসুন। শমিতা ডেকেছিল।

শমিতার বয়স তখন কতই বা হবে!

পনের কি ষোল, কৈশোর-উত্তীর্ণ—সবে যৌবন দেহের সারা অঙ্গে অঙ্গে দেখা দিয়েছে যেন ভীরু পদক্ষেপে। টক্‌টকে গৌর গাত্রবর্ণ—মাথাভর্তি চুল। মুখখানিতে একটা শিশুর সারল্য যেন।

কতকটা মন্ত্রমুগ্ধের মতই অতঃপর শমিতাকে অনুসরণ করেছিল প্রফুল্ল সেরাত্রে।

সীতেশবাবুর ওখানেই তারপর দীর্ঘ দুটো বছর তার কেটেছে।

ছেলের চাইতেও বুঝি ভালবেসেছিলেন সীতেশবাবু শত্রুঘ্নকে। আর শমিতা? তার কথা মনে করতে চায় না শত্রুঘ্ন।

বি. এ. পাস করে অনার্স নিয়ে এম. এ. পড়ছে। ফিফ্‌থ ইয়ার।

সহসা একদিন বিকেলে সীতেশবাবুর বাড়ি থেকে বের হয়ে আর সে সেখানে ফিরে যায়নি।

ঘুরতে ঘুরতে পাটনায় গিয়ে হাজির হয় প্রফুল্ল। সেখানে একটা কাজ জুটে যায়। সামান্য মাহিনা। এবং পাটনায় চাকরি করতে করতে হঠাৎ একদিন চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় চলে আসে এবং অনিমেষের সঙ্গে পরিচয় ও 'বজ্রধ্বনি' কাগজে চাকরি।

॥ তিন ॥

শত্রুঘ্ন আবার আরতির মুখের দিকে তাকাল।

আরতি মাথা নীচু করে খাটের উপর বসেছিল।

শত্রুঘ্ন বললে, সামনের মাস থেকে আমি আড়াইশো' করে টাকা পাঠাব, যতদিন তোমার একটা চাকরি-বাকরি না হয়। আর কোন কথা নেই তো?

আরতি বুঝতে পেরেছিল এবার তাকে উঠতে হবে। শত্রুঘ্নর কথার মধ্যে তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

আমার কাজ আছে, তুমি তাহলে এস!

আরতি উঠে নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

শত্রুঘ্ন এসে খোলা জানালাটার সামনে দাঁড়াল। জানালা থেকে সামনের রাস্তার অনেকখানি দেখা যায়।

রাস্তার ওপারে কৃষ্ণচূড়ার গাছটা বেশ বড় হয়ে উঠেছে। রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বললেও কলকাতা শহরে শীতের সন্ধ্যা কেমন চাপ-চাপ ধোঁয়ায় ঝাপসা হয়ে আছে।

আশ্চর্য! যে প্রফুল্লর চরিত্রে দুর্বলতা বলে কোনদিন কিছু ছিল না, সেই প্রফুল্লই কেমন যেন আরতির জন্য একটা কষ্টবোধ করে মনের মধ্যে!

না, প্রফুল্ল—দুর্বলতা তোমার সাজে না! নিজেকেই যেন নিজে বলে প্রফুল্ল। প্রফুল্ল কবেই মরে গিয়েছে—সে আজ শত্রুঘ্ন—প্রফুল্ল চক্রবর্তীর শবদেহের উপরে নতুন মানুষ পদবীহীন এক শত্রুঘ্নর জন্ম হয়েছে।

সংসারে তার কেউ নেই। অনাথ আশ্রমে মানুষ। পাটনায় ছিল কিছুদিন।

পদবীটা নামের শেষে বিসর্জন দিলেও, চাকরির ব্যাপারে বি.এ. পাস বললেই পদবীর কথাটা এসে পড়ে এবং তখন যদি গেজেটে নাম না পাওয়া যায় চাকরি জুটবে না প্রফুল্ল ভাল করেই জানত। পাটনাতে চাকরির সময় সেটার প্রয়োজন হয়েছিল কিন্তু প্রমাণ করতে কোন অসুবিধা হয়নি। ও বলেছিল ওর নাম শত্রুঘ্ন চাকলাদার।

ভাগ্যে তার বন্ধু শত্রুঘ্ন চাকলাদার ভাগ্যান্বেষণে কোনমতে জাহাজের খালাসীর চাকরি নিয়ে আজ তিন বছর হল নিরুদ্দিষ্ট! তাই তো তার নাম আর পরিচয়টা সে কাজে লাগাতে পেরেছে!

দু'জনে একসঙ্গে একই বছর বি. এ. পাস করেছিল। তারপর এম. এ. পড়তে পড়তেই চাকরির সন্ধানে দু'জনে একটা বছর কি ঘোরাই না যত্রতত্র ঘুরেছে! শেষটায় হতাশ হয়ে শত্রুঘ্ন চাকলাদার দেশ ছাড়বে বলে স্থির করে।

প্রফুল্লকেও বলেছিল, চল প্রফুল্ল, ভেসে পড়ি!

না।

এখানে থেকে কি করবি? এখনো চাকরি পাবার আশা তোর আছে?

না।

তবে?

একটা কাজ জীবনে যে করে হোক আমাকে শেষ করতেই হবে—আর সে কাজ দেশ ছাড়লে হবে না।

কি কাজ?

সে আছে, তুই জেনে কি করবি? তবে—

কি, তবে?

শত্রুঘ্ন, আমি একজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। যেমন করেই হোক তাকে আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে—কিন্তু সে এ দেশ ছেড়ে গেলে হবে না।

কে সে? কাকে খুঁজছিস?

সব কথা একদিন জানতে পারবি। তাহলে তুই যাওয়াই ঠিক করলি!

হ্যাঁ।

শত্রুঘ্ন চলে যাবার পর প্রফুল্ল গেল পাটনায়। এবং পাটনায় যাবার আগেই হঠাৎ একদিন প্রফুল্লর মাথায় কল্পনাটা আসে—নাম-বদলের কল্পনা। বন্ধুকে সে কথা প্রফুল্ল বলেও।

কেন বল্ তো? নাম বদলাতে চাস কেন?

শত্রুঘ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল।

কারণ আছে। আচ্ছা তুই তো দেশ ছেড়ে যাচ্ছিস, যদি আমি তোর নামটা ব্যবহার করি?

সে আবার কি!

আগে বল্ তোর আপত্তি আছে নাকি?

আপত্তির কি থাকতে পারে! কিন্তু—

কি?

শত্রুঘ্ন বলেছিল, লোকে জানতে পারলে—

জানতে পারবে কি করে যদি তোর আর আমার মধ্যে একটা প্যাক্ট বা একটা বোঝাপড়া থাকে!

কিন্তু কেন এ কাজ করতে চাস বল্ তো?

মনে কর্ এ আমার অজ্ঞাতবাস—

অজ্ঞাতবাস! কিন্তু কেন?

শত্রুঘ্নর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলেছিল প্রফুল্ল, তবে যেদিন এই অজ্ঞাতবাসের প্রয়োজন ফুরোবে আবার আমি প্রফুল্ল চক্রবর্তীই হব। কারণ ওটা আমার বাবার দেওয়া নাম। আর যাই করি না কেন, সেই দেবতার মত মানুষটাকে আমি অপমান করতে পারব না।

শত্রুঘ্ন আর কিছু জানতে পারেনি, প্রফুল্লও আর কিছু বলেনি।

ঢং ঢং করে ঘরের ওয়াল-ক্লকটায় রাত এগারটা ঘোষণা করল। বেশ রাত হল। একবার 'বজ্রধ্বনি' অফিসে যাবার প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু আশু বিশ্বাস বলেছেন বাড়িতে থাকতে, রাত্রে প্রয়োজন হতে পারে তাকে। রাত যখন এগারটা হল, হয়ত আর প্রয়োজন হবে না।

একবার ঘুরে আসলে কিছু হবে না! শত্রুঘ্ন ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সেটা ছিল এগারই ডিসেম্বর শনিবার। এবং সেদিন সকালের সেই ঘটনার দিন কুড়ি পরের এক শনিবার, রাত এগারটা নাগাদ—সনাতন পরে পুলিসের জবানবন্দিতে বলেছিল, আশু বিশ্বাসের একটা জরুরী ফোন-কল আসে।

আশু বিশ্বাস বের হয়ে যান মিনিট পনেরোর মধ্যেই ফোন-কলটা পেয়ে। ফেরেন রাত তিনটে নাগাদ।

সনাতন তাঁকে ফিরে শোবার ঘরে ঢুকতে দেখেনি বটে, কিন্তু তাঁর জুতোর শব্দ শুনেছিল পরে জেরায় বলে।

এবং এও বলেছিল, প্রভুর জুতোর শব্দ পেয়ে কিছু প্রয়োজন আছে কিনা একবার ভেবেছিল জিজ্ঞাসা করে আসবে, কিন্তু প্রভুর কোন ডাক আসেনি বলে যায়নি।

পরের দিন বারোই ডিসেম্বর রবিবার সকালে।

আশু বিশ্বাসকে তাঁর শয়নঘরে সোফার উপরে উপবিষ্ট দেখা যায়।

সনাতন ঘরে ঢুকে প্রথমটায় বুঝতে পারেনি যে আশু বিশ্বাস তখন মৃত। গতরাত্রে যে পোশাক পরে বের হয়েছিলেন পরিধানে তখনো সেই পোশাক।

মাথাটা বুকের উপর ঝুলে রয়েছে। সোফার দু'পাশ দিয়ে হাত দুটো অসহায় ভাবে ঝুলছে।

ব্যাপারটা যে অস্বাভাবিক সেটা ঐ উপবিষ্ট দেহটার দিকে তাকানো মাত্রই বুঝতে কারোরই কষ্ট হবার কথা নয়। তবু মানুষের মন তো, চোখের সামনে কোন অমঙ্গল দেখলেও প্রথমটায় মনটা বুঝি সায় দিতে চায় না। তাই সনাতনের প্রথমটায় মনে হয়েছিল, তার মনিব বুঝি ঘুমোচ্ছেন, কিন্তু দু'পা সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েই তার কেমন যেন সন্দেহ হয়—একটা সংশয় ও দ্বিধা নিয়েই আরো দু'পা এগিয়ে যায় সনাতন।

ভয়ে ভয়ে ডাকে, বাবু—

কিন্তু কোন সাড়া নেই। অস্পষ্ট আশঙ্কাটা ততক্ষণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ভয়ে যেন সিঁটিয়ে ওঠে সনাতন। প্রায় দৌড়েই ঘর থেকে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে সোজা গিয়ে শত্রুঘ্নর ঘরে ঢুকে পড়ল।

শত্রুঘ্ন আয়নার সামনে বসে দাড়ি কামাচ্ছিল।

হাঁপাতে হাঁপাতে সনাতন ডাকে, সেক্রেটারীবাবু!

কি হয়েছে সনাতন? শত্রুঘ্ন ফিরে তাকাল।

শীগ্‌গির একবার উপরে চলুন সেক্রেটারীবাবু!

কেন? কি হয়েছে?

বাবু—

কি হয়েছে? আমাকে ডাকছেন?

না, না। আপনি এখুনি একবার উপরে চলুন শীগ্‌গির—

কি ব্যাপার সনাতন?

আপনি আর দেরি করবেন না, চলুন শীগ্‌গির—

শত্রুঘ্নর আর দাড়ি কামানো হয় না। দাড়ি কামানো অর্ধসমাপ্ত রেখেই শত্রুঘ্ন বের হয় ঘর থেকে।

সনাতন আগে আগে, শত্রুঘ্ন তার পিছনে পিছনে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে থাকে।

ঘরে ঢুকে আশু বিশ্বাসের উপবিষ্ট চেহারার দিকে তাকিয়ে তার বুঝতে আর কিছুই বাকি থাকে না। তবু একবার পরীক্ষা করে দেখে, না, মৃত—

আশু বিশ্বাস মৃত। কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু প্রথমটায় কোন ক্ষতচিহ্ন তার চোখে পড়েনি শরীরের কোথায়ও, কেবল পরিধেয় জামাটার বুকের কাছে বাঁদিকে একটুখানি রক্তচিহ্ন যেন গোলাকার কালো হয়ে শুকিয়ে আছে একটা সিকি পরিমাণ।

দেখুন সেক্রেটারীবাবু!

শত্রুঘ্ন ফিরে তাকাল সনাতনের দিকে।

বাবু কি তাহলে—

সনাতনের কথাটা শেষ হল না, শত্রুঘ্ন মাথা নাড়ল।

বাবু—

বেঁচে নেই!

শত্রুঘ্নও প্রথমে কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল ঘটনার আকস্মিকতায়, কিন্তু একটু পরেই নিজেকে সামলে নেয়।

কি যেন ভাবল, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে ঘরের কোণে রক্ষিত টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিকটবর্তী থানায় ডায়েল করতে লাগল।

থানায় যখন টেলিফোনটা পেঁছিল সে-সময় থানা-অফিসার রাধেশ ব্যানার্জী কিরীটীর সঙ্গে মুখোমুখি বসে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল।

কিরীটী কিছুক্ষণ আগে মাত্র এসেছিল থানায় রাধেশের কাছ থেকে একটা জাল দলিলের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে।

সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে কিরীটীকে ঐ ব্যাপারে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

থানা-অফিসার রাধেশ রিসিভারটা তুলে ধরে বললে, কে আপনি? কোথা থেকে কথা বলছেন?

আমি শত্রুঘ্ন—আশু বিশ্বাসের প্রাইভেট সেক্রেটারী, নারায়ণী ম্যানসন থেকে কথা বলছি।

কি ব্যাপার?

আশুবাবু মারা গেছেন—

কে—আমাদের আশু বিশ্বাস?

হ্যাঁ।

কখন?

জানি না ঠিক।

তা থানায় ফোন করছেন কেন? রাধেশ বললে।

দেখুন ব্যাপারটা যেন আমার কেমন গোলমেলে মনে হচ্ছে—

গোলমেলে!

হ্যাঁ, মনে হচ্ছে স্বাভাবিক মৃত্যু নয়।

কি করে বুঝলেন?

আপনি এলেই বুঝতে পারবেন?

তারপরই সংক্ষেপে ব্যাপারটা শত্রুঘ্ন ফোনেই রাধেশের কাছে বিবৃত করে।

কিরীটী শুধায়, কি ব্যাপার ?

ঠিক আছে, আমি আসছি এখুনি।

রাধেশ ফোনটা নামিয়ে রাখে।

কি ব্যাপার মিঃ ব্যানার্জী ? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে, কোন জরুরী তলব মনে হচ্ছে !

আশু বিশ্বাসের নাম জানেন ?

জানি বৈকি। এ শহরের রাজনৈতিক মহলের একজন রীতিমত বিশিষ্ট ব্যক্তি—নামে বেনামে অনেক কারবার—বিশেষ একটি পার্টির আসল ব্রেন ও কর্মকর্তা। বহু টাকার মালিক—সি. আই. টি. রোডে বিরাট প্রাসাদতুল্য বাড়ি—তা তাঁর আবার কি হল এই সক্কালবেলা ?

ওঁর সেক্রেটারী ফোন করছিল—বললে আশুবাবু মারা গেছেন !

মারা গেছেন ?

হ্যাঁ, আর মৃত্যুটা নাকি ভদ্রলোকের স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। মানে ওর ধারণা, ভদ্রলোক খুন হয়েছেন।

তাই নাকি ! কিরীটীর চোখের তারায় যেন একটা জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে।

কখন—কবে—কোথায় ? কিরীটী মৃদু গলায় প্রশ্ন করল অতঃপর।

আজ সকালে তাঁর শয়নকক্ষে মৃত অবস্থায় তাঁকে পাওয়া গিয়েছে।

আপনি যাচ্ছেন সেখানে ? কিরীটী শুধায়।

হ্যাঁ।

আমি যদি আপনার সঙ্গে যাই তো আপত্তি আছে ?

বিলক্ষণ ! আপত্তি বিন্দুমাত্রও নেই, বরং আপনি সঙ্গে গেলে হয়ত অন্ধকারে দু-একটা আলোর রশ্মি দেখতে পাওয়া যাবে। হাসতে হাসতে বললে রাধেশ ব্যানার্জী।

।। চার ।।

বেলা সাড়ে নটা নাগাদ পুলিসের জীপগাড়ি এসে থামল আশু বিশ্বাসের প্রাসাদতুল্য ফ্ল্যাটবাড়ি নারায়ণী ম্যানসনের সামনে।

রাধেশ ব্যানার্জী, কিরীটী ও জনা-তিনেক কনস্টেবল জীপ থেকে নামল।

শত্রুঘ্ন গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল ওদের অপেক্ষায় বোধ হয়।

বিরাট ফ্ল্যাটবাড়িটার নাম 'নারায়ণী ম্যানসন'। নীচের তলায় ব্যাংক ও দোতলায় কি একটা বিদেশী অয়েল কোম্পানির হেড অফিস।

চার-পাঁচ-ছ'তলায় তিনটে করে ফ্ল্যাট—নটা ফ্ল্যাট এবং ছয় ও সাততলায় দুটো বড় ফ্ল্যাট ও তিনটে ছোট ফ্ল্যাট। সর্বসমেত চোদ্দটা ফ্ল্যাট। সব ফ্ল্যাটেই ভাড়াটে রয়েছে। সম্পূর্ণ তিনতলার ফ্ল্যাটটা নিয়ে থাকতেন আশু বিশ্বাস।

দুটো লিফট ফ্ল্যাট বাড়িটায়। দোতলায় অফিস ছাড়াও ছোট দুটি ফ্ল্যাট। তার একটাতে থাকে শত্রুঘ্ন, অন্যটায় ছিল পার্টি-অফিস। মধ্যে মধ্যে ঐ অফিস-ঘরে এসে পার্টির পাণ্ডারা ও কর্মকর্তারা বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে আশু বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিত হত সলাপরামর্শর জন্য।

অন্যান্য কারবার ছাড়াও আশু বিশ্বাসের ঐ নারায়ণী ফ্ল্যাট-বাড়ির ভাড়া থেকেই প্রতি মাসে একটা মোটা অংকের টাকা আসত—প্রায় একশ হাজারের মত টাকা!

নানা শ্রেণীর ভাড়াটে, ফ্ল্যাটগুলোর মধ্যে নানা জাতি ও প্রদেশের ভিড়।

রবিবার বলে ব্যাংক ও তেল কোম্পানীর অফিস বন্ধই ছিল।

ঢুকতেই সামনে একটা কোর্টইয়ার্ড। একদিকে পর পর কয়েকটি গ্যারাজ। কোর্টইয়ার্ডে ও গ্যারাজগুলোতে আট-দশটা গাড়ি চোখে পড়ে।

কিছু দরোয়ান ভৃত্য ও ড্রাইভারের দল এদিক ওদিক কেউ কেউ ঘোরাঘুরি করছিল, আবার কেউ কেউ খোশমেজাজে গল্পগাছা করে রবিবারের ছুটিটা উপভোগ করছিল। কারো মধ্যেই কোনরকম চাঞ্চল্য বা উত্তেজনা দেখা গেল না।

রাধেশ ব্যানার্জী শত্রুঘ্নর সঙ্গে কথা বলতে বলতে লিফটের দিকে এগিয়ে যায়। পাশে ওদের কিরীটী। কিরীটী নিঃশব্দে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

রাধেশ ব্যানার্জী প্রশ্ন করে, আপনারই নাম শত্রুঘ্নবাবু—আপনিই ফোন করেছিলেন?

হ্যাঁ। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে পাশাপাশি জবাব দিচ্ছিল রাধেশ ব্যানার্জীর প্রশ্নের শত্রুঘ্ন।

আপনিই কি প্রথমে জানতে পারেন ব্যাপারটা?

রাধেশ ব্যানার্জী প্রশ্ন করল।

আজ্ঞে না। আশুবাবুর চাকর সনাতন এসে আমাকে খবর দিতে আমি গিয়ে—

শত্রুঘ্নর কথা শেষ হবার আগেই রাধেশ ব্যানার্জী আবার প্রশ্ন করল, সনাতন কতদিন এ বাড়িতে আছে?

তা প্রায় বছর দশ-বারো হবে বোধ হয়।

পুরনো লোক?

হ্যাঁ আর কর্তার খুব পেয়ারের ও বিশ্বাসী।

হুঁ। তা আপনি কতদিন আছেন এখানে?

বছর তিনেকের মত হবে।

আশুবাবুর সংসারে কে কে আছেন?

একাই উনি থাকতেন।

কোন আর আত্মীয়স্বজন থাকে না?

না।

উনি কি ব্যাচিলার ছিলেন নাকি? রাধেশ ব্যানার্জী প্রশ্ন করে ওর মুখের দিকে তাকায় আবার।

না। তবে—

তবে ?

শুনেছি ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে বছর পনের হল সেপারেশন হয়ে গিয়েছে—

ডিভোর্স ?

না, যতদূর জানি ডিভোর্স হয়নি।

স্ত্রী কোথায় থাকেন ?

শুনেছি ওঁর স্ত্রী হেমাঙ্গিনী বিশ্বাস বালীগঞ্জে থাকেন। মাসে মাসে তাকে উনি দু হাজার করে টাকা পাঠাতেন।

ছেলেপিলে কিছু হয়নি ?

এক ছেলে আছে—জয়ন্ত বিশ্বাস, সে জার্মানীতে থাকে।

ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না আশুবাবুর ?

বলতে পারি না।

ইতিমধ্যে ওরা তিনতলায় এসে পড়েছিল।

এ বাড়িতে লিফট নেই ? কিরীটীই এবারে প্রশ্ন করে।

আছে, দুটো লিফট। একটা মিঃ বিশ্বাসের পারসোনাল ইয়ুজের জন্য ব্যবহৃত হত—সেটার চাবি মিঃ বিশ্বাসের কাছেই থাকত বরাবর, অন্যটা ভাড়াটেদের জন্য—রবিবার সে লিফটা বন্ধ থাকে।

সিঁড়ি যেখানে চারতলায় ওঠবার জন্য বাঁক ঘুরছে তারই মুখে তিনতলার প্রবেশমুখে কোলাপসিবল গেট, সামনে লম্বামত একটা করিডোর। কিরীটী লক্ষ্য করে, ইংরাজী 'এল' প্যাটার্নের করিডোরটা বেঁকে গিয়েছে। পর পর সব ঘর করিডোরে। শত্রুঘ্নর সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ ঘরটায় গিয়ে সকলে দরজা ঠেলে প্রবেশ করল। দরজাটা ভেজানো ছিল।

ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই কিরীটী প্রশ্ন করে, মনে হচ্ছে এ ম্যানসনের কেউ বোধ হয় এখনও ব্যাপারটা জানতে পারেনি !

না। যাতে কেউ না জানতে পারে সেইরকম ব্যবস্থাই আমরা করেছি। শত্রুঘ্ন বললে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে কিরীটী দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

রাধেশ ব্যানার্জী এগিয়ে যায় আরাম-কেদারাটার দিকে। বেশ দামী নীচু সাইজের আরাম-কেদারাটা ডানলোপিলো দিয়ে মোড়া। উপবিষ্ট অবস্থায় চেয়ারের উপরে মৃতদেহটার দিকে তাকাল রাধেশ ব্যানার্জী।

শত্রুঘ্ন ফোনে যেমন বলেছিল ঠিক তেমনিই।

কিরীটীও রাধেশ ব্যানার্জীর পাশে দাঁড়িয়ে তাকাল মৃতদেহের দিকে।

পরনে মিহি শান্তিপুরী ধুতি ও গায়ে সাদা গরম পাঞ্জাবি—সোনার বোতাম লাগানো পাঞ্জাবিতে। বাঁদিকে উপরে পাঞ্জাবির বুকের কাছে সিকি-পরিমাণ একটি রক্তচিহ্ন, কিছুটা যেন কালচে হয়ে শুকিয়ে আছে। বাঁ হাতের কব্জীতে দামী সোনার ঘড়ি। পাঞ্জাবির কোন বুকপকেট নেই।

মৃতদেহ একবার স্পর্শ করে দেখল কিরীটী, রাইগার মরটিস্ সেট-ইন করে

গিয়েছে।

ভাল করে লক্ষ্য করেও মৃতদেহের অনাবৃত অংশে আর কোন ক্ষতচিহ্ন কিরীটীর চোখে পড়ল না।

কিরীটী তখন পাঞ্জাবিটা তুলে পরীক্ষা করল—বুকের বাঁদিকে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র, তার চারপাশেও রক্ত জমাট বেঁধে আছে। বুঝতে কষ্ট হয় না, ঐ ছিদ্র-পথেই রক্তক্ষরণ হয়ে জামা সিক্ত করেছে।

কিরীটী অতঃপর মৃতদেহের কাছ থেকে সরে ঘরের চারিদিক দেখতে শুরু করে।

বেশ বড় সাইজের ঘর—শয়নঘর। আরাম-কেদারাটার হাতচারেক পিছনে একটি ডাবল-বেড। ডানলোপিলো পাতা। উপরে ফিকে আকাশ-নীল রঙের চাদর বিছানো। বিছানার চাদর দেখলেই বোঝা যায় রাত্রে সেটা আদৌ ব্যবহৃত হয়নি। শয্যা কেউ স্পর্শও করেনি। টান-টান—একেবারে নির্ভাজ শয্যা।

মাঝামাঝি জায়গায় ফিকে আকাশ-নীল রঙের কভার দেওয়া দুটো মাথার বালিশ। সে দুটোও যে কেউ স্পর্শ করেনি তার সংস্থাপন থেকেই বোঝা যায়। পায়ের কাছে দামী একটা বিলাতী কম্বল ভাঁজ করা রয়েছে।

শিয়রের সামনে গোলাকার নীচু একটা টেবিলের উপরে একটা বেড-ল্যাম্প, ডোমটা তার দামী ও বিদেশী। পাশে একটি টেবিল-ক্লক। আলোটা তখনও জ্বলছে। টেবিল-ল্যাম্পটার পাশে ফিকে আকাশ-নীল রঙের টেলিফোন। টেবিলের উপরে গোটা দুই বই, একটা ডাইরী ও একটা ফ্ল্যাট ফাইল। ঘরে এয়ার-কনডিশন ফিট করা রয়েছে।

কিরীটীর নজর চারিদিকে ঘুরতে থাকে ঘরের মধ্যে।

ঘরের দেওয়ালে ফিকে আকাশরঙের প্লাসটিক ইমালশন রং দেওয়া। সব জানালাই বন্ধ, মাত্র একটি ছাড়া—দক্ষিণমুখী।

ভারী আকাশ-নীল রঙের দামী পর্দা দু'পাশে টানা, ঐ জানালাটি ছাড়া—বাকি সব জানালাগুলো ও দরজায় পর্দা ঢাকা। ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচড্ বাথরুমের দরজাটা সামান্য খোলা, সিঙ্গল দরজা।

মেঝেতে পুরু নরম নীল রঙের দামী কার্পেট বিছানো।

এক কোণে একটি গডরেজের আলমারি—প্রমাণ-সাইজ আয়না বসানো আলমারির একটা পাল্লায়। অন্যদিকে একটি ড্রেসিং-টেবিল। টেবিলের উপর একগাদা ফাইল। ঘরের মধ্যে একটি চেস্ট ড্রয়ারও আছে।

কিরীটী প্রথমে এগিয়ে গিয়ে আলমারিটা টেনে দেখল—তালা বন্ধ। কিন্তু আলমারির তালার গায়ে একটুকরো সাদা উল জড়িয়ে ছিল, সেটা টেনে খুলে পকেটে রেখে দিল।

চেস্ট-ড্রয়ারটা কিন্তু খোলাই ছিল, ঢাকনাটা তুলতেই নজরে পড়ল নানা ধরনের স্কচ হুইস্কির বোতল। নানা ধরনের গ্লাস সোডা সাইফন সাজানো।

মনে হচ্ছে মিঃ বিশ্বাসের ড্রিংকিং হ্যাবিট ছিল, তাই না শত্রুঘ্নবাবু?

হঠাৎ কিরীটীর প্রশ্নে ফিরে তাকাল শত্রুঘ্ন কিরীটীর মুখের দিকে, হ্যাঁ, রাত্রে

তিনি নিয়মিত ড্রিংক করতেন।

আপনি তাহলে জানতেন সেকথা ?

জানতাম। মৃদুকণ্ঠে শত্রুঘ্ন বললে কথাটা।

কথাটা আপনার শোনা, না দেখা নিজের চোখে ? কিরীটী আবার প্রশ্ন করল।

দেখেছি।

কিরীটী তখনও চেস্ট-ড্রয়ারটার সামনে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ কিরীটীর নজরে পড়ল একটি গ্লাস, গ্লাসের তলায় তখনও সামান্য তরল পদার্থ দেখা যাচ্ছে যেন।

পকেট থেকে রুমাল বের করে গ্লাসটা সেই রুমালের সাহায্যে নাকের কাছে তুলে ঘ্রাণ নিল। তারপর বললে, কাল রাত্রেও ড্রিংক করেছিলেন মনে হচ্ছে !

শত্রুঘ্ন আর রাধেশ ব্যানার্জী চেয়ে থাকে কিরীটীর মুখের দিকে।

ওরা বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারে না। কিরীটীর কথাটার ঠিক তাৎপর্য কি !

মিঃ ব্যানার্জী ? কিরীটী ডাকল।

কিছু বলছেন মিঃ রায় ?

রাধেশ ব্যানার্জী কিরীটীর দিকে তাকাল।

হ্যাঁ, ঐ গ্লাসটা সঙ্গে নেবেন তো !

শত্রুঘ্নবাবু ? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে শত্রুঘ্নকে।

বলুন ! শত্রুঘ্ন তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

কাল রাত্রে কখন বের হয়েছিলেন মিঃ বিশ্বাস ?

সনাতন বলছিল রাত এগারটায় নাকি একটা টেলিফোন-কল পেয়ে আশুবাবু বের হয়ে যান।

আর একটা কথা, উনি কি সাধারণতঃ বেরুবার সময় ধুতি-পাঞ্জাবিই পরে বেরুতেন ?

বড় একটা না—বেশীর ভাগই সুট পরে বেরুতেন।

হুঁ। আচ্ছা কাল রাত্রে উনি তারপর কখন ফিরেছিলেন ?

রাত তিনটে নাগাদ। শত্রুঘ্ন জবাব দিল।

কিরীটী প্রশ্ন করে, কেউ তাঁকে ফিরে আসতে দেখেছিল নিশ্চয়ই !

হ্যাঁ, সনাতন দেখেছিল।

তাকে একবার ডাকুন তো। কিরীটী বললে।

শত্রুঘ্ন ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী অতঃপর এগিয়ে গিয়ে ডাইরীটা তুলে নিয়ে কয়েকটা পাতা উলটে-পালটে দেখে ডাইরীটা পকেটে রেখে দিল।

মিঃ রায় ?

রাধেশ ব্যানার্জীর মুখের দিকে তাকাল কিরীটী।

কি মনে হচ্ছে ব্যাপারটা—শত্রুঘ্নবাবু যা সন্দেহ করেছেন, আপনারও কি তাই মনে হচ্ছে ?

আপনার কি মনে হয় ! কিরীটী পাল্টা প্রশ্ন করল।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কারণ মৃতদেহে ঐ বাঁদিকটার বুকে একটা ছুঁচ-পরিমাণ ছিদ্র ছাড়া কোন আঘাতের চিহ্নই দেখছি না।

আর আঘাতের প্রয়োজন ছিল না হত্যাকারীর, তাই দেখতে পাচ্ছেন না? মোক্ষম জায়গায় মোক্ষম আঘাতই করা হয়েছিল, আর তাতেই মৃত্যু হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

তাহলে আপনারও ও ব্যাপারটা—

হ্যাঁ, মনে তো হচ্ছে খুন করাই হয়েছে।

কিন্তু—

কি?

রাধেশ ব্যানার্জী কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, তাহলে তো মনে হচ্ছে মিঃ রায়, রাত তিনটের পর আশু বিশ্বাস ফিরে এসে বোধ হয় চেয়ারটায় বসেছিলেন, সেই সময়েই কেউ তাঁকে হত্যা করে, তারপর সরে পড়েছে।

ডাক্তারের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত ঠিক কতক্ষণ আগে আশু বিশ্বাস মারা গিয়েছেন বলা শক্ত এবং সেটা না জানা পর্যন্ত আপনার অনুমান সত্য কিনা তাও বলা শক্ত। তাছাড়া আরও একটা কথা আপনাকে চিন্তা করতে হবে! কিরীটী বললে।

কি বলুন তো?

বসা অবস্থায় নিশ্চয়ই কেউ তাঁকে মৃত্যু-আঘাত হানেনি!

কি বলতে চান আপনি, মিঃ রায়?

আমার অনুমান, হয়তো কেউ আশু বিশ্বাসকে হত্যা করার পর তাঁকে চেয়ারে ঐভাবে বসিয়ে রেখে চলে গিয়েছে।

তাহলে ঐ বুকের কাছে পিন-পয়েন্ট-উণ্ডটাই বলছেন মৃত্যুর কারণ?

আপাতত তো সেই রকমই মনে হচ্ছে। ডাক্তারী শাস্ত্রে বলে, ঐখানেই দেহের হৃৎপিণ্ডের অবস্থান। এখন কথা হচ্ছে—

কি?

এই ঘরের মধ্যেই যদি আততায়ী এসে তাঁকে অতর্কিতে কোনরকম আঘাত করে থাকে, তাহলে প্রথমতঃ মৃতের দেহের কোথাও-না কোথাও আঘাতের যেমন চিহ্ন থাকবে তেমনি অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে নিশ্চয়ই আশু বিশ্বাস চিৎকার করেছিলেন! দ্বিতীয়তঃ struggleও হয়তো মৃত্যুর পূর্বে করেছিলেন, যেটা খুবই স্বাভাবিক—অবিশ্যি যদি তৎক্ষণাৎ মৃত্যু না হয়ে থাকে এবং যেটা হয়তো কারও পক্ষে এ বাড়িতে শোনাও সম্ভব। কিন্তু বর্তমানে যা কিছু আমরা ভাবছি সবটাই অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয় এবং আমাদের অনুমানটা কতদূর এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য সেটাও ময়না তদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত আমরা স্থির করতে পারছি না। কারণ যে ইনজুরি মৃত্যু ঘটিয়েছে সেটা ঠিক কতখানি মারাত্মক সেটা তাঁরাই বলতে পারবেন এবং বুকের ঐ pinpoint injuryটাই মৃত্যুর কারণ কিনা সে সম্পর্কেও হয়তো তাঁরাই আলোকপাত করতে পারবেন ময়না তদন্তের দ্বারা।

॥ পাঁচ ॥

ঐ সময় সনাতনকে নিয়ে শত্রুঘ্ন এসে ঘরে ঢুকল।

কিরীটী সনাতনের মুখের দিকে তাকাল।

বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স হবে সনাতনের। বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা এবং তেল-চকচকে। বোঝা যায় সনাতন এ বাড়িতে আরামেই থাকে।

পরনে একটা পরিষ্কার ধুতি—গায়ে একটা হাত-কাটা গরম ফতুয়া। রগের দু'পাশে দু-একগাছি রুপালি কেশ নজরে পড়ে। মুখটা চৌকো প্যাটার্নের, নাকটা বসা, চোখ দুটো ছোট ছোট। চোখের পাতা পিটপিট করা একটা বদ অভ্যাস সনাতনের।

তোমার নাম সনাতন? রাধেশ প্রশ্ন করে।

আজ্ঞে সনাতন সামন্ত।

বাড়ি কোথায়?

আজ্ঞে মেদিনীপুর জেলার কাঁথিতে।

এ বাড়িতে কতদিন কাজ করছ তুমি?

সনাতন বললে, দশ-এগার বছর—

কিরীটী সনাতনের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করে, অনেক বছর আছ এ বাড়িতে তাহলে তুমি সনাতন, কি বল?

আজ্ঞে।

বাবুর দেখাশোনা সাধারণতঃ কি তুমিই করতে সনাতন?

আজ্ঞে।

তাহলে তো তুমি অনেক খবরই দিতে পারবে বোধ হয়!

আজ্ঞে?

বলছিলাম অনেকদিন যখন বাবুর দেখাশোনা করছ, তখন তোমার বাবু সম্পর্কে সব কিছুই তো জানা থাকার কথা, তাই না সনাতন?

আজ্ঞে।

বল তো, তোমার বাবুর মেজাজ কেমন ছিল?

ঠাণ্ডা, ধীর প্রকৃতির।

স্বাভাবিক। আচ্ছা তাঁর চরিত্র?

কি বললেন?

তোমার বাবু মদটদ খেতেন তো নিয়মিত!

তা—তা—

খেতেন?

আজ্ঞে।

খুব বেশী খেতেন কি—মানে বলছিলাম, মাতাল-টাতাল হতে তাঁকে দেখেছ কখনও?

আজ্ঞে না। অনেক মদ খাবার পরও তাঁকে কখনও মাতলামি করতে দেখিনি।

সনাতন!

আজ্ঞে?

এ বাড়িতে কোন স্ত্রীলোক তো নেই?

আজ্ঞে না।

বাবুর তো স্ত্রী ছিলেন, তা তিনি কখনও আসতেন না?

দেখিনি কখনও আসতে তাঁকে, তবে বাবু, আমি জানতাম তাঁর স্ত্রী আছেন।

তাঁকে দেখেছ কখনও?

না।

আচ্ছা আর কোন স্ত্রীলোক আসত না কোন সময় কখনও তোমার বাবুর কাছে?

সনাতন একটু যেন কেমন ইতস্ততঃ করে মাথাটা নীচু করে।

আসতো, তাই না?

কিরীটী প্রশ্নটা করে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে সনাতনের দিকে।

আজ্ঞে—

কে বল তো?

নুরুন্নেসা বেগমসাহেবা। তিনি প্রায়ই রাত্রে আসতেন।

তাঁর বয়স কত?

ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বা কিছু বেশী হবে—ঠিক বলতে পারি না, তবে দেখলে অত মনে হয় না।

দেখতে কেমন?

খুব সুন্দরী।

বেশভূষা—, বলেই হঠাৎ থেমে শুধাল, আচ্ছা বোরখা ব্যবহার করতেন তিনি?

বোরখা?

হ্যাঁ!

কই, না?

তা তোমার বাবুর ঘরে এলে সাধারণতঃ তিনি কতক্ষণ থাকতেন?

তা কখনও কখনও ঘণ্টা তিন-চারও থাকতেন।

শত্রুঘ্ন নির্বাক দৃষ্টিতে সনাতনের মুখের দিকে তাকিয়ে তার জবানবন্দি শুনছিল।

সংবাদটা তার কাছে নতুন।

কিরীটীর সজাগ দৃষ্টি কিন্তু ব্যাপারটা এড়ায় না।

শত্রুঘ্নবাবু?

কিরীটীর প্রশ্নে শত্রুঘ্ন তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে এবারে।

নুরুন্নেসা বেগমকে জানেন?

না।

কখনও দেখেননি তাকে?

না।

নামটাও শোনেননি কখনও ?

না।

আচ্ছা সনাতন—আবার কিরীটী সনাতনের দিকে তাকিয়ে তাকে প্রশ্ন শুরু করল।

আজ্ঞে ?

কতদিন ধরে নুরুন্নেসা বেগম এখানে যাতায়াত করছেন ?

তা বছরখানেক হবে।

তিনি কোথায় থাকেন জান ?

আজ্ঞে এই বাড়িরই চারতলায় একটা ফ্ল্যাটে থাকেন—১৮নং ফ্ল্যাট।

I see ! তা তাঁর সঙ্গে ঐ ফ্ল্যাটে আর কে থাকে ?

তার স্বামী হামিদুল সাহেব।

হামিদুল সাহেব কি করেন জান ?

আজ্ঞে না।

যাক—তুমি যখন জান না সেকথা থাক। আচ্ছা শুনলাম, তুমি কাল রাত্রে তোমার বাবুকে ফিরতে দেখেছিলে ?

আজ্ঞে।

রাত তখন ক'টা হবে বলতে পার ?

বোধ হয় তিনটে—

তিনটে !

আজ্ঞে ঐরকমই হবে।

তুমি তখন কি করছিলে ? অত রাত্রে নিশ্চয়ই জেগে ছিলে না ?

আজ্ঞে না। বাবু তো মধ্যে মধ্যে অনেক রাত্রে ফিরতেন—আমি রাত সাড়ে এগারটার বেশী কখনও জেগে থাকতাম না।

তুমি যদি কাল রাত্রে তিনটে নাগাদ সময়ে জেগে না থাক, তাহলে জানলেই বা কি করে যে তোমার বাবু যখন ফিরেছেন রাত তখন তিনটে হবে ?

আজ্ঞে দুটো ঘরের পরের ঘরেই তো আমি থাকি রাত্রে। বাবুর কখনও যদি রাত্রে দরকার হয়—তারপর একটু থেমে বললে, রাত তখন তিনটেই হবে বা কিছু বেশী, কারণ একটু আগে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল এবং সে সময় করিডোরের ঘড়িতে রাত তিনটে বাজতে শুনেছিলাম—তারই কিছু পরে করিডোরে বাবুর জুতোর শব্দ পেয়েছিলাম।

জুতোর শব্দ পেয়েছিলে—উঠে কি দেখেছিলে তিনি তোমার বাবু কিনা ?

আজ্ঞে না, কিন্তু ভেবেছিলাম বাবুই—তাই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম, বাবু যদি ডাকেন বেল বাজিয়ে !

ঘরে তোমার কলিং বেল আছে ?

হ্যাঁ, দরকার হলে রাত্রে বাবু ডাকতেন।

ঠিক আছে। কিন্তু বাবুকে তুমি যখন দেখনি তখন ঠিক কি করে বুঝলে,

যে করিডোর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সে তোমার বাবু ছাড়া আর কেউ নয় ?

আজ্ঞে এই করিডোরে আর তো কারো আসা সম্ভব নয়, কারণ একমাত্র বাবুর কাছেই কোলাপসিব্‌ল্‌ গেটের চাবি থাকত আর একটা থাকত আমার কাছে। আমিও বাবু বের হয়ে যাবার পরই কাল রাত্রে গেটে তালা দিয়ে শুতে গিয়েছিলাম, কাজেই বাবু ছাড়া আর কে তালা খুলে ভিতরে আসবে, চাবিই বা পাবে কোথায় বলুন ?

কিরীটী মৃদু হাসল।

তারপর একটু থেমে আবার প্রশ্ন শুরু করে, তা ঠিক। আচ্ছা সনাতন, সকালে কখন উঠেছ আজ ?

ভোর পাঁচটায়—সাড়ে পাঁচটায় বাবু চা খেতেন—র-চা লেবুর রস দিয়ে—

বাবুর ঘরে কখন গিয়েছিলে ?

ঐ সাড়ে পাঁচটাতেই।

গেট তখন খোলা ছিল ?

আজ্ঞে না—তালা দেওয়া ছিল। সকালে উঠে গেটের তালা খুলে আমি চা তৈরি করতে যাই।

হুঁ। আচ্ছা সনাতন, তুমি কত মাইনে পেতে ? কিরীটীর প্রশ্ন।

বাবু আমাকে মাসে একশো টাকা করে দিতেন—তাছাড়া যখন যা দরকার হত, দু'শো একশো দিতেন।

আচ্ছা গতকাল কে কে তোমার বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এবং তোমার বাবু কতক্ষণ তাঁর ঘরে ছিলেন বলতে পার ?

কাল তো প্রায় সারাদিনই বাবু ঘরে ছিলেন। ঐ সেক্রেটারী বাবুই তো রাত দশটা নাগাদ একবার এসেছিলেন।

কিরীটী শত্রুঘ্নর দিকে একবার তাকাল, তারপর সনাতনকে আবার প্রশ্ন করল, আচ্ছা ঐ রাত্রে ছাড়া আর সারাটা দিন কি তিনি বের হননি ?

না। সর্দিমত হয়েছিল বলে বের হননি—রাত্রে ফোন পেয়ে বের হন।

ফোন যখন আসে তুমি কোথায় ছিলে ?

এই ঘরেই।

বাবু তখন কি করছিলেন ?

ড্রিংক করছিলেন।

ফোন কোথা থেকে কে করেছিল, কিছু আন্দাজ করতে পার ?

আজ্ঞে না।

ফোন পাওয়ার পর বাবু তোমাকে কি বলেছিলেন ?

বলেছিলেন, একটু বেরুচ্ছেন—তাড়াতাড়িই ফিরবেন।

নিজের গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন ?

না, গাড়ি তাঁকে নিতে এসেছিল—আমাদের ড্রাইভার রামকরণ বলছিল।

তাঁকে নিতে অন্য গাড়ি এসেছিল ?

হ্যাঁ।

ড্রাইভার রামকরণকে একবার ডাকতে পার ?

এখুনি ডেকে আনছি বাবু !

সনাতন ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

শত্রুঘ্নবাবু ! কিরীটী আবার শত্রুঘ্নকে প্রশ্ন করল।

আপনি তো আশুবাবুর পারসোন্যাল সেক্রেটারী ছিলেন এবং এই বাড়িরই একটা ফ্ল্যাটে থাকেন, অথচ নুরুন্নেসা বেগমকে কখনও দেখেননি বা তার নামও শোনেননি ?

না, এ বাড়ির অনেকগুলো ফ্ল্যাট, অনেকেই তো থাকেন—তাঁদের সকলকেই তো চিনি না, চেনাবার দরকারও হয়নি—তাছাড়া আমার কাজ ছিল সম্পূর্ণ লেখাপড়ার ব্যাপার—

নুরুন্নেসা বেগমকে তাহলে আপনি কখনও দেখেন নি ?

না। আর সেকথা তো একটু আগেই আপনাকে আমি বললাম !

ভাল কথা, কাল রাত দশটায় আপনি এ ঘরে এসেছিলেন শুনলাম !

হ্যাঁ।

কেন ?

'বজ্রধ্বনি'র সম্পাদকীয়টা আশুবাবুকে একবার পড়ে শোনাবার জন্য—কারণ তাঁকে না পড়ে শুনিয়ে সম্পাদকীয় কখনও ছাপা হত না আর সেই রকমই তাঁর নির্দেশ ছিল।

কতক্ষণ ছিলেন এ ঘরে ?

তা আধ ঘণ্টাখানেক হবে।

তাহলে সাড়ে দশটা নাগাদ আপনি এ ঘর থেকে বের হয়ে যান ?

হ্যাঁ।

তারপর ? মানে তারপর আপনি কোথায় ছিলেন, কি করছিলেন ?

আমি একবার রাত পৌনে এগারটা নাগাদ 'বজ্রধ্বনি' অফিসে যাই সম্পাদকীয়টা দিতে।

ফেরেন কখন ?

রাত সাড়ে এগারটা পৌনে বারোটা নাগাদ হবে।

তারপর আর বের হননি ?

না।

কখন ঘুমিয়েছিলেন—শোবার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই নয় ?

ঠিক বলতে পারি না, তবে কাল রাত্রে বোধ করি রাত সাড়ে বারোটা নাগাদই ঘুম এসে গিয়েছিল।

আচ্ছা শত্রুঘ্নবাবু আপনি তো মিঃ বিশ্বাসের একান্ত সচিব ছিলেন, অনেক কথাই হয়ত তাঁর সম্পর্কে আপনি জানতে পেরেছেন—তিনিও হয়ত বলতেন—

কাজকর্ম মানে ব্যবসা ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোন ধরনের কথাই তাঁর সঙ্গে আমার হত না—মানে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কোন

আলোচনা হয়নি, হতও না।

আচ্ছা একটা কথা, তাঁর কোন শত্রু ছিল কিনা বলতে পারেন ?

থাকাটা কিছু আশ্চর্য নয়—বিশেষ করে পার্টির ব্যাপার, কিছুদিন আগেই তো সন্তোষ সিংহ নামে একজনের সঙ্গে তাঁর বেশ কথা-কাটাকাটি মানে তর্কাতর্কি হয়েছিল।

সন্তোষ সিংহ বুঝি ওঁরই দলের লোক ছিল ?

ছিল, তবে কিছুদিন আগে দল ছেড়ে চলে গিয়েছে।

আচ্ছা আশু বিশ্বাসের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী বিশ্বাস বালিগঞ্জে কোথায় থাকেন বলতে পারেন ?

ফোন-গাইডে তাঁর ঠিকানা পেতে পারেন, কারণ তাঁর বাড়িতে ফোন আছে জানি, ঠিকানা আমি জানি না।

আপনি জানেন না তাঁর ফোন নাম্বার ?

না।

শত্রুঘ্নবাবু !

বলুন ?

আশুবাবুর ব্লাড-প্রেসার ছিল কিনা জানেন ?

বোধ হয় ছিল।

কি করে বুঝলেন ?

দু-একবার ডাঃ সান্যালকে ওঁর প্রেসার চেক করতে আসতে দেখেছি।

ডাঃ সান্যাল !

ডাঃ বি. সান্যাল—তিনি ওঁকে দেখাশুনা করতেন।

আপনি উপরে একবার আঠারো নম্বর ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখুন তো, নুরুন্নেসা বেগম ও তাঁর স্বামী ফ্ল্যাটে আছেন কিনা—থাকলে অপেক্ষা করতে বলবেন, আমরা আসছি।

শত্রুঘ্ন ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

রাধেশবাবু !

কিছু বলছিলেন ?

ময়না তদন্তের রিপোর্ট আজকের মধ্যে পাওয়া যাবে ?

চেষ্টা করব।

হ্যাঁ, ওটা যত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় ততই ভাল কারণ ময়না তদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর সঠিক কারণটা বোঝা যাচ্ছে না।

আপনার তাহলে নিশ্চিত ধারণা যে আশুবাবুর মৃত্যুর কারণ তাঁর বুকের বাঁ পাশে ঐ pinpoint ইনজুরীটাই ? রাধেশ ব্যানার্জী বললে।

আমার তাই অনুমান—একটু আগেই তো বললাম আপনাকে কথাটা, যাক ও নিয়ে এখনই না ভাবলেও চলবে। মৃতের জামার পকেটগুলো একবার পরীক্ষা করে দেখুন না !

রাধেশ ব্যানার্জী এগিয়ে গেল।

মৃত ব্যক্তির জামার পকেট হাতড়ে একটা পকেট থেকে একটা চাবির রিংয়ে এক গোছা চাবি, অন্য একটা পকেটে চল্লিশটা একশো টাকার নতুন কড়কড়ে নোট—চার হাজার টাকা পাওয়া গেল।

রাধেশ বলল, Funny ! এত টাকা সঙ্গে নিয়ে লোকটা বের হয়েছিল কাল রাত্রে ?

হয়ত কোন লেনদেনের ব্যাপার ছিল। কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বললে।

লেনদেন !

হ্যাঁ, লেনদেনও হতে পারে, অথবা—

অথবা ?

আর কিছুও হতে পারে।

আর কিছু ?

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল রাধেশ কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ। কিরীটী বললে, যার মধ্যেই ওর মৃত্যুর কারণ হয়ত নিহিত রয়েছে।

কি বলতে চান ?

বর্তমানে আর কিছু বলতে চাই না রাধেশবাবু, সবার আগে এখন আমাদের ময়না তদন্তের রিপোর্টটা দরকার।

কোন কিছু অনুমান করতে পারছেন না মিঃ রায় ? রাধেশ প্রশ্ন করে পুনরায়।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, না, অত সহজ মনে হচ্ছে না যেন ব্যাপারটা ! কারণ দেখা যাচ্ছে ভদ্রলোক গভীর জলের মাছ ছিলেন—কথাগুলো বলতে বলতে কিরীটী হাতের চাবির গোছাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল।

রাধেশ বললে, ঐ চাবির মধ্যেই মনে হচ্ছে ঐ স্টিলের আলমারির চাবিটাও বোধ হয় আছে !

সম্ভবতঃ। দেখুন তো, এর কোন চাবি লাগে কিনা।

রাধেশ কিরীটীর হাত থেকে চাবির গোছাটা নিয়ে আলমারির দিকে এগিয়ে গেল। গোটা দুই বড় চাবি গডরেজের বেছে নিয়ে তারই একটা আন্দাজে আলমারির চাবির ফোকরে ঢুকিয়ে ঘোরাতেই আলমারিটা খুলে গেল।

রাধেশ বললে, খুলেছে ! দেখবেন নাকি আলমারির ভিতরটা ?

না। আবার বন্ধ করে রাখুন। চাবিটা আপনার কাছে রাখুন—, বলতে বলতে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল কিরীটী।

বাথরুমের দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল। বেশ বড় সাইজের বাথরুম—বাথটাব, শাওয়ার, গরম জলের হিটার, কমোড, দেওয়াল জুড়ে আয়না, সেভিং ও নানা ধরনের দামী দামী বেশীর ভাগই বিদেশ থেকে আনা প্রসাধন দ্রব্য—সব কিছুই সুন্দর ভাবে সাজানো।

কিরীটী মনে মনে বলে, ভদ্রলোক দেখছি বেশ শৌখিন ছিলেন !

হঠাৎ চারিদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে নজরে পড়ল, বেসিনের কলটা পুরোপুরি বন্ধ নয়—জল পড়ে যাচ্ছে বেসিনে।

একটা সাবানও বেসিনের সোপ-সকেটে রয়েছে।

কিরীটী ঘুরে তাকাল দেওয়ালের ব্র্যাকেটের দিকে। টার্কিশ তোয়ালেটা এলোমেলো ভাবে ঝুলছে।

॥ ছয় ॥

ভ্রূ কুঞ্চিত করে কিছুক্ষণ তোয়ালেটা দেখল। তারপর বাথরুম থেকে বের হয়ে এল কিরীটী।

রাধেশ প্রশ্ন করে, আর কিছু বোধ হয় এখানে আমাদের দেখবার নেই কিরীটীবাবু?

না, চলুন। একবার কোলাপসিব্‌ল্‌ গেট ও তালাটা দেখতে হবে।

সনাতন দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল—কাঁদছিল লোকটা।

সনাতন!

আজ্ঞে! কিরীটীর ডাকে সনাতন সাড়া দেয়।

তোমার কাছে যে চাবিটা আছে ঐ কোলাপসিব্‌ল্‌ গেটের তালার, সেটা নিয়ে এস তো!

কিরীটীর দিকে তাকিয়ে একটা চাবির রিং বের করে দিল নিজের পরিহিত ফতুয়ার পকেট থেকে সনাতন।

কিরীটী চাবিটা হাতে নিয়ে গেটের তালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সাধারণ পিতলের একটা ভারী তালা—চাবিটা ফোকরে ঢোকাবার আগে তালাটা ধরে টানতেই তালাটা খুলে গেল।

কিরীটী চাবি দিয়ে তালাটা লাগাতে গেল, কিন্তু চাবি পুরোপুরি ঘুরল না, তালাটা বন্ধ হল না।

তালাটা তো দেখছি খারাপ সনাতন—, কথাটা বলে কিরীটী সনাতনের দিকে তাকাল, চাবিতে বন্ধ হচ্ছে না তালা—

বন্ধ হচ্ছে না! সনাতন যেন রীতিমত বিস্মিত।

না। তোমার ঠিক খেয়াল আছে তো যে, তুমি আজ সকালে বন্ধ-তালা খুলেছিলে?

আজ্ঞে বন্ধই তো ছিল। কেমন যেন সনাতন ইতস্তত করে এবং একটু যেন বিব্রতও বোধ করে বুঝি।

কিরীটী আবার পরীক্ষা করে মৃদুকণ্ঠে বললে, রাধেশবাবু, তালাটা নিয়ে নিন আর আপনাদের একটা তালা এই গেটে লাগাবার ব্যবস্থা করুন।

ঠিক আছে। রাধেশ বলল।

সনাতন!

আজ্ঞে।

কাল রাত্রে তোমার বাবু বের হয়ে যাবার পর গেটের তালাটা বন্ধ করে ভাল

করে টেনে দেখেছিলে তো যে তালাটা ঠিক আটকেছে কিনা ?

দেখেছি আজ্ঞে—তালা টেনে দেখেছি বন্ধ ছিল !

কিরীটী আর কোন কথা না বলে রাধেশ ব্যানার্জীর দিকে তাকাল, চলুন রাধেশবাবু, ১৮নং ফ্ল্যাটের আমাদের বেগমসাহেবার সঙ্গে দেখা করা যাক।

সেই ভদ্রমহিলা এই ব্যাপোরের সঙ্গে জড়িত আছে বলে কি আপনার সন্দেহ হচ্ছে কিরীটীবাবু ?

সন্দেহের কথা যদি বলেন তো অনেককেই সন্দেহ করতে হয়—যেমন ধরুন ভৃত্য সনাতন, একান্তসচিব তাঁর শত্রুঘ্নবাবু, আশু বিশ্বাসের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী বিশ্বাস—

কিন্তু তিনি তো এখানে থাকতেন না !

না থাকলেও একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন—ওঁদের আজ পর্যন্ত ডিভোর্সও হয়নি, লেনদেনও চলছিল।

কিন্তু অর্থ তো মাসে মাসে পাচ্ছিলেন !

অর্থই তো সব সময় অনর্থের মূল নয় রাধেশবাবু !

তবে ?

ধরুন দীর্ঘকালের একটা আক্রোশ বা ঘৃণা—যা দিনের পর দিন সঞ্চিত হয়েছে ভদ্রমহিলার বুকে, অবশেষে তারই কুটিল প্রকাশ হয়ত !

দু'জনে কথা বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে চারতলায় উঠছিল।

সিঁড়ি বেশ চওড়া। ঝকঝকে মোজেইকের তৈরী সিঁড়ি। এক পাশ দিয়ে লিফটের ওঠা-নামার ব্যবস্থা।

চারতলাটাও ঠিক তিনতলার নকশামতই। তেমনি করিডোর—পর পর তিনটি ফ্ল্যাট।

১৮নং ফ্ল্যাটের সামনেই শত্রুঘ্ন দাঁড়িয়েছিল ওদের অপেক্ষায় বোধ হয় !

কি হল, বেগমসাহেবাকে খবরটা দিয়েছেন ? কিরীটী প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ। শত্রুঘ্ন বললে।

আর কিছু বলেছেন ?

না, কেবল বলেছি আপনারা দেখা করতে আসছেন, তাই শুনে বললেন বেগমসাহেবা, পুলিসের তাঁর সঙ্গে কি দরকার তিনি বুঝতে পারছেন না !

আশুবাবু মারা গেছেন বলেছেন ?

না।

ভাল কথা, তাঁর স্বামী আছেন তো ?

না, তিনি নেই।

নেই মানে ?

শুনলাম আজ দু'দিন হল তিনি পাটনা গিয়েছেন, কাল বা পরশু আসবেন !

কিরীটী আর কোন প্রশ্ন করে না। রাধেশ ব্যানার্জীকে চোখ-ইশারায় অনুসরণ করতে বলে দুজনে দরজার ভারী দামী পর্দাটা তুলে ভিতরে প্রবেশ করল।

শৌখিন ও দামী দামী আসবাবপত্রে সাজানো ঘরটি, মেঝেতে কার্পেট বিছানো

একপাশে টেলিফোন ও একটা কটেজ পিয়ানো।

সামনে একটা ঘুরন্ত টেবিল। কোণে ত্রিকোণাকার একটি উঁচু টেবিলের উপরে সুদৃশ্য একটি ক্লক—তার পাশে ফ্লাওয়ার ভাসে একগোছা শীতের মরসুমী ফুল।

বড় বড় মেরুন রঙের ডালিয়া ও কিছু অ্যাস্টর।

ঘরের মধ্যে একটি পনের-ষোল বছরের ছোকরা—মনে হয় ভৃত্যই হবে, ঘুরে ঘুরে একটা ঝাড়নের সাহায্যে আসবাবপত্রের ধুলো ঝাড়ছিল। সে মুখ তুলে তাকাল।

কি নাম হে তোমার? রাধেশ প্রশ্ন করে।

সওকৎ।

বেগমসাহেবাকে একটা খবর দাও।

বসুন—খবর দিচ্ছি।

সওকৎ বেশ চটপটে—ভিতরে চলে গেল মধ্যবর্তী দরজার পর্দাটা তুলে।

একটু পরেই নুরুন্নেসা বেগম ঘরে এসে প্রবেশ করল।

পরনে ফিকে নীলরঙের পায়জামা, পায়ে চপ্পল, গায়ে একটা ঢিলে ব্লাউজের মত, তার উপরে একটা সাদা শাল জড়ানো।

নমস্তে। বেগম নুরুন্নেসা ওদের সাদর আহ্বান জানাল।

কিরীটী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল নুরুন্নেসা বেগমকে।

বেগমসাহেবাকে সুন্দরী বললে ভুলই বলা হবে—কারণ তিনি সুন্দরী নন, তবে বয়েস যাই হোক না কেন এবং বয়েসের ছাপ চোখে-মুখে থাকলেও সিম ফিগারে যৌবনের একটা অত্যুগ্র আকর্ষণ যেন এখনও আগুনের মত সর্ব দেহ ও চোখ-মুখে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে।

ঐ সমগ্র চেহারার মধ্যে যেন আছে বিচিত্র একটা যৌন আবেদন এবং সেই যৌন আবেদনের কাছে যে কোন পুরুষ বোধ হয় নিজেকে সমর্পণ করতে পারে, পতঙ্গ যেমন আগুনের শিখার দিকে ছুটে যায় তেমনি। কাজেই প্রৌঢ় আশু বিশ্বাস যদি বেগমসাহেবার ঐ যৌন আবেদনের আকর্ষণে বহ্নিপতঙ্গের মত দগ্ধ হয়ে থাকেন তার মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই।

যদিও আশু বিশ্বাসের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়েই কিরীটী সনাতনকে প্রশ্নটা করেছিল, এখন বেগমসাহেবাকে দেখে তার মনের মধ্যে কোথাও আর সংশয়ের তিলমাত্রও থাকে না।

বুঝতে পারে কিরীটী, ঐ বহ্নিপতঙ্গের হাতে আশু বিশ্বাস নিজেকে পুরো-পুরিই সমর্পণ করেছিল।

নমস্তে।

মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠের স্বরে কিরীটী নুরুন্নেসার দিকে তাকাল।

নমস্তে।

বৈঠিয়ে।

কিরীটী ও রাধেশ ব্যানার্জী একটি সোফায় পাশাপাশি বসল।

সামনেই একটা গোল জয়পুরী পেটে সিগারেট প্যাকেট ও ম্যাচ ছিল। প্যাকেটটা তুলে নিয়ে একটা সিগারেট তা থেকে বের করে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করল বেগমসাহেবা।

একগাল ধোঁয়া ছেড়ে পূর্ববৎ সুরেলা কণ্ঠে শুদ্ধ উচ্চারিত ইংরাজীতে ইউনিফর্ম পরিহিত রাধেশের দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করল, Well Officer, what can I do for you?

কিরীটীই জবাব দিল, আমাদের কিছু জানবার ছিল ম্যাডাম—

জানবার—আমার কাছে? কামানো পেনসিলে আঁকা ভ্রূযুগল যেন একটু উত্থিত করেই প্রশ্নটা করল নুরুন্নেসা বেগম।

হ্যাঁ।

কি জানবার আছে বলুন তো?

এই ফ্ল্যাটবাড়ির মালিক আশু বিশ্বাসকে আপনি চিনতেন নিশ্চয়ই?

Why not—জানতাম বৈকি!

একজন টেনেণ্ট তার বাড়িওয়ালাকে যে ভাবে জানেন সেইটুকুই জানতেন তাঁকে, না তার চাইতেও বেশী পরিচয় ছিল?

কি বলতে চান আপনি? নুরুন্নেসা বেগম বললেন।

বুঝতে পারছেন না?

না, ঠিক—

আরও একটু স্পষ্ট করেই তাহলে বলি, তাঁর সঙ্গে কি আপনার একটু বিশেষ পরিচয়ই ছিল—মানে ঘনিষ্ঠতা—

ঘনিষ্ঠতা বলতে আপনি কি বলতে চান আমি বুঝতে পারছি না—তবে হ্যাঁ, বলতে পারেন ভালরকম পরিচয়ই ছিল।

প্রায়ই রাত্রে আপনি শুনলাম তাঁর ঘরে যেতেন?

প্রশ্নটা কি আপনার অত্যন্ত ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে না মিস্টার?

নুরুন্নেসার গলার স্বরে যেন একটা বিরক্তির আভাস।

রাধেশ ব্যানার্জী ঐ সময় বলে, প্রশ্নটার জবাব চাই বেগমসাহেবা।

যদি জবাব না দিই?

তাহলে আপনাকে খুলেই বলি কথাটা ম্যাডাম, মিঃ বিশ্বাস মারা গেছেন।

What! একটা অর্ধস্ফুট চিৎকার অতর্কিতে বের হয়ে এল যেন নুরুন্নেসার কণ্ঠ চিরে।

মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে—মার্ডার্ড!

মার্ডার্ড! You mean he is killed—poor fellow—no no, it can't be—এ সম্ভব নয়—কিছুতেই নয়—কাল সন্ধ্যাতেই তো—

সন্ধ্যাবেলা কাল তাহলে আপনার মিঃ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বেগমসাহেবা? কখন?

কিরীটী যেন অতর্কিতে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল নুরুন্নেসার দিকে।

দেখা—হ্যাঁ, মানে—, বলতে গিয়েও এবারে কথাটা যেন কেমন থমকে গেল নুরুন্নেসা বেগমের।

কাল দেখা হয়েছিল? কখন? কিরীটী তার প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করল।

সন্ধ্যা আটটা সাড়ে আটটা হবে—, নুরুন্নেসা বেগম থেমে থেমে বললে।

কোথায়, তাঁর ঘরে?

হ্যাঁ, মানে—হ্যাঁ, তাঁর ঘরেই—, নুরুন্নেসার কণ্ঠস্বরে যেন স্পষ্ট একটা দ্বিধা বিব্রত বোধ।

কতক্ষণ ছিলেন আপনি সেখানে?

আধ ঘণ্টাটাক। He had an attack of cold—just একটা খবর নিতে—

ঘরে সে সময় আর কেউ ছিল?

No—but why?

সনাতন কোথায় ছিল সে সময়—আশুবাবুর চাকর?

সে বোধ হয় দোকানে গিয়েছিল কি একটা ওষুধ আনতে। আমি তার ফেরার আগেই ঘর ছেড়ে চলে আসি।

তাহলে আপনি কাল রাত্রে যতক্ষণ আশুবাবুর ঘরে ছিলেন, ঘরে আর কোন তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না?

না।

আপনারা দুজনেই ছিলেন কেবল?

বললাম তো! নুরুন্নেসার কণ্ঠস্বরে অধৈর্য ও বিরক্তি প্রকাশ পায়।

ঠিক কতক্ষণ ছিলেন কাল সন্ধ্যায় মিঃ বিশ্বাসের ঘরে আপনি?

বেশীক্ষণ ছিলাম না।

তবু?

তা মিনিট কুড়ি-পঁচিশ বোধ করি হবে।

হুঁ। আচ্ছা আপনি তো তাঁর ঘরে প্রায়ই যেতেন?

মধ্যে মধ্যে যেতাম।

আচ্ছা যদি কিছু মনে না করেন, কি রকম ঘনিষ্ঠতা আপনাদের পরস্পরের মধ্যে ছিল?

ঘনিষ্ঠতা বলতে আপনি কি মীন করছেন জানি না, তবে উই ওয়্যার ফ্রেণ্ডস্ হু ওয়াজ এ নাইস ফেলো!

কিরীটীর চোখের তারায় যেন একটা কৌতুক ঝিলিক দিয়ে ওঠে মুহূর্তের জন্য—কিন্তু সেটা উপস্থিত কারোরই নজরে পড়ে না।

নুরুন্নেসা বেগমের তো নয়ই।

বেগমসাহেবা! আবার কিরীটী প্রশ্ন শুরু করল, এখানে এই ম্যানসনে কতদিন ভাড়া আছেন আপনি?

প্রায় চোদ্দ মাস হল।

আপনার স্বামী কি করেন?

এয়ার ট্রাভলিংয়ের নিজস্ব অফিস আছে।

কি নাম অফিসের ?

ওর নিজেরই কোম্পানি—'পানামা এয়ার ট্রাভলস্'।

আপনার স্বামী হক সাহেবের সঙ্গে মিঃ বিশ্বাসের পরিচয় ছিল নিশ্চয়ই ?

ছিল বৈকি।

আপনার স্বামী হক সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে ?

তিনি বিশেষ একটা কাজে দিল্লী গিয়েছেন, পরশু ফিরবেন।

কবে গিয়েছেন ?

পরশু।

আচ্ছা বেগমসাহেবা—, কিরীটী একটু থেমে আবার প্রশ্ন শুরু করে, আপনি একটু আগে বলেছেন, গতকাল সন্ধ্যা আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ আপনি নীচের তলায় মিঃ বিশ্বাসের ঘরে গিয়েছিলেন এবং সেখানে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট মানে আটঘণ্টাটাক ছিলেন, তাই যদি হয় তো নটা নাগাদ রাত্রে আপনি তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে আসেন—তাই তো ?

ঐ রকমই হবে।

আপনার রিস্টে ঘড়ি আছে দেখছি—সব সময়ই ব্যবহার করেন বোধ হয় ?

হ্যাঁ, ওটা আমার একটা বলতে পারেন হ্যাবিট্—প্রায়ই সময় দেখি, তাই হাতে সর্বদাই ঘড়ি পরি।

রাত্রে যখন শুতে যান তখনও কি হাতে আপনার ঘড়ি থাকে ?

নুরুন্নেসা বেগম মৃদু হেসে বললে, না, না—রাত্রে ঘড়ি খুলে মাথার বালিশের তলায় রাখি।

কিরীটী ঘড়ির প্রসঙ্গ পালটে অন্য প্রসঙ্গে গেল। বললে, এই ফ্ল্যাটের ভাড়া কত?

চারশো টাকা।

হুঁ। আচ্ছা বেগমসাহেবা, কাল রাত নটার পর মিঃ বিশ্বাসের ঘর থেকে বের হয়ে বোধ হয় এখানেই এসেছিলেন ?

না, আমি বের হয়েছিলাম রাত্রে।

তারপর ফেরেন কখন ?

রাত সাড়ে বারোটায়—নাইট শোতে সিনেমায় গিয়েছিলাম।

কিরীটী পুনরায় প্রশ্ন করে, কোন্ সিনেমায় ?

নুরুন্নেসা বেগম চৌরঙ্গীপাড়ার একটা নামী হাউসের নাম করল।

একাই ?

কিন্তু আপনি এত সব অবান্তর প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন তখন থেকে কেন বলুন তো ? হু আর ইউ ? আর ইউ এ পুলিস অফিসার ?

রাধেশ ব্যানার্জী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, হ্যাঁ, উনি পুলিসেরই লোক, উনি যা জিজ্ঞাসা করছেন তার জবাব দিন।

বাট হোয়াই ? গলার স্বরে এবারে নুরুন্নেসা বেগমের স্পষ্ট একটা বিরক্তির

আভাস যেন ফুটে বের হয়, আপনারা কি আমাকে মিঃ বিশ্বাসের মৃত্যুর ব্যাপারে কোনরকম সন্দেহ করছেন ?

জবাব দিল সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী, কেবল আপনি কেন বেগমসাহেবা—এ ফ্ল্যাটের সকলকেই সন্দেহ করা যেতে পারে !

হাউ ফ্যানটাস্‌টিক ! আপনারা কি সব আবোল-তাবোল বকছেন ? তাঁর ভাড়াটেরা তাঁকে হত্যা করতে যাবে কেন ? হোয়াই ? তা ছাড়া—

বলুন ? থামলেন কেন ?

তাঁর ফ্ল্যাটে যাবার কারও তো উপায় ছিল না !

কেন ?

কেন কি, দেখেননি তাঁর ফ্ল্যাটে ঢোকার মুখেই কোলাপসিব্‌ল্‌ গেট—সর্বদা সেটা লাগানোই থাকত আর রাত্রিবেলা তো তালা দেওয়াই থাকত !

তা থাকত, তবে বোধ হয় আপনি এখনো জানেন না একটা কথা—

কি কথা বলুন তো ?

তালাটা কেউ কাল নষ্ট করে দিয়েছিল !

কে বললে ?

আমরা পরীক্ষা করে দেখলাম তো ! রাধেশ বললে।

কিন্তু সনাতন তাহলে জানতে পারত না কি ?

পারত কিন্তু পারেনি, কারণ তালাটা নষ্ট করা হয়েছিল রাত এগারটার পর কোন এক সময়ে কাল রাত্রে। বললে কিরীটী।

কথাটা বলতে বলতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নুরুন্নেসা বেগমের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল।

নুরুন্নেসা বেগমের মুখের উপরে যেন একটা বিব্রতর ছাপ মুহূর্তের জন্য দেখা দেয়।

বেগমসাহেবা, আর একটা প্রশ্ন আপনাকে করবো—

কি প্রশ্ন ?

কালকের রাত্রের সিনেমার টিকিটের কাউণ্টার-পার্টটা কি আপনার কাছে আছে?

নিশ্চয়ই। ব্যাগে আছে।

যদি কিছু মনে না করেন, আপনি মেড্‌সারভেণ্টকে বলুন না আপনার হ্যাণ্ডব্যাগটা একবার আনতে !

আমিই আনছি। যাবার জন্য পা বাড়ায় নুরুন্নেসা বেগম, কিন্তু কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিল, না, অন্য কাউকে বলুন !

নুরুন্নেসা বেগম তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকলে, মরিয়ম ?

সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে জবাব এলো, জী !

বোঝা গেল যে জবাব দিল সে কাছেই আছে এবং সজাগ—কান পেতেই আছে ঐ ঘরের কথাবার্তা শোনার জন্য সম্ভবত।

ড্রেসিং টেবিলের উপর থেকে আমার ব্যাগটা নিয়ে আয়। নুরুন্নেসা বললে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বছর চব্বিশ-পঁচিশের একটি তরুণী হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। সুদৃশ্য এবং বেশ দামী একটি মেয়েদের হ্যান্ডব্যাগ। ছিপছিপে গড়ন, শ্যামা রং, চোখে-মুখে একটা যৌবনের লাবণ্য আছে। পরনে পায়জামা ও সালোয়ার। মাথায় প্রচুর চুল—পৃষ্ঠে বেণীর আকারে দোদুল্যমান।

নুরুন্নেসা মরিয়মের হাত থেকে ব্যাগটা নেবার জন্য হাত বাড়াচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই কিরীটী মরিয়মের হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে নিল।

ব্যাগটা খুলে একটু খুঁজতেই টিকিটের কাউণ্টার পার্ট পাওয়া গেল। কিন্তু একটা নয়, দুটো কাউণ্টার পার্ট। পরীক্ষা করে বললে, দুটো টিকিট দেখছি কাল রাত্রের শো'র, সঙ্গে বুঝি আর কেউ গিয়েছিল?

হ্যাঁ।

আপনার কোন বান্ধবী?

আপনার ঐ প্রশ্নের জবাব দিতে নিশ্চয়ই আমি বাধ্য নই মিঃ পুলিস অফিসার! কণ্ঠে নুরুন্নেসা বেগমের স্পষ্ট একটা বিরক্তি ও রোষ যেন।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, ঠিক আছে। এই নিন আপনার ব্যাগ।

ব্যাগটা পরীক্ষা করবেন না? কণ্ঠে নুরুন্নেসার বিদ্রূপের সুর।

দরকার নেই, নিন। থ্যাংক ইউ। চলুন মিঃ ব্যানার্জী।

রাধেশের দিকে চেয়ে কথাটা বলে কিরীটীই দরজার দিকে এগিয়ে যায়, রাধেশ তাকে অনুসরণ করে।

আর ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে নুরুন্নেসা বেগম—তার চোখের মনিদুটো যেন জ্বলছিল।

॥ সাত ॥

নিজের ঘরের মধ্যে বসেছিল শত্রুঘ্ন।

উপর থেকে নেমে এসে সোজা নিজের ঘরে ঢুকে বসেছিল শত্রুঘ্ন। শত্রুঘ্নর মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় সে যেন বিশেষ চিন্তিত।

শত্রুঘ্ন কি আশু বিশ্বাসের মৃত্যুর কথাটাই ভাবছিল? নারায়ণী ম্যানসনের সমস্ত ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদেরই পুলিস জিজ্ঞাসাবাদ করবে হয়ত—কাউকে বাদ দেবে না!

হঠাৎ পদশব্দে চোখ তুলে তাকাল!

আরতি!

সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তিতে যেন শত্রুঘ্নর ভ্রূদুটো কুঁচকে যায়।

কি জন্য এখানে এসেছো আবার?

দাদা!

বলে দিইনি তোমাকে যে কখনো দাদা বলে আমাকে ডাকবে না? যাও—চলে যাও!

হঠাৎ শেষরাত থেকে মায়ের শরীরটা খুব খারাপ হয়েছে—

তার আমি কি করবো ? আমি কি ডাক্তার ? ডাক্তার ডেকে দেখাওগে !

ডাক্তার ডেকেছিলাম, মা একবার তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছে, তাই—

কেন, আমার সঙ্গে দেখা করে হবেটা কি ?

মা হয়ত আর বাঁচবে না—একবার যদি তুমি যেতে—

কেউই চিরদিন বাঁচে না—একদিন না একদিন সকলকেই যেতে হয় ! রীতিমত রুক্ষ গলাতেই কথাগুলো বললে শত্রুঘ্ন।

আরতি কোন জবাব দিল না সঙ্গে সঙ্গে—চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

শত্রুঘ্ন যেন কি ভাবল। চোখ-মুখের বিরক্তিটা তার যায় না, ভ্রূদুটো কুঁচকেই থাকে, বলে, বাঁচবে না বুঝলে কি করে ? ডাক্তার বলেছেন ?

আমি বুঝতে পারছি—

বুঝতে পারছ !

হ্যাঁ। তাই তার এই শেষ সময়—একটিবার যদি যেতে—

না, আমি যেতে পারব না।

জানি না তুমি কি কারণে মার উপরে এত বিরক্ত—জানতেও চাই না—তবে এই শেষ সময়ে তার—

ঠিক আছে। শত্রুঘ্ন উঠে দাঁড়াল, চল যাচ্ছি।

একটা অবিমিশ্র ঘৃণা আর বিরক্তি যেন শত্রুঘ্নর কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গায়ে জামা চড়ানোই ছিল, দরজার দিকে এগিয়ে গেল, চল !

আরতিও শত্রুঘ্নকে অনুসরণ করে ঘর থেকে বের হয়ে এল।

শত্রুঘ্ন দরজায় লক করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

অত বড় ফ্ল্যাট-বাড়িটার ভাড়াটেরা কেউ বোধ হয় তখনো জানতে পারেনি, গতরাত্রে তিনতলায় কি দুর্ঘটনাটা ঘটে গিয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কয়েকজনের সঙ্গে চোখাচোখি হল শত্রুঘ্নর, কারো মুখেই কোন জিজ্ঞাসা বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্রও নেই।

রাস্তায় নেমে শত্রুঘ্ন একটা চলন্ত খালি ট্যাক্সি হাত-ইশারায় থামিয়ে আরতিকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসল।

পাশাপাশি দুজনে নিঃশব্দে বসে থাকে। কারো মুখেই কোন কথা নেই। দু'জনের মনের তখন দুটো বিভিন্নমুখী চিন্তাধারা যেন নিঃশব্দে বয়ে চলেছিল।

আরতি আজ পর্যন্ত জানে না, বুঝতেও পারেনি কেন তাদের দাদা হঠাৎ একদিন তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে অজ্ঞাতবাসে চলে গিয়েছিল। মাকেও কথাটা জিজ্ঞাসা করেছে কতবার, কিন্তু মা কিছুই বলেনি।

আরতির মনে হয়েছে একবার, মা বলতে চায় না। কিন্তু কেন ? মা কি তার কারণটা জানে এবং ইচ্ছা করেই মুখ বন্ধ করে আছে ?

দাদা তো তাদের জীবন থেকে হারিয়েই গিয়েছিল—দীর্ঘদিন পরে আবার তার

সন্ধান মিলল কিন্তু তখন সে অন্য মানুষ—এমন কি পৈতৃক পদবীটা পর্যন্ত সে তার নামের পিছন থেকে মুছে দিয়েছে তখন।

কোন সম্পর্কই তাদের সঙ্গে আর রাখতে চায় না দাদা, কিন্তু অর্থসাহায্য করছে এবং করবেও।

আরতি বুদ্ধিমতী, তার আবার এ সন্দেহও হয়েছে মনে, দাদার তাদের সঙ্গে সম্পর্ক-ছেদ করার মূলে রয়েছে হয়ত তাদের মা-ই। অথচ স্পষ্টাস্পষ্টি মাকে আজ পর্যন্ত সেকথা জিজ্ঞাসাও করতে পারেনি। সেই কথাই ভাবছিল আরতি।

শত্রুঘ্ন ভাবছিল, যে নারী তার জীবনের সবচাইতে বড় দুঃস্বপ্ন—যার প্রতি তার বুকের মধ্যে দীর্ঘদিনের সঞ্চিত একটা ঘৃণা ছাড়া কিছুই নেই—যাকে সে জীবনে কোনদিনই ক্ষমা করতে পারবে না, তার কাছেই আজ এত বছর পরে তাকে আবার গিয়ে দাঁড়াতে হবে!

কিন্তু কেন—কেন সে ডাকছে? কি বলতে চায় তাকে সেই নারী?

সে তো কিছুই আর শুনতে চায় না!

শোনার কিছুই আর তার নতুন করে প্রয়োজনও নেই।

এ কি বিড়ম্বনা! কারণ তাকে যেতেই হচ্ছে। সামনাসামনি মুখোমুখি আবার হতেও হবে।

একটা ছিন্ন মলিন শয্যায় পালঙ্কের উপর শুয়েছিল বাসন্তী।

মুখটা ভেঙে গিয়েছে। কোটরগত দুটি চক্ষু, শীর্ণ কপাল, রগের দু'পাশের চুলে পাক ধরেছে। চোখ বুজে শয্যায় পড়েছিল বাসন্তী। শত্রুঘ্নর পদশব্দ পেয়ে চোখ মেলে তাকাল। ক্লান্ত অবসন্ন দৃষ্টি। দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে আবার মা ও ছেলে আজ মুখোমুখি হয়েছে। ক্ষণকাল ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইল বাসন্তী। তার দু'চোখে জল।

খোকা! ক্ষীণকণ্ঠে ডাকল বাসন্তী।

কেন ডেকেছ আমাকে? শত্রুঘ্নর কণ্ঠস্বরে চাপা বিরক্তিটা বেশ স্পষ্টই ফুটে ওঠে যেন।

একটা কথা বলবো বলে।—আরতি!

কি মা?

তুই ঘর থেকে যা—দরজাটা টেনে দিয়ে যা।

আরতি কোন বাক্যব্যয় না করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। যাবার সময় নিঃশব্দে দরজার কপাট দুটো টেনে ভেজিয়ে দিয়ে গেল।

খোকা! ক্লান্ত কণ্ঠে আবার ডাকল বাসন্তী।

শত্রুঘ্ন মার মুখের দিকে তাকাল। মুখটা কঠিন।

আট মাস হল একেবারে বিছানা থেকে উঠতে পারি না। নচেৎ আমিই হয়ত তোর কাছে যেতাম।

কি বলার জন্য ডেকেছ বল—আমার সময় নেই!

বুঝতে পারছি, আমার সময়ও হয়ে এসেছে, কিন্তু যে কথাটা তোর জানা

দরকার, কতবার ভেবেছি বলব কিন্তু বলতে পারিনি, সে কথাটা যদি আজ যাবার সময়ও না বলে যাই—

তোমার কোন কথাই শোনবার আমার প্রবৃত্তি নেই! কঠিন গলায় ধীরে ধীরে বাসন্তীকে থামিয়ে দিয়েই কথাগুলো বললে শত্রুঘ্ন।

কিন্তু না বললে—

বললাম, তো শুনতে চাই না আমি!

শুনবি না?

না। তারপরেই একটু থেমে বললে, তোমার লজ্জা-ঘৃণা কোনটাই না থাকতে পারে, কিন্তু ও দুটোর একটাও আমি এখনো বিসর্জন দিতে পারিনি!

খোকা!

আর কিছু যদি তোমার বলবার থাকে তো বলতে পার—ওসব কথা থাক।

আমার সন্দেহ হয়েছিল তুই সব জেনেছিস, এখন বুঝতে পারছি সন্দেহটা আমার মিথ্যা নয়। যাক, তুই যখন সব জানিস, জানতে পেরেছিস—

আমি কি এখন যেতে পারি? বাসন্তীকে থামিয়ে দিয়ে বললে শত্রুঘ্ন।

বাসন্তী দু'চোখের পাতা বুজিয়ে নেয়।

আরতি দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে কান পেতে ছিল তার মা ও দাদার মধ্যে কি কথাবার্তা হয় শোনবার জন্য।

কেন যেন আরতির মনে হয়েছিল, তার মা ও দাদার মধ্যে কোথায় একটা গোপন কারণ আছে, যে কারণে তার দাদা মায়ের উপর এত বিরূপ। কিন্তু আন্দাজ করতে পারত না সেটা কি হতে পারে, কি এমন কারণ থাকতে পারে!

ব্যাপারটা যেন আরতি কল্পনাও করতে পারত না, দাদার মায়ের উপরে এত বিতৃষ্ণা কেন? অবিশ্যি শেষের দিকে এটা অন্ততঃ বুঝতে কষ্ট হয়নি আরতির, তাদের মাকে নিয়েই এমন কোন একটা ব্যাপার আছে যেজন্য তাদের দাদা তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে, এমন কি নাম ও পদবীটাও নিজের বদলে ফেলে অজ্ঞাতবাসে দিন কাটাচ্ছে।

কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল আরতি, হঠাৎ শত্রুঘ্নর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল।

আরতি!

আরতি নিঃশব্দে তার দাদার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

পকেট থেকে একশ টাকার দুটো নোট বের করে আরতির দিকে এগিয়ে দিতে দিতে শত্রুঘ্ন বললে, এই টাকাটা রাখ, চিকিৎসার যেন কোন ত্রুটি না হয়—আরো যদি টাকার দরকার হয় তো পাবে। তারপরই একটু থেমে বললে, কে দেখছে?

ডাঃ চৌধুরী।

তাঁকে বলো, আর কাউকে যদি ডাকতে তিনি চান পরামর্শের জন্য ডাকতে পারেন।

কথাগুলো বলে শত্রুঘ্ন আর দাঁড়াল না।

নারায়ণী ম্যানসনে ফিরে এল শত্রুঘ্ন।

ইতিমধ্যে আশু বিশ্বাসের মৃত্যুর ব্যাপারটা ম্যানসনের ভাড়াটেদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল কেমন করে না-জানি। চারিদিকে একটা চাপা উত্তেজনা —ফিসফিস কানাকানি। আরো একটা ব্যাপার জানতে পারল শত্রুঘ্ন—পুলিস সব ভাড়াটেদেরই গতরাত্রে গতিবিধি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

তিনতলায় কোলাপসিব্‌ল্ গেটের সামনে পুলিস-প্রহরা বসেছে।

রাত্রের দিকে নটা নাগাদ রাধেশ এসে হাজির হল কিরীটীর গৃহে।

কিরীটী একটি বিলাতী ক্রাইম ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল বসে বসে আর তার মুখোমুখি বসে কৃষ্ণা ক্রুশ দিয়ে লেস বুনছিল।

কিরীটীবাবু!

আসুন মিঃ ব্যানার্জী, ময়না তদন্তের রিপোর্ট পেলেন?

হ্যাঁ, রাদার কুইয়ার! বসতে বসতে বললে ব্যানার্জী, জানেন মিঃ রায়, ময়না-তদন্ত করতে গিয়ে একটা বিচিত্র বস্তু পাওয়া গিয়েছে মৃতের দেহে!

তাই নাকি!

হ্যাঁ।

কি পাওয়া গিয়েছে?

মৃতের হার্টের ventricular চেম্বারের মধ্যে একটা অদ্ভুত জিনিস বিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।

এনেছেন সেটা?

হ্যাঁ, এই দেখুন।

রাধেশ ব্যানার্জী কাগজে মোড়া একটা ছোট্ট ভাঙা ষঁড়শির মাথার মত বস্তু পকেট থেকে বের করে কিরীটীর হাতে দিল, ডাক্তারের মতে এটাই মৃত্যুর কারণ এবং মৃতের বাঁদিকের বুকে যে রক্তবিন্দু ও মাইনিউট ইনজুরিটা দেখতে পাওয়া গিয়েছে সেটা এ বস্তুটি মৃতের হার্টের চেম্বারে প্রবেশ করাবার জন্যই—

কিরীটী সাগ্রহে বস্তুটা দেখতে দেখতে কি যেন ভাবল, তারপরই কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে বললে, কৃষ্ণা, দেখি তোমার ক্রুশ কাঁটাটা!

কি হবে? কৃষ্ণা শুধায়।

দাও না!

কৃষ্ণা ক্রুশ কাঁটাটা স্বামীর হাতে তুলে দিল।

কিরীটী অতঃপর ক্রুশ কাঁটার মাথা ও মৃতের হার্টের মধ্যে যে বস্তুটি বিদ্ধ হয়েছিল—দুটো বেশ কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে বললে, অদ্ভুত ব্যাপার!

কি হল গো? কৃষ্ণা শুধায়।

কিরীটী বললে, অনেক প্রকার অস্ত্রের সাহায্যে মানুষের মৃত্যু হতে দেখেছি ইতিপূর্বে, কিন্তু এমনটি চোখে পড়েনি!

কি ব্যাপার কিরীটীবাবু? রাধেশ শুধায়।

কিরীটী রাধেশ ব্যানার্জীর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললে, মৃত্যুর কারণটা বোঝা গেল এবং এও বোঝা গেল আশু বিশ্বাসকে হত্যাই করা হয়েছে। কিন্তু এ সন্দেহটা হয়েছিল কেন তাঁর ?

কার কথা বলছেন কিরীটীবাবু ? রাধেশ ব্যানার্জী প্রশ্ন করে।

হার্টফেল নয়, অস্বাভাবিক মৃত্যু ! মিঃ ব্যানার্জী ?

কিছু বলছিলেন ? রাধেশ ব্যানার্জী তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

কিরীটী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, হ্যাঁ চলুন, একবার ঘুরে আসা যাক।

কোথায় ? রাধেশ ব্যানার্জী প্রশ্ন করল।

নারায়ণী ম্যানসনে।

কিন্তু আমার যে এখুনি বড়কর্তার ওখানে একবার যেতে হবে !

বেশ, আপনি যান—আমি একাই তাহলে একবার ঘুরে আসি !

রাধেশ ব্যানার্জী না বুঝতে পারলেও কৃষ্ণা বুঝতে পেরেছিল, কোন একটা সমাধানে অথবা সমাধানের একেবারে কাছাকাছি পৌঁচেছে তার স্বামী, নচেৎ এখুনি নারায়ণী ম্যানসনে যাবার জন্য অস্থির হত না।

কৃষ্ণা শুধাল, ফিরতে দেরি হবে ?

দেখি, বিশেষ দেরি হবে না—

ঐ সময় রাধেশ ব্যানার্জী আবার বললে, কাল গেলে হত না ?

না।

।। আট ।।

শত্রুঘ্ন পরের দিনও সারাটা দিন তার ঘরের মধ্যেই কাটিয়ে দিল। কোথাও বের হল না। নারায়ণী ম্যানসন যেন একেবারে অদ্ভুত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

একটু আগে শীতের ধোঁয়াটে সন্ধ্যার আবছায়া নেমে এসেছে। রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। আলো জ্বালায়নি শত্রুঘ্ন তার নিজের ঘরের। আবছা অন্ধকারে একটা চেয়ারের ওপর গা-টা এলিয়ে দিয়ে পড়েছিল শত্রুঘ্ন।

দরজা ঘরের ভেজানোই ছিল। ভেজানো দরজার গায়ে পর পর দুটো মৃদু টোকা পড়ল।

কে ?

ভিতরে আসতে পারি ?

আসুন। দরজা খোলাই আছে।

কিরীটী এসে ঘরে ঢুকল।

শত্রুঘ্ন উঠে তাড়াতাড়ি সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জেবলে দিল।

কিরীটীবাবু !

বসুন শত্রুঘ্নবাবু। আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

শত্রুঘ্ন কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

আপনি সেদিন আপনার জবানবন্দিতে বলেছিলেন, রাত পৌনে এগারটায় বের হয়ে আবার রাত পৌনে বারোটা নাগাদ ফিরে আসেন!

হ্যাঁ।

কিন্তু নীচের নেপালী দরোয়ান বাহাদুর বলছিল—

কি বলছিল?

আপনি পৌনে এগারটায় বের হননি, বের হয়েছিলেন রাত এগারটায়।

রাত এগারটায়!

হ্যাঁ, রাত এগারটার সময়ই আপনি বের হয়েছিলেন, কারণ বাহাদুর বলছিল সেই সময় সিঁড়ির ঘড়িতে এগারটা বাজছিল।

তা হবে। হয়ত সময়টা আমার ভুলই হয়েছে।

আচ্ছা প্রেসে কিসে গিয়েছিলেন—ট্যাক্সিতে

না।

তবে?

হেঁটে।

আর ফেরার সময়?

হেঁটেই ফিরেছি।

এখান থেকে রাত এগারটায় বের হয়ে বজ্রধ্বনি অফিসে হেঁটে গিয়ে রাত পৌনে বারোটায় ফিরে আসা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়—মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটে—বৈঠকখানা থেকে!

শত্রুঘ্ন চুপ করে থাকে।

তাছাড়া রাত পৌনে বারোটায়ও আপনি আসেননি ফিরে!

কে বললে?

আমি জানি।

তাহলে তো নিশ্চয়ই আপনি এও জানেন, কখন আমি ফিরেছি সেরাত্রে?

মনে হয় বারোটার পর কোন এক সময় ফিরেছেন। আর আপনি একা নন—আপনার সঙ্গে আরো একজন ছিল। কে সে? কে আপনার সঙ্গে এসেছিল?

কেউ আমার সঙ্গে আসেনি—আমি একাই এসেছিলাম।

শত্রুঘ্নবাবু, আমি জানি আপনার সঙ্গে আর একজন ছিল—কে সে বলুন?

বললাম তো কেউ আমার সঙ্গে ছিল না!

ছিল। তার গায়ে একটা কালো ওভারকোট ছিল।

আমি বলছি আমার সঙ্গে কেউ ছিল না, অথচ আপনি বারবারই বলছেন, কেউ ছিল—তার গায়ে কালো ওভারকোট ছিল—এ অবস্থায় আমার আর কি বলার থাকতে পারে, বলুন?

শত্রুঘ্নবাবু! পরক্ষণেই কিরীটী প্রশ্ন করল, বাসন্তী কে?

হঠাৎ যেন ভূত দেখার মতই চমকে ওঠে শত্রুঘ্ন কিরীটীর কথায়।

বলবেন কি, বাসন্তী কে? নামে মনে হচ্ছে একটি স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটি কে জানতে পারি কি?

শত্রুঘ্ন চুপ করে থাকে। কিরীটী তাকিয়ে থাকে শত্রুঘ্নর মুখের দিকে।

শত্রুঘ্নবাবু? কিরীটী আবার ডাকল।

বলুন!

কই আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না তো! কে বাসন্তী? আপনি তাকে চেনেন মনে হয়!

শত্রুঘ্ন চুপ।

চেনেন না?

না।

ও নামটা কি কখনও শোনেন নি?

না।

আশু বিশ্বাসের মুখেও শোনেননি?

না।

হুঁ। আচ্ছা অবিনাশ চক্রবর্তী বলে কাউকে চেনেন?

না।

ঐ নামটাও কখনও শোনেন নি?

না।

যাক, চেনেন না যখন ওদের দুজনের কাউকেই তখন কি আর বলার থাকতে পারে! কিরীটী শান্ত গলায় বললে।

শত্রুঘ্ন যেন প্রস্তরমূর্তির মত বসে থাকে।

শত্রুঘ্নবাবু! কিরীটী বললে, আপনিই আমাদের সর্বপ্রথম ফোনে খবর দিয়েছিলেন আশুবাবু মৃত এবং আপনার প্রথম থেকেই ধারণা হয়েছিল তাঁর মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়—কেন ঐ রকম ধারণা হল আপনার?

মনে হয়েছিল।

মনে হবার একটা কারণ নিশ্চয়ই ছিল!

না, এমনিই আমার মনে হয়েছিল।

হুঁ,। আপনি বোধ হয় এখনও জানেন না আপনার ধারণাটা ঠিকই!

ঠিক?

হ্যাঁ, এবং ঐ সঙ্গে আরও একটা কথা বোধ হয় আপনার জানা দরকার শত্রুঘ্নবাবু!

শত্রুঘ্ন কিরীটীর কথার কোন জবাব দেয় না। নিঃশব্দে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আশু বিশ্বাসের মৃত্যু হয়েছে রাত সাড়ে বারোটা থেকে একটার মধ্যে কোন এক সময়। পোস্ট মর্টেমের রিপোর্ট তাই বলছে এবং মৃত্যু হয়েছে তীক্ষ্ন ধারালো সূচের মত—যার মাথাটা বঁড়শির মত—সেই রকম কিছু দিয়ে—হার্টের মাসলের

মধ্যে সেই জিনিসটার অগ্রভাগ পাওয়া গিয়েছে পোস্ট মর্টেমে এবং—

আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না কিরীটীবাবু! কি বলতে চাইছেন আপনি?

বুঝতে পারছেন না?

না। কারণ আপনাদের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট যদি তাই বলে—বারোটা থেকে একটার মধ্যেই কোন এক সময় আশু বিশ্বাসকে হত্যা করা হয়ে থাকে, তাহলে—

রাত তিনটে নাগাদ তিনি তাঁর ঘরে ফিরে এলেন কি করে, তাই না শত্রুঘ্নবাবু? কিরীটী প্রশ্নটা করে তাকাল শত্রুঘ্নর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, মৃত অবস্থায় নিশ্চয়ই তিনি হেঁটে তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকে চেয়ারে বসেননি!

তিনি যে হেঁটে গিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁর চেয়ারে বসেছিলেন তার কোন সঠিক প্রমাণ তো এখনও কেউ পায়নি—অর্থাৎ সেটা প্রমাণিত হয়নি। কিরীটী আবার বললে।

শত্রুঘ্ন চুপ করে থাকে।

আচ্ছা শত্রুঘ্নবাবু, এমনও তো হতে পারে, কিরীটী বললে, সকলের চোখে একটা ধোঁকা দেবার জন্যই—

ধোঁকা দেবার জন্য—কি? শত্রুঘ্ন প্রশ্নটা করে কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

কিরীটী আবার বললে, হত্যাকারী সমস্ত ব্যাপারটা ঐভাবে সাজিয়েছিল, অর্থাৎ সব ব্যাপারটাই হয়তো হত্যাকারীর একটা সাজানো ব্যাপার!

সাজানো ব্যাপার বলছেন? শত্রুঘ্ন শুধাল।

আমাদের তো তাই মনে হচ্ছে।

তাহলে—

কি তাহলে? সনাতন তার মনিবের পায়ের শব্দ শুনেছিল ঘরে যেতে, তাই বোধ হয় বলতে চান?

শত্রুঘ্ন কোন জবাব দেয় না।

কিরীটী বললে, ভুলে যাবেন না সনাতন দেখেনি কাউকে—কেবল পায়ের শব্দই শুনেছিল আর তাতেই সে অনুমান করেছিল মাত্র যে সে আর কেউ নয় তার মনিবই।

কিন্তু গেটের তালার চাবি তো সনাতন আর আশুবাবুর কাছে ছাড়া আর কারো কাছে থাকত না।

হত্যাকারী কোন কিছুর সাহায্যে তালাটা খুলে ফেলেছিল, তারপর—

তারপর?

অবিশ্যি সবটাই আমার অনুমান। হত্যাকারী আগেই কোন এক সময় তালাটা নষ্ট করে পরে মৃতদেহ বহন করে নিয়ে গিয়ে গিয়ে আশুবাবুর ঘরে ঢুকে চেয়ারের উপরে তাঁর মৃতদেহটা বসিয়ে রেখে চলে আসে। আচ্ছা সেই রকমই যদি কিছু ঘটে থাকে, তাহলে কে এ কাজ করতে পারে বলে আপনার মনে হয় শত্রুঘ্নবাবু?

আপনি এমন absurd কথা বলেছেন যে আমি কিছু অনুমানই করতে

পারছি না !

আচ্ছা সন্তোষ সিংহকে আপনার সন্দেহ হয় ?

সন্তোষ সিংহ !

হ্যাঁ, যার সঙ্গে দু'দিন আগে আশুবাবুর তর্কাতর্কি হয়েছিল এবং সন্তোষ সিংহ আশুবাবুকে থ্রেটেন করে গিয়েছিল ? আপনি তো সেদিন ঘরে উপস্থিত ছিলেন ?

থ্রেটেন করেছিল সে, কার কাছে শুনলেন ও-কথা ?

যার কাছেই শুনে থাকি—আমি শুনেছি। কি হয়েছিল ব্যাপারটা আপনি বলতে পারেন ?

পার্টির ব্যাপারে মতান্তর হয়েছিল।

সন্তোষ সিংহ আশুবাবুর পার্টির লোক ?

একসময় ছিল—আপনাকে তো সেদিনই বলেছিলাম।

হুঁ। আচ্ছা নুরুন্নেসা বেগমের স্বামীকে আপনার সন্দেহ হয় ?

আমি তাকে চিনি না, জানিও না। আর কিছু আপনার জিজ্ঞাস্য আছে, কিরীটীবাবু ?

না। আপাততঃ আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার নেই। আচ্ছা নমস্কার।

কিরীটী শত্রুঘ্নর ঘর থেকে বের হয়ে এল।

॥ নয় ॥

পরের দিন—সকালে।

গড়িয়াহাটায় কিরীটীর বসবার ঘরে বসে রাধেশ ও কিরীটী আশু বিশ্বাসের হত্যার ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করছিল।

রাধেশ বলছিল, ব্যাপারটা আগাগোড়াই যেন কেমন ঝাপসা ধোঁয়াটে বলে মনে হচ্ছে কিরীটীবাবু।

হত্যা যেখানে Pre-meditated—পূর্ব পরিকল্পিত, সেখানে হত্যার ব্যাপারটা প্রথমে অমন ঝাপসা আর ধোঁয়াটেই মনে হয় রাধেশবাবু।

কোন সূত্রই যেন খুঁজে পাচ্ছি না এখনও—

কেন ? কিছু সূত্র আপনার হাতে এসেছে বইকি !

সূত্র হাতে এসেছে ?

আসেনি ? প্রথমতঃ ধরুন, আশু বিশ্বাসের মৃত্যু হয়েছে রাত বারোটা থেকে একটার মধ্যে কোন এক সময়—রাত তিনটের পর নয়। দ্বিতীয়তঃ, গেটের তালাটা ভাঙা পাওয়া গিয়েছে। তৃতীয়তঃ, সনাতন তার মনিবকে ফিরতে দেখেনি স্বচক্ষে, কেবল পায়ের শব্দে অনুমান করেছিল তার মনিবই ফিরে এসেছে। চতুর্থতঃ, তাঁর ডাইরীর মধ্যে বাসন্তী এবং অবিনাশ চক্রবর্তী দুটি নাম—যে দুজন হয়তো

তাঁর অতীত জীবনের একটা বিশেষ অধ্যায় জুড়ে ছিল। পঞ্চমতঃ, নানা ধরনের স্বনামে ও বেনামীতে কারবার ছিল লোকটার। ষষ্ঠতঃ, একটা রাজনৈতিক পার্টির সর্বেসর্বা ছিলেন—সামনে না থাকলেও পিছন থেকে কলকাঠি নাড়তেন। সপ্তমতঃ, ঐ নুরুন্নেসা বেগম। অষ্টম, আশু বিশ্বাসের একান্তসচিব শত্রুঘ্নবাবু—আর নবম সূত্র হচ্ছে—

কি?

সমস্ত ব্যাপারটা পর্যালোচনা করলে বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় যে, আশু বিশ্বাসকে আদৌ তাঁর ঘরে হত্যা করা হয়নি।

সে কি!

হ্যাঁ, তাঁকে হত্যা করার পরে মৃতদেহ হত্যাকারী বয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসিয়ে রেখে এসেছিল।

কিন্তু মৃতদেহটা যদি বাইরে থেকেই নিয়ে আসা হয়ে থাকে—

এমনও তো হতে পারে, নারায়ণী ম্যানসনেরই কোন এক কক্ষে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল!

কিন্তু তিনি তো রাত এগারটার কিছু পরে ফোন পেয়ে বের হয়ে গিয়েছিলেন!

বের হয়ে গিয়েছিলেন ঠিকই—

তবে?

এমনও তো হতে পারে, আবার আধঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে এসেছিলেন, কিংবা আদৌ বের হননি!

তবে যে সনাতন বলছিল—

সনাতনকে হয়তো ব্যাপারটা বলতে চাননি বলেই আশু বিশ্বাস ঐ কথা বলে ঘর থেকে বের হয়েছিলেন!

কিন্তু গাড়ি নিতে এসেছিল তাঁকে—সেই গাড়িতে তাঁকে উঠে যেতে দেখেছিল ড্রাইভার রামকরণ!

রামকরণ মিথ্যেও তো বলতে পারে!

আমার যেন কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে কিরীটীবাবু।

কোন পূর্বপরিকল্পিত ঘটনার মধ্যে যদি হঠাৎ হত্যা এসে পড়ে, তখন সেই হত্যার ব্যাপারে সব কিছুই ওরকম গোলমেলে মনে হওয়াটা স্বাভাবিক রাধেশ-বাবু।

আপনি তাহলে স্থিরনিশ্চিত যে ঐ হত্যার মধ্যে কোন কিছু—ব্যাপারটা পূর্ব-পরিকল্পিত ছিল? তাই যদি হয় তো, কে হত্যা করতে পারে আশু বিশ্বাসকে?

হত্যার কোন একটা মোটিভ খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত সেটা অনুমান করাও মুশকিল। মোটিভটা যদি খুঁজে বের করতে পারি তখন আবার ভেবে দেখতে হবে—কার পক্ষে সুযোগ ছিল হত্যা করার!

কাউকে নিশ্চয়ই আপনি সন্দেহ করেছেন?

সন্দেহ তো চারজনকেই হয়।

কে কে ?

প্রথমতঃ ধরুন সনাতন—

সনাতন ! অতদিনকার পুরনো চাকর !

ভেবে দেখুন, সামান্য একটা ভৃত্যশ্রেণীর লোক সনাতন—সে জানত আশু বিশ্বাসের সিন্দুকে প্রচুর নগদ কালো টাকা সর্বদা মজুত থাকত। আর পুরাতন চাকরের কথা বলছেন ব্যানার্জী, ষোল-সতের বছরের পুরনো লোকও অর্থের লোভে যোগসাজস করে মনিবকে হত্যা করেছে এমন নজিরেরও তো অভাব নেই !

তা অবিশ্যি নেই—তাহলেও ঐভাবে হত্যা করে অমন করে মৃতদেহটা চেয়ারের উপর বসিয়ে রেখে হত্যার স্থানে থাকার মত নার্ভ সনাতনের মত একটা লোকের পক্ষে থাকা কি সম্ভব ? আর যে অস্ত্রের সাহায্যে আমাদের ধারণা, আশু বিশ্বাসকে হত্যা করা হয়েছে—তা সনাতন পাবে কোথায় ?

তাহলে তার পক্ষে সম্ভব নয় বলছেন ! কিন্তু নার্ভ বস্তুটি এমনই বিচিত্র যে কার কতখানি নার্ভ আছে বাইরে থেকে সেটা অত সহজে বোঝা সম্ভব নয়। আমি একবার এমন একজন ভয়ংকর খুনীকে আবিষ্কার করেছিলাম—লোকটা যেমন ঢ্যাঙা রোগাপটকা তেমনি নির্বোধ গোবেচারার মত চেহারা যে দেখলে আপনার মনে হবে মানুষটা বুঝি একটা পিঁপড়েকেও টিপে মারতে পারে না—মানুষ খুন করা তো দূরের কথা ! অথচ সেই লোকটা খুন করেছিল এবং জানেন কেমন করে সে খুন করেছিল ? একটা ইলেকট্রিকের তার গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে একটু একটু করে হত্যা করেছিল—মনে হয়েছিল বেশ নিশ্চিন্তে নির্বিকার ভাবে আস্তে আস্তে যেন সে লোকটাকে হত্যা করেছে। তাছাড়া সনাতনের ক্ষেত্রে আর একটা কথা ভেবে দেখুন—

কি ?

সনাতনের উপরে যেমন সহসা চট্ করে কারও সন্দেহ পড়বে না, তেমনি তার মত ঐ ফ্ল্যাটে হত্যার সুযোগ আর কারও বেশী ছিল না, তাও নিশ্চয় আপনি বিশ্বাস করবেন !

তা—

তবেই দেখুন, উদ্দেশ্য আর সুযোগ সনাতনের ক্ষেত্রে পুরোমাত্রাতেই ছিল। তারপর ধরুন, আশু বিশ্বাসের একান্তসচিব শত্রুঘ্নবাবু লোকটা সাড়ে দশটা রাত্রে আশু বিশ্বাসের ঘর থেকে বের হয়ে আসে। তারপর সে তার প্রথম জবানবন্দিতে বলেছিল, সে রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বের হয়ে রাত সাড়ে এগারটা নাগাদ ফিরে আসে, যেটা পরে আমরা জেনেছি এবং প্রমাণিতও হয়েছে যে তার জবানবন্দি মিথ্যা। আসলে রাত এগারটায় বের হয়ে ফিরে আসে আবার সে রাত বারোটার পর কোন এক সময়ে। অর্থাৎ সে প্রথমটায় মিথ্যা জবানবন্দি দিয়েছিল এবং মিথ্যা জবানবন্দি কেনই বা প্রথমে দিতে গেল এবং পরেই বা কেন সত্যটা স্বীকার করল ? এই প্রথমে মিথ্যা ও পরে সত্যের মধ্যে কি কারণ থাকতে পারে ?

আপনার কি মনে হয় কেন সে মিথ্যা বলেছিল প্রথমে এবং পরেই বা সত্য

বলল কেন ? রাধেশ প্রশ্ন করল।

খুব সম্ভবত মিথ্যা বলার জন্য কোন কারণ বা উদ্দেশ্য ছিল শত্রুঘ্নর। কিরীটী জবাব দিল।

তারপর আরও একটা কথা, কিরীটী একটু থেমে আবার বলতে লাগল, নারায়ণী ম্যানসনে ফেরা সম্পর্কে যে মিথ্যা বলেছে তাই নয়, সে একা ফেরেনি সেরাত্রে, তার সঙ্গে আরও একজন কালো ওভারকোট গায়ে ছিল—ড্রাইভার রামকরণের জবানবন্দি থেকে জানা গেছে। সেই কালো ওভারকোট গায়ে শত্রুঘ্নর সঙ্গের লোকটি কে সেটাও আমাদের জানা দরকার।

রামকরণ ড্রাইভার বলেছে ? রাধেশ প্রশ্ন করে।

কিরীটী বলে, হ্যাঁ। এবারে আসা যাক, আশু বিশ্বাসকে হত্যা করা হয়েছিল সেরাত্রে কোন্ সময়, সেটাও প্রয়োজনীয় একটা তথ্য—

পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তো বলে—

রাত বারোটা থেকে রাত একটার মধ্যেই সেরাত্রে কোন এক সময় আশু বিশ্বাসকে হত্যা করা হয়েছিল! সেক্ষেত্রে শত্রুঘ্নবাবুর পক্ষেও আশু বিশ্বাসকে হত্যা করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার ছিল না!

কিন্তু মোটিভ কি ? বুঝলাম না হয় সুযোগ তার ছিল—

এই মুহূর্তে ঠিক বলতে পারছি না। কিরীটী বললে।

তবে আমার মনে হয়, রাধেশ ব্যানার্জীর দিকে তাকিয়ে বললে, অবিশ্যি অনুমান সম্পূর্ণ আমার—আশু বিশ্বাস ও শত্রুঘ্নর মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল তাদের জীবনে, হয়তো যে কারণে—

শেষ পর্যন্ত শত্রুঘ্ন আশু বিশ্বাসকে হত্যা করেছে! অর্থাৎ কোন ব্যক্তিগত কারণে—আপনি বলতে চান মিঃ রায় ?

বলতে ঠিক তা চাই না, তবে সে ধরনের কোন কারণ থাকাও হয়তো অসম্ভব নয়।

রাধেশ বললে, আচ্ছা, অর্থের জন্যও তো শত্রুঘ্ন আশু বিশ্বাসকে হত্যা করে থাকতে পারে ?

না, সে যদি হত্যা করে থাকে তো অর্থের জন্য করেনি—তাহলে সিন্দুকে অত টাকা থাকত না। তবে একটা কথা এক্ষেত্রে স্বভাবত মনে হয়—

কি ?

বুদ্ধি খাটিয়ে তার পক্ষে মৃতদেহ বয়ে উপরে নিয়ে আশু বিশ্বাসের নিজের ঘরে রেখে আসাটা শত্রুঘ্নর মত বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব কিছু মনে হয় না। তারপর নুরুন্নেসা বেগম

আচ্ছা মিঃ রায়, আপনি তো বলছিলেন নুরুন্নেসা বেগমকেও সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায় না! রাধেশ ব্যানার্জী বললে।

নিশ্চয়ই না, ইংরাজীতে একটা কথা আছে 'ইট গার্ল' বলে—নুরুন্নেসাও সেই শ্রেণীর মেয়েমানুষ, কাজেই আশু বিশ্বাসের সম্ভাব্য হত্যাকারীর তালিকা থেকে তাকে না চিন্তা করে বাদ দেওয়া বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হবে না।

তাই যদি হয় তো নুরুন্নেসা বেগম অর্থ ছাড়া আর কি কারণে আশু বিশ্বাসকে হত্যা করতে পারে?

কিরীটী মাথা নাড়ল। বললে, না মিঃ ব্যানার্জী, নুরুন্নেসা বেগমই যদি শেষ পর্যন্ত আশু বিশ্বাসকে হত্যা করে থাকে তো নিশ্চয়ই জানবেন অর্থের জন্য নয়!

কেন, ও কথা বলছেন কেন? রাধেশ ব্যানার্জী প্রশ্ন করল।

আমাদের স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি অন্ততঃ তা বলে না। কিরীটী বলল।

আপনি কি বলতে চান, ঐ ধরনের স্ত্রীলোকেরা টাকার জন্য কাউকে হত্যা করতে পারে না?

তা আমি বলছি না—

তবে?

রাধেশবাবু, জগতে কেউ এমন মূর্খ নেই যে স্বর্ণডিম্বপ্রসূ হংসকে হত্যা করবে!

স্বর্ণডিম্বপ্রসূ হংস?

নিশ্চয়ই। নুরুন্নেসার কাছে আশু বিশ্বাস তাই ছিল। যৌন আকর্ষণ দিয়ে প্রৌঢ় আশু বিশ্বাসকে মজিয়ে নুরুন্নেসা সেইভাবেই দোহন করছিল তাঁকে।

তবে?

এক্ষেত্রে হত্যার কারণ কারও জেলাসি, মানে হিংসাও হতে পারে!

জেলাসি?

হ্যাঁ, আশু বিশ্বাস যে নির্মল চরিত্রের লোক ছিলেন না এবং নারীর প্রতি তাঁর একটা বিশেষ দুর্বলতা ছিল, সেটার প্রমাণ আমি পেয়েছি মিসেস বিশ্বাসের সঙ্গে আলোচনা থেকেই।

তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন নাকি?

আগের দিনই কিরীটী টেলিফোন গাইড দেখে আশু বিশ্বাসের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর বালীগঞ্জের বাড়িতে গিয়ে দেখা করেছিল।

হেমাঙ্গিনী বিশ্বাসের বয়স হলেও আজও যেমন তাঁর দেহের বাঁধুনী অটুট আছে তেমনি তাঁকে দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না—বয়েসকালে হেমাঙ্গিনী বিশ্বাস সত্যিই রীতিমত যাকে বলে সুন্দরী ছিলেন। সংযতবাক শান্ত চরিত্রের স্ত্রীলোক হেমাঙ্গিনী বিশ্বাস।

কিরীটীর পরিচয় পেয়ে তাকে সাদরে নিজের বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

কিরীটী বললে, আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন আশুবাবুর মৃত্যুর কথা!

হেমাঙ্গিনী বললেন, শুনেছি আর জানতামও একদিন ঐভাবেই তাকে মরতে হবে চরিত্র না সংশোধন করতে পারলে, অথচ চরিত্র যে সে সংশোধন করতে পারবে না তাও আমি জানতাম। আমার বাবা বেঁচে থাকলে হয়ত মা এত বড় ভুলটা করতেন না। বড়লোকের একমাত্র ছেলে—তিন-চারটে কারবার, মা তাই দেখেই ভুলে গেলেন, ওরা আমাকে পছন্দ করেছিল বলে। বলতে লজ্জাও হয় ঘৃণাও হয় কিরীটীবাবু আমার স্বামীর চরিত্রের কথা!

তারপর হেমাঙ্গিনী দেবী যা বললেন, বিয়ের মাস কয়েকের মধ্যেই স্বামীর চরিত্রের কথা জানতে পেরেছিলেন তিনি, তবু অনেক চেষ্টা করেছেন তাঁকে ফেরাবার। তারপর জয়ন্ত হল—এবং ছেলে যত বড় হতে লাগল আশু বিশ্বাসের উচ্ছৃঙ্খলতাও বাড়তে লাগল। শেষটায় অনন্যোপায় হয়েই স্বামীর সঙ্গে সমস্ত সংস্রব তিনি ত্যাগ করেন।

কলকাতা শহরে ওঁদের একটা বাড়ি ছিল। আশু বিশ্বাস আলাদা ভাবে সেইখানে বসবাস করতে লাগলেন এবং তখন থেকেই স্ত্রীকে মাসে দশ হাজার টাকা করে মাসোহারা দিতেন। যে বাড়িতে আশু বিশ্বাস মারা যান সে বাড়ি অনেক পরে তৈরী হয়েছে। সে বাড়িতে কখনও যাননি হেমাঙ্গিনী।

একটা কথা হেমাঙ্গিনী দেবী! কিরীটী বললে।

বলুন?

নুরুন্নেসা বেগম বলে কাউকে জানেন?

জানি।

তাকে দেখেছেন কখনো?

না। তবে তার সঙ্গে আমার স্বামীর কি সম্পর্ক তা আমি জানি।

বলতে পারেন, কতদিন আপনার স্বামীর সঙ্গে ঐ নুরুন্নেসার পরিচয়?

তা বোধ হয় বছর পনের হবে।

তার আগে কোন নারীর সঙ্গে আশুবাবুর কোন হৃদ্যতা ছিল বলে জানেন?

একজনের সঙ্গে ছিল, তবে তার নামও জানি না, দেখিওনি কখনও তাকে, তবে যতদূর জানি আমার সঙ্গে বিবাহের দু-চার মাস আগে তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

কেন ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় জানেন কিছু?

না।

আপনাকে বিবাহ করবার পরে তাহলে ঐ একমাত্র নুরুন্নেসা বেগমই—

না। আমার সঙ্গে যখন বিয়ে হয় তখন তার এক পার্শী স্ত্রীলোকের ওখানেও যাতায়াত ছিল; আমাদের বিবাহের বৎসর দুই পরে তার মৃত্যু হয়!

আর কোন নারী তাঁর জীবনে এসেছিল?

এসেছিল।

তাদের কারো নাম শোনেননি?

জয়ন্তর তখন জন্ম হয়েছে এবং আমিও ওকে পুরোপুরি চিনেছিলাম বলে ওর সব ব্যাপার থেকেই আমি দূরে থাকতাম!

আপনার ছেলের সঙ্গে তার বাপের সম্পর্ক কেমন ছিল?

বলতে পারেন কেন সম্পর্কই ছিল না।

নুরুন্নেসার সঙ্গে আপনার স্বামীর আলাপ কোথায় হয় জানেন?

বোম্বাই। মেয়েটা শুনেছি সেখানকার কোন হোটেলে ক্যাবারে ড্যান্সার ছিল। আলাপ করার পর ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তখন তাকে ও কলকাতায় নিয়ে আসে।

নুরুন্নেসা ও তার স্বামী হামিদুল সাহেবকে কলকাতায় বাসাভাড়া করেই রাখেনি কেবল, কি সব ব্যাবসাপত্রও করে দিয়েছিল।

কিরীটী বলতে লাগল, যাক যা বলছিলাম—হেমাঙ্গিনী দেবী তাঁর স্বামীর সঙ্গে সেপারেশন চাইলেন আর আশু বিশ্বাসও সানন্দে সেটা মেনে নিলেন।

রাধেশ ব্যানার্জী বললে, তাহলে মিসেস বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর স্বামীর সম্পর্ক-ছেদের কারণ হচ্ছে অন্য এক নারীর প্রতি তাঁর আকর্ষণ?

তাই।

এই পর্যন্ত বলে কিরীটী থামল এবং থেমে একটু পরে বললে, নুরুন্নেসা যে কোন এক সময় নাচত—সেটা অবিশ্যি আমি অনুমান করতে পেরেছিলাম মিঃ ব্যানার্জী!

রাধেশ বললে, কি করে?

আপনি লক্ষ্য করেননি, নুরুন্নেসার ঘরে তার অতীতের একখানা ফটো ছিল ক্যাবারে ডান্সারের বেশে—যদিও অনেক বছর হয়ে গিয়েছে তবু সেই ফটো থেকে নুরুন্নেসা বেগমকে চিনতে আমার কষ্ট হয়নি। তাই আমি হেমাঙ্গিনী বিশ্বাসকে প্রশ্নটা করেছিলাম। যাহোক এতেই বুঝতে পারছেন, আশু বিশ্বাসের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী বিশ্বাসও সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে না!

ও কথা বলছেন কেন মিঃ রায়? রাধেশ শুধাল।

এইজন্য—হেমাঙ্গিনী বিশ্বাসকেও সম্ভাব্য হত্যাকারীদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায় না। তার স্বামীর প্রতি দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ঘৃণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য যদি শেষ পর্যন্ত চরমব্যবস্থাই নিয়ে থাকে, তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কিন্তু হেমাঙ্গিনী যদি নিজেই হত্যা করে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি নারায়ণী ম্যানসনে এসেছিলেন!

আসতেই যে হবে তাকে তার কি মানে আছে, লোক দিয়েও তো সে কাজটা শেষ করতে পারে।

তা অবিশ্যি হতে পারে।

অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রাধেশ ব্যানার্জী বললে, লোকটার চরিত্র তাহলে প্রথম থেকেই ঐ রকম ছিল!

হ্যাঁ। কিরীটী বললে, তাই তো আমার মনে হয়, হয়তো নুরুন্নেসার পরও অন্য কোন নারী তার জীবনে এসেছিল—যার ফলশ্রুতি হচ্ছে ঐ নিষ্ঠুর মৃত্যু!

আর চতুর্থ ব্যক্তি?

নুরুন্নেসা বেগমের স্বামী হামিদুল হক সাহেব! কিরীটী বললে।

কিন্তু ঘটনার তিনদিন আগে থাকতেই তো শুনলাম তিনি কলকাতার বাইরে ছিলেন!

সেটা তার অ্যালিবাইও হতে পারে এ ব্যাপারে একটা!

অ্যালিবাই?

হ্যাঁ।

কিন্তু আশু বিশ্বাসকে হত্যায় হক সাহেবের কি মোটিভ থাকতে পারে ? রাধেশ প্রশ্ন করল।

তা অবিশ্যি ঠিক, কিন্তু ঐ আশু বিশ্বাসের দৌলতেই ভেবে দেখুন হক সাহেব যা কিছু করেছে। সেক্ষেত্রে—

একটা কথা ভুলবেন না মিঃ ব্যানার্জী, আশু বিশ্বাস তাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেছে ঠিকই, কিন্তু ভেবে দেখুন তার মূলে ছিল হক সাহেবের স্ত্রীই। এবং এমনও তো হতে পারে, ইদানীং কোন কারণে ঐ স্বামী-স্ত্রী আশু বিশ্বাসকে আর তেমন করে দোহন করতে পারছিল না ! কিংবা আগের মত নূরুন্নেসার ওপরে আশু বিশ্বাসের আর তেমন মোহ ছিল না ! আর সেটা জানতে পেরেই—

রাধেশ ব্যানার্জী চুপ করে থাকে।

কিরীটী বলতে থাকে, অবিশ্যি হামিদুল সাহেব হত্যার ব্যাপারে সহায়তাও করে থাকতে পারে, সোজাসুজি নিজের হাতে হত্যা না করে এবং সমস্ত ব্যাপারটাই সে জানে বা জানত ঘটনার সময় কলকাতায় না থেকেও।

তাহলে তো দেখছি, রাধেশ ব্যানার্জী বললে, ওদের সকলের প্রতিই নজর রাখতে হয় !

নিঃসন্দেহে। এবং যাদের নাম করলাম তারা ছাড়াও আরো একজন আছে—

কে বলুন তো ?

সন্তোষ সিংহ।

সে আবার কে ?

আশু বিশ্বাসের পার্টিতেই লোকটা এককালে ছিল, কিছুদিন হল কোন কারণে পার্টি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আশু বিশ্বাস নিহত হবার দিনকয়েক আগে লোকটার সঙ্গে আশু বিশ্বাসের বাগবিতণ্ডা হয়ে যায় এবং সে আশু বিশ্বাসকে থ্রেটেনও করে গিয়েছিল।

কে বললে একথা আপনাকে ?

শত্রুঘ্নবাবু।

তাহলে তো তারও উপরে আমাদের নজর রাখা প্রয়োজন !

রাখাই ভাল।

এখন মনে হচ্ছে কিরীটীবাবু, আশু বিশ্বাসের মৃত্যুর ব্যাপারটা রীতিমত জটিল—

কিছুটা সত্যিই জটিল বৈকি।

রাধেশ ব্যানার্জী বললে, আমি শত্রুঘ্নবাবুকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদই দিয়েছিলাম। এখন দেখছি তার উপরে আরো বেশী করে নজর রাখতে হবে, আর ঐ নূরুন্নেসা বেগম,—তাহলে আমি উঠি।

আসুন। ভাল কথা, একটা খবর নিতে পারেন মিঃ ব্যানার্জী ?

কি খবর ?

আশু বিশ্বাসের সম্পত্তির সঠিক পরিমাণ কত ? স্থাবর-অস্থাবর এবং তার

ওয়ারিশ কে ? আর—

আর ?

কোন উইল কিছু আছে কিনা তার !

নিশ্চয়ই খবর নেব।

কাল সন্ধ্যার দিকে একবার আসবেন ?

আসব। কিন্তু কেন ?

নারায়ণী ম্যানসনে একবার যাব।

॥ দশ ॥

রাধেশ ব্যানার্জী চলে যাবার পর কিরীটী শোবার ঘরে গিয়ে ড্রয়ার থেকে আশু বিশ্বাসের বাড়ির শোবার ঘর থেকে যে ডাইরীটা তার নিয়ে এসেছিল এবং যেটা সে সেই রাত্রেই কিছুটা উলটেপালটে দেখেছিল, সেটা নিয়ে এসে চেয়ারের উপরে উপবেশন করল।

ডাইরী ঠিক নয় বা পর পর তারিখ দিয়েও রোজনামচা লেখা নয়।

এলোমেলো অসংবদ্ধভাবে লেখা যেন টুকরো টুকরো সব কথা একটা বাঁধানো খাতার পাতায় পাতায়। সর্বত্র তারিখও নেই।

কখনো পর পর এক মাস বা দু মাস লেখা হয়েছে, কখনো বা ছ মাস এক বছরও বাদ পড়েছে। মনে হয় খেয়ালের বশে এলোমেলো ভাবে যখন যা মনে পড়েছে বা লেখবার ইচ্ছা হয়েছে তাই আশু বিশ্বাস লিখে গিয়েছে।

ডাইরীর পাতাগুলোও লালচে হয়ে এসেছে।

শেষ তারিখটা দেখা যাচ্ছে বছরখানেক আগেকার। তার পরেই অনেকগুলো পাতাই শূন্য। কোন কিছু লেখা নেই।

সেদিন রাত্রে খাতার পাতাগুলো ওলটাতে ওলটাতেই নজরে পড়েছিল দুটো নাম— বাসন্তী ও অবিনাশ চক্রবর্তী।

বাসন্তী সম্পর্কে সেখানে লেখা আছে ঃ বাসন্তী ভেবেছিল সে-ই বুঝি আমার জীবনে প্রথম নারী। মেয়েটা সরল এবং বোকা। তবে ওর যৌবনপুষ্পিত দেহে একটা তীব্র মাদকতা আছে, যে মাদকতা আমাকে আকর্ষণ করেছে।

ওকে আমার প্রয়োজন ছিল পেয়েছিও।

আর এক জায়গায় লেখা ঃ

ও ওর গর্ভের সন্তানকে কিছুতেই নষ্ট করতে রাজী নয়—নির্বোধ !

অনেক করে বোঝালাম কিন্তু শুনল না। বললে, ও করা নাকি পাপ। তবে আর আমার কি দায় ! ঠিক আছে। ওর যা খুশি করুক। আমার আর কোন দায়দায়িত্ব রইল না।

আরো ছ মাস পরের এক তারিখে লেখা ঃ

অবিনাশ বাসন্তীকে বিয়ে করেছে।

ঐ আর এক নির্বোধ—অবিনাশ চক্রবর্তী! অবিনাশ এখনো বোধ হয় মূর্খের স্বর্গেই বাস করছে। কেউ কেউ এমনি নির্বোধ হয়—অথবা যাদের বালকত্ব কোনদিনই ঘোচে না। অথবা আইডিয়ালিজ্‌মের ফানুসে চড়ে উড়ে বেড়ায়। ও জানে না, ঐ ধরনের আইডিয়ালিজ্‌মের কোন মূল্য নেই।

ভাববিলাসীর একটা খোয়াব মাত্র।

আরো বছর চারেক পরের এক তারিখ ঃ

হঠাৎ সেদিন পাটনা যাবার পথে ট্রেনের কামরায় আকস্মিকভাবে বাসন্তীর সঙ্গে দেখা হল।

বাসন্তী আমাকে চিনেও চিনল না, কিংবা চিনেও না চেনবার ভান করল। মেয়েরা বোধ হয় সব পারে। কিন্তু আমি ঠিক ওকে চিনেছি। আমি ভান না করতেই চেয়েছিলাম। ও যেন আরো সুন্দর হয়েছে মনে হল। ওর পাশে একটা রোগা ডিগডিগে ছেলে বসে ছিল।

ছেলেটার নাকটা খাড়া হয়ে সামনের দিকে টিয়াপাখীর ঠোঁটের মত যেন একটু বেঁকে আছে। উপরের ঠোঁটটা মাঝামাঝি কাটা—'হেয়ারলিপ', বাঁ চোখটা সামান্য টেরা। সামনের উপরের পাটির দাঁত স্পষ্ট দেখা যায় কাটা ঠোঁটের ফাঁকে।

ওই কি সেই সন্তান!

হবেও বা।

তারপর দীর্ঘ পাতার পর পাতায় লেখা ডাইরীর মধ্যে বাসন্তী, অবিনাশ চক্রবর্তী বা সেই ট্যারা চোখ কাটা ঠোঁট উঁচু দাঁত ছেলেটির নামগন্ধও নেই।

আছে অন্য কথা ঃ

আজ আমার অনেক টাকা। এত টাকা যে আমি দু'হাতে ছড়াতে পারি। আর টাকা ছিল বলেই না পার্টিটা হাতের মুঠোর মধ্যে এসেছে। ইচ্ছে করলে ঐ টাকায় আমি কি না করতে পারি! আজ বাংলাদেশের গদিতে আসীন কর্তাব্যক্তিরাও জানে, ওদের ইচ্ছা করলে আমি নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারি।

বাবা দুটো-তিনটে ব্যবসা করে কিছু টাকা করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তিনি যদি আজ জানতে পারতেন তাঁর সেই গোটা দুই-তিন ব্যবসাকে মূলধন করেই নিজের বুদ্ধির বলে ও দক্ষতায় আমি আজ দেশের মধ্যে অন্যতম ধনী ব্যক্তি হয়ে উঠেছি—নিশ্চয়ই কি তিনি খুশি হতেন না? হ্যাঁ, অনেক টাকা করেছি ও অনেক নামে-বেনামে ব্যবসা করেছি ঠিকই, কিন্তু কি হল তাতে করে?

জয়ন্ত কোন দিনই হয়ত আমার একটি কপর্দকও স্পর্শ করবে না। তার মা ওর মনে এমন বিষ ঢেলে দিয়েছে যে কোন দিনই হয়ত সেই বিষের ক্রিয়া থেকে সে বের হয়ে আসতে পারবে না।

আবার এক জায়গায় লেখা ঃ

অনেক দিন পরে সেদিন হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে দেখা হল, কিন্তু সে এতটুকুও বদলায়নি, বললে, তোমার মৃত্যুর খবর যেদিন পাব জেনো গঙ্গাস্নান করব!

ও পারলে বোধ হয় আমাকে হত্যাও করতে পারে !

জীবনে আমার শনি আমারই স্ত্রী হেমাঙ্গিনী। কে জানত ও আমার জীবনের শনি হয়ে দাঁড়াবে !

অসহ্য হয়ে উঠেছিল আমাদের উভয়ের সম্পর্ক।

শেষ পর্যন্ত বললাম, ডিভোর্স হোক।

হেমাঙ্গিনী বললে, না।

এভাবে চলছে না আর ! বললাম আমি।

সে আমিও জানি। হেমাঙ্গিনী বললে।

তবে ?

সেপারেশন হোক। হেমাঙ্গিনীই বললে।

I don't mind ! হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ভাবলাম, তবুও তো একটা মুক্তির পথ পাওয়া গেল।

জয়ন্তকে আগেই ঠিক হয়েছিল জার্মানীতে পাঠাব তার এডুকেশনের জন্য—সেই ব্যবস্থাই হল। হেমাঙ্গিনী চলে গেল অন্য বাড়িতে। নারায়ণী ম্যানসন তখনো হয়নি। সত্যিই আমি হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি।

হেমাঙ্গিনীও নির্বোধ—বাসন্তীর মতই।

নচেৎ ওর বোঝা উচিত ছিল নুরুন্নেসার প্রতি আমার যতই আকর্ষণ থাক না কেন, হেমাঙ্গিনী আমার বিবাহিতা স্ত্রী—আমার সন্তানের মা—সেদিক থেকে আমার একটা কর্তব্য আছে, দায়িত্ব আছে। আমি সেটা অস্বীকার করতে চাইও না।

যাক গে মরুক গে।

তার পথে সে যাক, আমার পথে আমি যাব।

আর এক জায়গায় লেখা ঃ

নুরুন্নেসা ছিল এক নাচনেওয়ালী মাত্র আর হামিদুল একটা লোফার ! ওদের টাকা দিয়েছি আশ্রয় দিয়েছি—কি না দিয়েছি ওদের, আর দিয়েছি ঐ মেয়েমানুষটার জন্যই। কিন্তু নুরুন্নেসার ঐ স্বামী হামিদুল হকটা একটা শয়তান ইডিয়েট, বোকা শয়তান যাকে বলে। ঠিক শয়তানও হয়ত নয়—মিটমিটে একটি খচ্চর ! ও জানে নুরুন্নেসার সঙ্গে আমার অতীতের সম্পর্কের কথাটা, আর আজও তারই জের টেনে ঐ গর্দভটা আমাকে শোষণ করতে চায়। রাসকেল !

তারপর অনেকদিন বোধ হয় ডাইরী লেখা হয়নি।

প্রায় দু-তিন বছর।

তারপরই আবার এক জায়গায় ঃ

ও কে ? বজ্রধ্বনি অফিসে ওকে দেখেই কেন যেন আমার এক সুদূর অতীতের কথা মনে পড়ল !

না, না—তাও কি সম্ভব ! ওটা আমার কল্পনা।

আর এক জায়গায় ঃ

দূর থেকে দেখেও সত্যি চমকে উঠেছিলাম—ঠিক যেন সেই কুড়ি-একুশ বছরের বাসন্তী। আশ্চর্য! আশ্চর্য!

আর এক জায়গায় লেখা ঃ

শত্রুঘ্ন একটি ধারালো ছুরি।

ব্যবহার করতে পারলে ঐ ছুরির সাহায্যে অনেক কিছু হাসিল করা যাবে। ওকে আমার কাছে এনে রেখেছি। ভাগ্যে ওকে নিজের কাছে এনে রেখেছিলাম!

সময় ও সুযোগের কেবল অপেক্ষা।

শত্রুঘ্নকে আমি বেশ কিছু দিয়ে যাব আমার উইলে।

He deserves it.

তাছাড়া ওর পাওনাও আছে আমার কাছে।

কিন্তু ও কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারবে!

ডাইরীর পাতায় আর কোন লেখা নেই।

কফি খাবে?

কে? ও কৃষ্ণা? কিরীটী মুখ তুলে তাকাল, দাও!

কৃষ্ণা কফির কাপ এগিয়ে দিল কিরীটীর হাতে।

তুমি খাবে না?

নিয়ে আসছি।

একটু পরে কৃষ্ণা এক কাপ কফি নিয়ে এসে কিরীটীর পাশে বসল।

বাইরে শীতের ঠাণ্ডা রাত কনকনে বাতাস ছড়াচ্ছে।

ওটা কিসের খাতা? কৃষ্ণা শুধায়।

আশু বিশ্বাসের ডাইরী।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

কি লিখেছে ওতে?

লোকটা যে কত বড় শয়তান ছিল তারই পরিচয় বুক ফুলিয়ে জোর গলায় জাহির করে গিয়েছে ওর ডাইরীর পাতায় পাতায়। কিরীটী বললে।

সত্যি?

হ্যাঁ। শুধু শয়তান নয়, রীতিমত পাষণ্ড ছিল লোকটা।

কিছু বুঝতে পারলে?

পারিনি যে একেবারে তাও নয়, তবে—

তবে?

একটি ট্যারা-চোখ, ঠোঁট-কাটা, দাঁত-উঁচু ছেলে এর মধ্যে এসে পড়েছে—হত্যাঘূর্ণির মধ্যে—

সে আবার কি?

ভয় হচ্ছে, হয়তো ছেলেটা ঐ ঘূর্ণির মধ্যে তলিয়ে যাবে! অথচ—

কি গো ?

তাকে বাঁচাবার কোন উপায়ই হয়ত পাব না।

কথাগুলো বলতে বলতে কিরীটী যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

কৃষ্ণা আর কিরীটীকে বিরক্ত করে না। কারণ ও বুঝতে পেরেছিল, কিরীটীর মনের মধ্যে ঐ সময় বিশেষ একটা চিন্তার কুয়াশা ধীরে ধীরে কোন একটা নির্দিষ্ট বস্তুর আকার নিচ্ছে।

কিরীটী ঐ সময়টা নিজের চিন্তার মধ্যেই ডুবে থাকতে চায়!

কৃষ্ণা একসময় নিঃশব্দে উঠে গেল কফির শূন্য পেয়ালা দুটো নিয়ে, কিরীটী তাকালও না।

সিগারে অগ্নিসংযোগ করে সে নিঃশব্দে অন্যমনে ধূমপান করছিল।

।। এগারো ।।

সেই যে দিনচারেক আগে বাসন্তীকে শেষ শয্যায় দেখে এসেছিল, তারপর আর শত্রুঘ্ন আরতিদের কোন সংবাদই রাখেনি। নেবার কোন চেষ্টাও করেনি—আরতিও কোন খবর দেয়নি।

হঠাৎ সেদিন সকালে আশু বিশ্বাসের মৃত্যুর দিনসাতেক পরে শত্রুঘ্নর মনে হল, আরতিদের একটা সংবাদ নেওয়া প্রয়োজন!

গায়ে জামাটা চড়িয়ে পায়ে জুতোজোড়া গলিয়ে শত্রুঘ্ন বের হয়ে পড়ল।

বাড়ির সামনে আসতেই আরতির মুখোমুখি হয়ে গেল সে।

আরতি!

মনে হল আরতি যেন কোথাও বেরুচ্ছিল।

আরতি শত্রুঘ্নর ডাকে ওর মুখের দিকে তাকায়। আরতির মাথার চুল রুক্ষ। চোখেমুখে কেমন যেন একটা ক্লান্তি।

কোথাও বেরুচ্ছিলে নাকি ?

হ্যাঁ।

উনি কেমন আছেন ?

মা তো সেইদিনই দুপুরে মারা গেছেন। শান্ত গলায় আরতি বললে। গলার স্বর একটুও যেন কাঁপল না।

শত্রুঘ্ন যেন চমকে ওঠে, মারা গেছেন ?

হ্যাঁ।

তারপরই কয়েকটা মুহূর্ত স্তব্ধতা। মুখোমুখি দুজনে পরস্পরের দাঁড়িয়ে থাকে।

শত্রুঘ্ন অতঃপর পকেটে হাত চালিয়ে কয়েকটা নোট বের করে বললে, এগুলো রাখ আরতি।

আরতির দিক থেকে কিন্তু কোন সাড়া এল না।

টাকাগুলো ধর!

না। শান্ত গলার স্বর আরতির।

নেবে না?

না।

কেন?

আর তোমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই তাই।

প্রয়োজন নেই?

না।

কিন্তু—

তুমি জান না, দিনকয়েক হল আমার একটা চাকরি হয়েছে!

চাকরি? কোথায়?

নারায়ণী ম্যানসনে যে অয়েল কোম্পানীর অফিস আছে সেই অফিসে।

শত্রুঘ্নর যেন বিস্ময়ের অবধি নেই। বাক্যস্ফূর্তি পর্যন্ত কিছুক্ষণ হয় না।

চাকরির কথা তো তুমি আমাকে কই জানাওনি?

আরতি হাসল।

তারপর শান্ত গলায় বললে, আমাদের সঙ্গে মিথ্যে সম্পর্কের জেরটা টেনে বেড়াতে তোমারও কষ্ট হচ্ছিল!

আরতি!

আর আমাদের তো অনন্যোপায় হয়েই কতকটা তোমার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হচ্ছিল, কিন্তু এখন তো আর তার কোন প্রয়োজন নেই।

বেশ।

আর একটা কথা দাদা—

বল?

শত্রুঘ্ন তাকাল আরতির মুখের দিকে।

এখানে আর তুমি এসো না।

আসব না?

না। সম্পর্ক যখন কাটিয়েছই—আর তাছাড়া সম্পর্ক বলতে এতদিন যেটুকু ছিল, তাও তো আর নেই।

বেশ, তাই হবে।

শত্রুঘ্ন আর দাঁড়াল না। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল।

শত্রুঘ্ন বা আরতি কেউ লক্ষ্য করল না, দূর থেকে একজন মধ্যবয়সী লোক ওদের ওপর আগাগোড়া লক্ষ্য রেখেছিল।

ঐদিনই বিকেলের দিকে।

রাধেশ ব্যানার্জীর সঙ্গে ফোনে কিরীটীর কথা হচ্ছিল।

যে লোকটিকে শত্রুঘ্নর উপর নজর রাখতে বলেছিলাম সে কোন খবর এনেছে মিঃ ব্যানার্জী ? কিরীটী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। ভেবেছিলাম সন্ধ্যায় আপনার ওখানে গিয়ে সব বলব।

কোন বিশেষ খবর এনেছে নাকি ?

বিশেষ কিনা জানি না, তবে গুলু ওস্তাগর লেনের একটা ভাড়াটে বাড়িতে আজ সকালে শত্রুঘ্নবাবু গিয়েছিলেন।

তাই নাকি ? বাড়িটা কার—কে থাকে সেখানে সংবাদ পেয়েছেন ?

পেয়েছি বইকি। অবিনাশ চক্রবর্তী বলে এক ভদ্রলোক—

কে—কি নাম বললেন ? কিরীটী উত্তেজিত হয়ে ওঠে যেন সামান্য, যেটা তার কণ্ঠস্বরের মধ্যেও প্রকাশ পায়।

হ্যাঁ, অবিনাশ চক্রবর্তী বলে এক ভদ্রলোক তাঁর পরিবার নিয়ে থাকতেন। অবিশ্যি অবিনাশ অনেকদিন মারা গিয়েছেন।

ও।

অবিনাশ চক্রবর্তীর মৃত্যুর পরও তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা ওখানে অবিশ্যি থাকত, কিছুদিন হল স্ত্রীও মারা গিয়েছে। বড় মেয়েটার নাম আরতি—তারই সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল শত্রুঘ্ন।

আরতি মেয়েটির নাম ?

হ্যাঁ।

কিরীটী আর কোন কথা বলে না। ফোনটা হঠাৎ নামিয়ে রাখল।

কয়েকটা মুহূর্ত যেন কি ভাবল, তারপরেই গায়ে জামা ও উপরে একটা শাল জড়িয়ে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হল।

কৃষ্ণা এসে ঘরে ঢোকে, বেরুচ্ছ নাকি ?

হ্যাঁ, একটু দরকারে বেরুচ্ছি।

হীরা সিংকে গাড়ি বের করতে বলনি ?

না, ট্যাক্সিতে যাব। আর দেখ রাধেশ ব্যানার্জী হয়ত সন্ধ্যার পরে আসবে, তাকে বসতে বোলো।

কিরীটী আর দাঁড়াল না, বের হয়ে গেল।

আরতি সবে অফিস থেকে ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে এক কাপ চা নিয়ে বসেছে। বাইরে শীতের সন্ধ্যা ধোঁয়ায় কটু হয়ে উঠেছে।

ছোট বোন নতুন ঝিটার অকর্মণ্যতার কথা ব্যাখ্যা করছে, ঐ সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল।

আরতি ছোট বোন বীথির দিকে তাকিয়ে বললে, দেখ্ তো বীথি কে ?

বীথি চলে গেল।

একটু পরে এসে বললে, ধূর্জটিবাবু নামে এক ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান দিদিভাই।

ধূর্জটিবাবু ! কোথা থেকে আসছেন ?

তা তো জানি না।

বসতে দিয়েছিস ?

হ্যাঁ।

আরতি ভেবে পায় না, ধূর্জটিবাবু লোকটি আবার কে ! জীবনে তো কখনো ও নামটাই সে শোনেনি। নিঃশেষিত চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে একটা আলোয়ান জড়িয়ে নিল গায়ে আরতি।

বাইরের ঘরে কিরীটী কিন্তু বসেনি, বীথি একটা চেয়ার দেখিয়ে তাকে বসতে বলে গেলেও সে ঘরের চারিদিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি বুলিয়ে বুলিয়ে দেখছিল।

মাঝারি আকারের ঘরটা। সরু একটা গলির শেষপ্রান্তে শেষ বাড়িটার এক-তলায় একটা আলোবাতাসহীন স্যাঁতসেঁতে ঘর। একধারে একটা তক্তপোশ পাতা, তার উপর বিছানো একটা শতরঞ্জি। কতদিনের পুরাতন ও ময়লা কে জানে। দেওয়ালে গোটা দুই ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। একধারে দুটো হাতলভাঙা চেয়ার—একটা চেয়ার তার মধ্যে উলটে পড়ে আছে। দেওয়ালের মধ্যে মধ্যে ছোপ ছোপ দাগ।

হঠাৎ নজরে পড়ল একটা ব্যাপার কিরীটীর, দেওয়ালের খানিকটা অংশ যেন সদ্য সদ্য চুনকাম করা হয়েছে—তাও এলোমেলো ভাবে যেন চুনের পোঁচড়া টানা হয়েছে।

নমস্কার।

কিরীটী ফিরে তাকাল।

নমস্কার।

কিন্তু আপনাকে তো আমি চিনতে পারছি না ধূর্জটিবাবু।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, না, চিনবেন না। কারণ পরিচয় দূরে থাক, কখনও হয়ত আপনি আমাকে ইতিপূর্বে দেখেনওনি। আরতি দেবী আপনারই নাম বোধ হয় ?

হ্যাঁ, আরতি চক্রবর্তী। বসুন।

কিরীটী বসল।

বসবার আগে নিজেই অন্য চেয়ারটা তুলে ঠিক করে দিয়ে বললে, আপনিও বসুন মিস চক্রবর্তী।

কিরীটী আবার বললে, আপনাকে কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে আগে কোথাও দেখেছি !

আমাকে ?

হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, গত বছর ইণ্টার কলেজিয়েট স্পোর্টসে হার্ডল রেসে ফার্স্ট হয়েছিলেন না ?

লজ্জিতভাবে মাথা নত করে আরতি।

হ্যাঁ।

কি যেন আপনার নামটা ?

আরতি চক্রবর্তী।

হ্যাঁ, আপনি তো একজন নামকরা ক্রীড়াবিদ।

আরতি লজ্জিতভাবে আবার মাথা নীচু করে।

না, না—এতে লজ্জার কি আছে, বরং গৌরবের কথা যে এদেশের মেয়েরা খেলাধুলায় আজ অগ্রণীই হয়নি কেবল জয়মাল্যও নিয়ে আসছে। তা এখনও আপনার ঐ ব্যাপারে অভ্যাস আছে তো?

না, গত বছর থেকেই ছেড়ে দিয়েছি।

কেন?

গৃহস্থের সংসারে, বুঝতেই তো পারছেন—ইচ্ছা থাকলেও—

তা অবিশ্যি ঠিক। আচ্ছা কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি!

কি, বলুন?

আপনার বাবা—

আমার বাবা অনেকদিন হল স্বর্গে গিয়েছেন। মাও কিছুদিন হল মারা গেছেন।

ভাই-বোন?

এক ভাই, দুই বোন আমরা।

ভাই বড়?

না, আমার ছোট। আমিই সবার বড়।

আপনাকেই তাহলে বোধ হয় সংসার চালাতে হয়?

উপায় কি বলুন?

চাকরি করেন?

করি। কিছুদিন হল চাকরি একটা পেয়েছি।

কতদিন হবে?

এই ধরুন দিন কুড়ি-বাইশ হবে।

আরতি দেবী, আর দুটো প্রশ্নের আমি জবাব চাই।

আরতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল, তারপর স্থির শান্ত গলায় বললে, এখনও আপনি আপনার পরিচয় দেননি, আপনি কে জানতে পারি কি? কেনই বা এসেছেন আর কেনই বা এত সব প্রশ্ন করছেন?

সেই কথাতেই আমি এবার আসছিলাম। শত্রুঘ্নবাবুকে আপনি চেনেন, নারায়ণী ম্যানসনে থাকেন—মৃত আশুবাবুর পার্সোনাল সেক্রেটারী? কতদিন তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয়?

হঠাৎ যেন আরতির মুখখানি ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সে সামলে নিয়ে বলে, কে আপনি?

তার আগে আমার প্রশ্নের জবাবটা দিন। কিরীটী শান্ত গলায় বললে।

শত্রুঘ্নবাবুকে আমি চিনি না।

চেনেন না ?

না।

আরতি দেবী, আপনি সত্যের অপলাপ করছেন। শুনুন, আমি জানি তাঁকে কেবল আপনি চেনেনই না, ঘনিষ্ঠতাও আছে তাঁর সঙ্গে আপনার। আপনিও মধ্যে মধ্যে তাঁর কাছে যেতেন এবং তিনিও মধ্যে মধ্যে এখানে যাতায়াত করতেন।

না, আপনি ভুল শুনেছেন। ও নামে কাউকে আমি চিনি না এবং ও নামের কেউ এখানে কখনও আসেনি।

আসেননি—চেনেন না ?

না।

আশু বিশ্বাসকে চিনতেন ?

কে আশু বিশ্বাস ?

যিনি মাত্র কয়েকদিন আগে অদৃশ্য আততায়ীর হাতে তাঁর শয়নকক্ষে নিহত হয়েছেন !

না।

সংবাদপত্রে নিউজটা পড়েনওনি ?

না। খবরের কাগজ আমি পড়ি না।

কিরীটী মৃদু হাসল। তারপর বললে, সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না আরতি দেবী। একদিন না একদিন তা প্রকাশ হয়ে পড়েই।

আমি কোন সত্য গোপন করিনি।

হঠাৎ এবারে কিরীটী প্রশ্ন করল, আরতি দেবী, আপনার লেস বোনার অভ্যাস আছে ?

লেস ! হ্যাঁ, মানে—

আরতি দেবী, আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করছিলেন না একটু আগে—আমার নাম কিরীটী রায়।

রহস্যভেদী কিরীটী রায় !

অর্ধস্ফুট কণ্ঠে কতকটা যেন স্বগতোক্তির মতই কথাটা উচ্চারিত হল।

হ্যাঁ, আমি ভেবেছিলাম—

কি—কি ভেবেছিলেন ?

শত্রুঘ্নবাবুকে বাঁচাবার জন্য হয়ত আপনি চেষ্টা করবেন !

এসব কি আপনি বলছেন ?

ঠিকই বলছি। আশু বিশ্বাসের হত্যার ব্যাপারে পুলিস তাকে সন্দেহ করেছে।

সে কি ! না, না—তিনি সত্যই নির্দোষ। সঙ্গে সঙ্গে ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে বলে ওঠে আরতি।

নির্দোষ ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—বিশ্বাস করুন—

কিন্তু আপনি কি করে তাঁর নির্দোষিতার কথা বলছেন ? তাঁকে তো আপনি

চেনেনও না ? যাঁকে চেনেন না—

তবু—তবু বলছি তিনি নির্দোষ !

কিরীটী হাসল। তারপর শান্ত গলায় বললে, তাহলে বলুন কতদিন তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয়—কি সূত্রে পরিচয় ?

পরিচয় এমন কিছু নেই, মধ্যে মধ্যে কদাচিৎ কখনও আমার মায়ের সঙ্গে তিনি দেখা করতে আসতেন।

তাহলে একটু আগে যা বলছিলেন, মিথ্যা ?

হ্যাঁ।

তা আজ সকালে তিনি এসেছিলেন কেন ?

মা অসুস্থ ছিলেন, তাঁর খবর নিতে।

এসে শুনলেন বোধ হয় মারা গেছেন তিনি ?

হ্যাঁ।

এবারে বলুন তো, অয়েল কোম্পানীতে আপনি কত মাইনে পান ?

তিনশ টাকা।

বেশ ভাল মাইনে পান তাহলে ! তা চাকরিটা কে আপনাকে করে দিল ? নিশ্চয়ই নিজের চেষ্টাতে পাননি ! শত্রুঘ্নবাবুর মনিব আশুবাবুর সুপারিশ কি ?

না।

সত্যি কথা বলুন আরতি দেবী। কারণ জানবেন সত্য যা তা আমার কাছে অবিদিত থাকবে না।

আমি জানি না—কিছু জানি না—, সহসা যেন আরতি একেবারে ভেঙে পড়ল, বললে, কেন—কেন আমাকে বিরক্ত করছেন ? আপনি যান—যান !

আর আপনাকে আমি বিরক্ত করব না আরতি দেবী। আমার যা জানবার জানা হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা চলি।

কিরীটী বের হয়ে গেল ঘর থেকে, আর আরতি ঘরের মধ্যে তক্তপোশটার ওপর ঝুপ করে বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

ঐদিন সন্ধ্যারাত্রি। প্রায় আটটায়।

শত্রুঘ্ন তার ঘরের মধ্যেই ছিল। রাধেশ ব্যানার্জী ও কিরীটী এসে তার ঘরে প্রবেশ করল।

আসুন কিরীটীবাবু ! শত্রুঘ্ন ক্লান্তকণ্ঠে আহ্বান জানাল।

কিরীটী শত্রুঘ্নর মুখের দিকে তাকাল। মুখখানা কেমন যেন শুকনো—দুশ্চিন্তার একটা ছায়া যেন স্পষ্ট সারা মুখে।

মিঃ ব্যানার্জী ফোনে বলছিলেন আপনি আসবেন ! শত্রুঘ্ন বললে।

হ্যাঁ, কতকগুলো কথা আমাদের জানা দরকার। বসতে বসতে কিরীটী বললে, বসুন না শত্রুঘ্নবাবু !

শত্রুঘ্ন বসতে বসতে বললে, কি কথা ?

আপনি সেদিন আমার কাছে সত্য গোপন করেছিলেন, কেন শত্রুঘ্নবাবু ?

সত্য গোপন করেছি ! শত্রুঘ্ন কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ।

কিন্তু আমি তো—

আপনি সেদিন বলেছিলেন, অবিনাশ চক্রবর্তী ও তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে আপনি চেনেন না—তাঁদের নামও কখনো শোনেননি, বলেননি আমাকে ?

বলেছি, কারণ তাদের আমি সত্যিই চিনি না।

কিন্তু আমি যদি বলি, এখনও সত্যকে গোপন করছেন শত্রুঘ্নবাবু—আপনি মিথ্যা বলছেন ?

মিথ্যা !

হ্যাঁ, বাসন্তী দেবী ও অবিনাশ চক্রবর্তীকে শুধু চেনাই নয়, তাঁদের গুলু ওস্তাগর লেনের বাড়িতেও আপনার যাতায়াত ছিল ! তাঁদের মেয়ে আরতি—, কি, এখনও অস্বীকার করবেন ?

শত্রুঘ্ন চুপ করে থাকে।

শত্রুঘ্নবাবু !

শত্রুঘ্ন মুখ তুলল।

এবার বলুন, কিরীটী শান্ত গলায় প্রশ্ন করে, তাঁদের সঙ্গে কি সূত্রে আপনার জানাশোনা ? কতদিনের জানাশোনা আপনাদের ?

হ্যাঁ, আমি মিথ্যাই বলেছি কিরীটীবাবু। অবিনাশ চক্রবর্তীকে আমি শুধু চিনতামই না, তিনি পুত্রাধিক স্নেহে আমায় লালনপালন না করলে হয়ত কোন ডাস্টবিনেই জন্মের পরমুহূর্তেই আমাকে মরতে হত। তাঁরই দয়ায় আমি লেখা-পড়া শিখেছি—বি. এ. পর্যন্ত পড়েছিলাম।

তারপর ?

তারপর একদিন কোন কারণে আমি সেখান থেকে চলে আসি।

অবিনাশ চক্রবর্তী আপনাকে আসতে দিলেন ?

তা দিতেন না হয়ত, কিন্তু আমি চলে এসেছিলাম তাঁর মৃত্যুর পর।

কি এমন হল, যে কারণে যিনি আপনাকে পুত্রের মত একদিন লালনপালন করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অসহায় বিধবা স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের ফেলে আপনাকে চলে আসতে হল ?

সেটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

অর্থাৎ কারণটা বলবেন না ?

যা মনে করেন।

কোন সম্পর্কই কি আর তাঁদের সঙ্গে অতঃপর রাখেননি ?

মধ্যে মধ্যে সামান্য অর্থসাহায্য করেছি।

এখন ?

এখন আর দরকার হবে না।

কেন ? আরতি দেবী চাকরি পেয়েছেন বলে ?

তাই।

আচ্ছা শত্রুঘ্নবাবু, এই নারায়ণী ম্যানসনে যে অয়েল কোম্পানি আছে—সেখানে বেশ মোটা মাইনের আরতি দেবী চাকরি পেয়েছেন কিছুদিন আগে, নিশ্চয়ই জানেন ?

শুনেছি আরতির মুখে।

কি করে চাকরিটা তাঁর হল জানেন কিছু ?

বলতে পারব না।

আপনার কোন হাত ছিল না ?

অয়েল কোম্পানির কাউকেই আমি চিনি না।

আশু বিশ্বাসের হাত থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয় ?

বলতে পারি না।

এখানে আপনার কাছে আরতি দেবী কখনও এসেছেন ?

এসেছে কয়েকবার।

আশু বিশ্বাস জানতেন সেকথা ?

না।

আশুবাবু তো মারা গেছেন, এখন আপনি কি করবেন ?

যেমন বজ্রধ্বনি কাগজে কাজ করছিলাম – যদি তাঁরা রাখেন তো কাজ করব, নচেৎ অন্য কোন চাকরি খুঁজে নিতে হবে।

থাকবেন কোথায় ?

দু-একদিনের মধ্যেই একটা বাসা ঠিক করে উঠে যেতে হবে।

আর একটা কথা—

বলুন ?

আশুবাবু উইল করে গিয়েছেন জানেন ?

না।

জানেন না ?

না।

শোনেনওনি কথাটা ?

না।

তাঁর উইলে কি লেখা আছে জানেন ?

কেমন করে বলব ?

তিনি আপনাকে নারায়ণী ম্যানসনের সম্পূর্ণ তিনতলার ফ্ল্যাটটা ও নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছেন তাঁর উইলে—

আমাকে ? কে আপনাকে এসব আজগুবী খবর দিল ?

যেই, দিক কথাটা সত্যি। তার পরই একটু থেমে কিরীটী বললে, কিন্তু কেন বলুন তো, হঠাৎ তাঁর এই দাক্ষিণ্য তাঁর এক সাধারণ কর্মচারীর প্রতি ?

বলতে পারব না। তবে—

তবে ?

তিনি দিলেই যে তাঁর দান আমি গ্রহণ করব, তারই বা কি মানে আছে ?

বলেন কি, গ্রহণ করবেন না ?

না।

কেন ?

গ্রহণযোগ্য নয় বলে তাঁর দান।

ওটাই কি আপনার স্থির সংকল্প ?

হ্যাঁ।

হয়তো তিনি আপনাকে সত্যিকারের স্নেহ করতেন, তাই ঐ টাকা আর এই বাড়ির একটা ফ্ল্যাট আপনাকে তাঁর উইলে দিয়ে গিয়েছেন। তবে আপনি গ্রহণই বা করবেন না কেন ?

আমাকে অপমান করবার তাঁর কোন অধিকার নেই! হঠাৎ যেন একটু কড়া সুরেই কথাগুলো বলে শত্রুঘ্ন।

অপমান ? এতে অপমানের কি থাকতে পারে ?

নিশ্চয়ই থাকতে পারে—আপনি সে বুঝবেন না!

মনে হচ্ছে তাঁর প্রতি যেন আপনার একটা আক্রোশ ছিল ?

আমি তাঁকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতাম।

ঘৃণা করতেন!

হ্যাঁ।

তা সত্ত্বেও তাঁর এখানে চাকরি করতেন ? আশ্চর্য!

এতে আশ্চর্যের কি আছে ?

তা আছে বইকি। যাক সে কথা, হয়ত তাঁকে ঘৃণা করা সত্ত্বেও তাঁর কাছে চাকরি নেওয়াটা আপনার প্রয়োজন ছিল, তাই—

শত্রুঘ্ন বাধা দিল, আপনাদের যদি আর কিছু না জিজ্ঞাসা করার থাকে তো—আমাকে একবার বেরুতে হবে।

না, আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। চলুন মিঃব্যানার্জী—

কিরীটী ও রাধেশ ব্যানার্জী ঘর থেকে বের হয়ে এল।

ঘর থেকে বের হয়ে কিরীটী বললে, চলুন ব্যানার্জী, একবার বেগমসাহেবার সঙ্গে মোলাকাত করে যাওয়া যাক। তাঁকে থাকবার জন্য খবর দিয়েছিলেন তো ?

হ্যাঁ।

নুরুন্নেসা বেগমের বন্ধ দরজায় নক করতেই ভিতর থেকে সাড়া এল, কে ?

আমি ব্যানার্জী—থানার ও. সি.।

দরজা খুলে গেল। সেই পূর্বদিনের দাসী মরিয়মই দরজা খুলে দিল।

বেগমসাহেবা আছেন ?

জী—বসুন।

দাসী ভিতরে চলে গেল।

একটু পরে নুরুন্নেসা বেগম ঘরে প্রবেশ করল। পরনে একটা সিল্কের লুঙ্গি—গায়ে গরম পাঞ্জাবি।

এই যে ইনসপেক্টর সাহেব, আমি জানতে চাই এভাবে আমাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে কেন? বেশ ঝাঁজালো সুরেই প্রশ্নটা করল নুরুন্নেসা বেগম।

বসুন! কিরীটী বললে।

আপনারা কি আমাকেই আশু বিশ্বাসের হত্যাকারী ভেবেছেন নাকি? আবার ঝাঁজালো স্বরে প্রশ্ন নুরুন্নেসা বেগমের।

ভাবাটা কি খুব অন্যায় হবে? কিরীটী শান্ত গলায় বললে।

What do you mean? আমি আশুবাবুকে হত্যা করেছি—are you mad?

বেগমসাহেবা, কয়েকটা প্রশ্নের আমরা জবাব চাই! কিরীটী বললে।

না না, কোন প্রশ্নের আপনাদের আমি জবাব দেব না।

না দিলে আপনার প্রতি পুলিসের সন্দেহটা আরও ঘনীভূত হবে।

যা খুশি আপনাদের করতে পারেন।

এবারে রাধেশ ব্যানার্জী কথা বললে, গম্ভীর গলায় বললে, তাহলে আপনাকে অ্যারেস্ট করতে আমি বাধ্য হব বেগমসাহেবা!

অ্যারেস্ট?

হ্যাঁ। এখুনি যেতে হবে আপনাকে আমার সঙ্গে থানায়।

হঠাৎ যেন দপ্ করে নিভে যায় নুরুন্নেসা বেগম। হাওয়া বের হয়ে যাওয়া বেলুনের মত যেন হঠাৎ নুরুন্নেসা বেগমের মুখটা চুপসে যায়, কিন্তু পরক্ষণেই যেন নিজেকে সামলে নেয়।

আমাকে অ্যারেস্ট করবেন?

হ্যাঁ।

কেন? কি করেছি আমি?

আশু বিশ্বাসের হত্যার ব্যাপারে সাসপেক্টের লিস্টে আপনি একজন। ব্যানার্জী বললে।

হঠাৎ ঐ সময় দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি, পরিধানে পায়জামা ও স্লিপিং গাউন গায়ে জড়ানো কক্ষের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

কি ব্যাপার নুর?

কিরীটী আগন্তুকের দিকে তাকায়, লম্বাচওড়া বলিষ্ঠ গঠন, মাথার চুল কাঁচা-পাকায় মেশানো—ক্লিন শেভড্—মুখে পাইপ।

আপনারা? আগন্তুক প্রশ্ন করল।

রাধেশ ব্যানার্জী নিজের পরিচয় দিল।

আপনি?

আমার নাম হামিদুল হক।

ওঁর স্বামী? রাধেশ ব্যানার্জী বলে।

হ্যাঁ। কিন্তু ব্যাপার কি?

এ বাড়ির মালিক আশু বিশ্বাসের হত্যার ব্যাপারে ওঁকে আমরা কিছু প্রশ্ন করতে চাই। রাধেশ ব্যানার্জী বললে।

কিন্তু আমার স্ত্রীকে কেন? আশুবাবুর হত্যার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক থাকতে পারে যে ওকে প্রশ্ন করতে এসেছেন আপনারা?

এইজন্য এসেছি যে—, শান্ত গলায় রাধেশ ব্যানার্জী বললে, ওঁর মানে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আশু বিশ্বাসের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল!

আমি তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। একজন ভদ্রমহিলা সম্পর্কে—, জানেন, আপনাদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আমি আনতে পারি?

আঃ, হামিদ থামো! সহসা বাধা দিল নুরুন্নেসা, তারপর কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বললে, বলুন কি জানতে চান আপনারা?

নুর—

থামো হামিদ। ওঁরা কি জানতে চান ওঁদের বলতে দাও!

বাট মাই ডিয়ার—

তুমি বস! কই বলুন, কি আপনাদের প্রশ্ন?

কিরীটী প্রশ্ন করে, আপনি আপনার সেদিনকার জবানবন্দিতে বলেছেন, রাত সাড়ে আটটায় আপনি দুর্ঘটনার রাত্রে নীচের ফ্ল্যাটে মিঃ বিশ্বাসের ঘরে গিয়েছিলেন, মিনিট কুড়ি-পঁচিশ ছিলেন—

সে তো বলেছিই।

বেশ, তারপর সে ঘর থেকে বের হয়ে আপনি কোথায় যান?

কেন, বলেছি তো রাত্রের শোতে সিনেমায় গিয়েছিলাম!

তা বলেছিলেন, কিন্তু সঙ্গে কে ছিল?

তাও তো বলেছি, আমার এক বান্ধবী ছিল।

তিনি কে? তাঁর নাম কি? কোথায় থাকেন তিনি—আমরা জানতে চাই।

কারণ?

কারণ আপনি বলেছেন বান্ধবী, কিন্তু আমরা যতদূর জানতে পেরেছি—কোন বান্ধবী সেরাত্রে আপনার সঙ্গে ছিল না!

তার মানে, আপনারা বলতে চান আমি মিথ্যা বলেছি?

হ্যাঁ। এবং আপনার সঙ্গে সেরাত্রে কে ছিল তাও আমরা জেনেছি!

কে?

কিরীটী শান্ত গলায় বললে, আপনার স্বামী—উনি—হক সাহেব!

কি আবোলতাবোল বকছেন—ও তো সবে কালবিকালে ফিরেছে। স্খলিত কণ্ঠে হেসে উঠল কথাগুলো বলে নুরুন্নেসা বেগম।

বেগমসাহেবা, আপনি সেরাত্রে যে সিনেমায় গিয়েছিলেন তার ম্যানেজার মিঃ

মালকানীকে চেনেন তো আপনি ! কি, চেনেন না ? কিরীটী শান্ত গলায় কথা-গুলো বলে নুরুন্নেসার দিকে তাকাল।

কিরীটীর সেই দৃষ্টি যেন ছুরির ফলার মত নুরুন্নেসাকে বিদ্ধ করতে থাকে।

নুরুন্নেসার মুখখানা সত্যিই তখন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। সে নির্বাক, বিমূঢ়।

কিরীটী বলতে থাকে, এবং নিশ্চয়ই এও আপনাদের মনে আছে—আপনারা স্বামী-স্ত্রী সেরাত্রে হাফ-টাইমের আগেই বের হয়ে আসেন হল থেকে, রাত তখন ঠিক সোয়া দশটা হবে ;—এবার বলবেন কি, হল থেকে বের হয়ে রাত সোয়া দশটা থেকে রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত আপনারা কোথায় ছিলেন ?

নুরুন্নেসা কেমন যেন অসহায় দৃষ্টিতে হামিদুল সাহেবের মুখের দিকে তাকায় এবারে।

হামিদুল সাহেব বলে, হ্যাঁ, আমরা বের হয়ে এসেছিলাম—

সে তো মিঃ মালকানীর মুখেই শুনেছি, কিন্তু বের হয়ে কোথায় গিয়েছিলেন ?

হোটেলে।

কোন্ হোটেলে ?

হোটেল প্যাজাতে।

হক সাহেব, আবার আর একটা মিথ্যা বললেন। আর মিথ্যা এমনই জিনিস যে, একটা মিথ্যা ঢাকতে হাজারটা মিথ্যার প্রয়োজন হয়, অথচ যে মিথ্যাটা ঢাকার জন্য আবার মিথ্যা এসে গেল সেই মিথ্যাটা কিছুতেই ঢাকা পড়ে না, কেবলই দাঁত খিঁচুতে থাকে।

মিথ্যা বলছি, আপনি বলতে চান ? হক সাহেব চেঁচিয়ে ওঠে।

নিশ্চয়ই। কারণ সেরাত্রে প্যাজায় আমিই এক বন্ধুর সঙ্গে ডিনার খেয়েছি এবং আমরা রাত আটটা থেকে সাড়ে এগারটা পর্যন্ত প্যাজা হোটেলে ছিলাম। এখন বলুন সত্যি কথাটা, কোথায় ছিলেন আপনারা রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত ?

হামিদুল হক যেন হঠাৎ থতমত খেয়ে গেল।

বলুন—জবাব দিন আমার প্রশ্নের ?

আমরা এখানে চলে আসি। হক সাহেব বললে।

না, আসেননি। আপনি কালই সন্ধ্যায় এসেছেন—এ কদিন গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন !

গা-ঢাকা দিতে যাব কেন ?

সেটা তো একমাত্র আপনারই জানার কথা হক সাহেব ! কিরীটী বললে, বলুন না, কেন হঠাৎ ক'টা দিন গা-ঢাকা দিয়েছিলেন ?

গা-ঢাকা দিই নি—আমার কাজ ছিল।

কলকাতায় থেকেও বাসায় আসেননি ?

সময় পাইনি।

কিরীটী আবার হাসল।—হক সাহেব !

বলুন ?

আপনারা তো মাসে মাসে চারশ টাকা করে এই ফ্ল্যাটের ভাড়া দিতেন !

হ্যাঁ।

ভাড়ার রসিদ একটা দেখাতে পারেন ?

ভাড়ার রসিদ ? কেন পারব না ?

নিয়ে আসুন তো দেখি একটা !

ঐ সময় নুরুন্নেসা বেগম বলে ওঠে, সে-সব কোথায় আছে কে জানে ! খুঁজতে হবে !

খুঁজেও বোধ হয় পাবেন না।

কি বলছেন ? স্খলিত কণ্ঠে বলে নুরুন্নেসা।

কিরীটী বললে, থাকলে তো পাবেন !

মানে ?

মানে অত্যন্ত স্পষ্ট। ভাড়া আপনাকে দিতে হত না।

বিনা ভাড়ায় এখানে আমরা আছি, বলতে চান ? হক সাহেব প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করে।

ঠিক আছে, একটা রসিদ যদি খুঁজে পান তো থানায় জমা দেবেন। কারণ আদালতেও ঠিক ঐ প্রশ্ন যে উঠবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত !

আদালত ?

খুনের মামলায় যখন জড়িয়ে পড়েছেন আপনারা, আদালতে আপনাদের হাজির হতে হবে বইকি ! কিরীটী শান্ত গলায় বললে।

কিন্তু বিশ্বাস করুন, আশু বিশ্বাসকে হত্যা আমরা করিনি। হক সাহেব বলে ওঠে।

আমাকে বলে কি হবে ? আদালতেই যা বলবার বলবেন ! কিরীটী বললে।

শুনুন ইন্‌স্‌পেক্টার—, হক সাহেব যেন কি বলতে যায়, বাধা দেয় তার বেগম, সে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, আমি রাত এগারটায় ফ্ল্যাটে চলে এসেছিলাম—আমার হাজব্যান্ড আসেনি !

কিরীটী পুনরায় প্রশ্ন করে, কেন ?

হক সাহেব বললে, আমার কাজ ছিল।

হুঁ। বেগমসাহেবা, এগারটা থেকে রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত আপনি কি করছিলেন ? ঘুমাননি নিশ্চয়ই ?

ঘুমাচ্ছিলাম।

না, ঘুমোননি। আপনি রাত এগারটা থেকে সোয়া বারোটার মধ্যে কোন এক সময় আবার—অর্থাৎ সেরাত্রে দ্বিতীয়বার নীচের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন !

নীচের ফ্ল্যাটে ?

হ্যাঁ, আশু বিশ্বাসের ঘরে !

কে—কে বললে ? নুরুন্নেসার গলাটা কাঁপতে থাকে।

তারপর যা ঘটেছিল তা হচ্ছে, কোন একটা চাবি দিয়ে তাঁর ঘরের সিন্দুকটা আপনি খোলবার চেষ্টা করেছিলেন—

না, না! চেঁচিয়ে ওঠে কিরীটীর কথায় তীক্ষ্ন প্রতিবাদে নুরুন্নেসা বেগম।

কিরীটী পকেট থেকে একটুকরো সাদা উল বের করে বললে, এটাই তার প্রমাণ! সিন্দুকের গা-তালার কভারের সঙ্গে এই উলটা জড়িয়েছিল—এটা আপনার ব্যবহৃত সাদা শালের উল।

নুরুন্নেসা বেগম ক্ষণকাল চুপ করে থেকে হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে দু-হাতে মুখ ঢেকে বলে, আমি আশুকে খুন করিনি—খুন করিনি—বিশ্বাস করুন তাকে আমি খুন করিনি!

গেটের তালার চাবিটাও আপনি নষ্ট করেছিলেন!

নুরুন্নেসা বেগম কোন জবাব দেয় না। কেবল কাঁদতে থাকে।

কিরীটী মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে থেকে ব্যনার্জীর দিকে তাকিয়ে বললে, চলুন মিঃ ব্যানার্জী।

রাধেশ ব্যানার্জী কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল, তারপর ঘর থেকে বের হয়ে এল কিরীটীর পিছনে পিছনে।

॥ বারো ॥

পরের দিন সকালে। আরতি ঘরে কাজে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, এমন সময় দরজার কড়াটা নড়ে উঠল।

কে এল দেখ্ তো! আরতি ছোট বোনকে বললে।

ছোট বোন চলে গেল এবং একটু পরে শত্রুঘ্ন এসে ঘরে ঢুকল।

তুমি?

আরতি, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে!

কি কথা? আরতি শত্রুঘ্নর মুখের দিকে তাকাল।

বেরুচ্ছ তো?

হ্যাঁ।

এক কাজ কর—

কি?

বড় রাস্তায় যে 'চা-পান' রেস্তোরাঁটা আছে সেখানে আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমি আসব—তুমিও আসবে, কথা আছে।

কোন কথা থাকলে এখানেই তা বলতে পার।

না। যা বললাম তাই করো—আর শোন, তোমাদের জন্য বেলতলায় একটা বাসা দেখেছি, কাল-পরশুই সেখানে উঠে যাবে—এই নাও বাড়ির চাবি।

আরতি কিন্তু কোন আগ্রহই দেখাল না চাবির ব্যাপারে।

ধর চাবিটা!

না। ও চাবির কোন প্রয়োজন নেই।

আছে। যা বলছি শোন—ধর চাবিটা—দুপুরে গিয়ে একসময় বাড়িটা দেখে এসো।

আরতি এবারে হাত বাড়িয়ে চাবিটা নিল।

আমি চললাম। মনে থাকে যেন, সন্ধ্যা ঠিক সাড়ে সাতটায় 'চা-পান' রেস্তোরাঁতে—, কথাগুলো বলে শত্রুঘ্ন আর দাঁড়াল না, চলে গেল।

বেলা দশটা নাগাদ কিরীটী রাধেশ ব্যানার্জীর ফোন পেল।

কে? মিঃ ব্যানার্জী—কি খবর?

শত্রুঘ্ন আবার গুলু ওস্তাগর লেনের বাসায় গিয়েছিল!

ঠিক আছে। যেমন নজর রাখতে বলেছি তেমনি নজর রাখতে বলবেন আপনার লোকটিকে ওর ওপরে। ও আর আরতি অন্য কোথাও মীট করলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সংবাদ দেবেন—আমি বাড়িতেই আছি।

নুরুন্নেসা বেগমের উপরেও কি—

হ্যাঁ, নজর রাখতে হবে। সন্তোষ সিংহের কোন খবর পেলেন?

না। আর একটা কথা, সনাতনের উপরেও কি নজর রাখতে হবে?

প্রয়োজন নেই।

রাধেশ ব্যানার্জী ফোন ছেড়ে দিল।

কিরীটী ফোনটা নামিয়ে রেখে দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাল। বেলা এগারটা। সকালেই সে ফোন করেছিল শত্রুঘ্নকে, বেলা এগারটায় তাকে এখানে এসে দেখা করবার জন্য। শত্রুঘ্ন বলেছে, আসবে।

সিঁড়ির মাথায় কলিং বেলটা বেজে উঠল। একটু পরে জংলী এসে ঘরে ঢুকল, শত্রুঘ্নবাবু এসেছেন।

এই ঘরে পাঠিয়ে দে।

জংলী চলে গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই শত্রুঘ্ন জংলীর পিছনে পিছনে এসে ঘরে ঢুকল।

আসুন শত্রুঘ্নবাবু!

শত্রুঘ্নর চেহারাটা যেন আরো ক্লান্ত আরো বিষণ্ণ মনে হল গতকাল থেকে।

বসুন।

শত্রুঘ্ন বসল।

শত্রুঘ্নবাবু!

বলুন?

ইউনিভারসিটির বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণকারীদের লিস্টের মধ্যে আপনার নামটা তো পেলাম না!

পাবেন না।

পাব না ?

হ্যাঁ, আমার অন্য নাম ছিল তখন। শান্ত গলায় বললে শত্রুঘ্ন।

অন্য নাম ?

হ্যাঁ, শত্রুঘ্ন আমার নাম নয়—আমার নাম প্রফুল্ল চক্রবর্তী।

কিরীটী যেন সহসা চমকে ওঠে। বলে, তবে কি প্রফুল্লবাবু—

ও নামে আমাকে ডাকবেন না। ও নামটা আমি ত্যাগ করেছি।

কিরীটী যেন মুহূর্তকাল কি ভাবল, তারপরই শান্ত গলায় প্রশ্ন করল, আশু বিশ্বাস আপনার সত্যিকারের নামটা জানতেন ?

না।

আপনার সার্টিফিকেট দেখতে চাননি কখনো তিনি ?

না।

আপনি তাহলে অবিনাশ চক্রবর্তীর কোন—

না, বলেছি তো তিনি আমার পালক-পিতা !

আপনার জন্মদাতার নাম কি ?

বলব না।

বললে বোধ হয় ভালই করতেন।

কারো সাধ্য নেই, আমার ভাল করে এ জগতে। ক্লান্ত গলায় বললে শত্রুঘ্ন, কিন্তু আপনি আমাকে ডেকেছিলেন কেন ?

আশু বিশ্বাসকে আপনি প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন, তাই না ?

হ্যাঁ। কতবার বলব সেকথা !

তবু তাঁরই ওখানে আজ প্রায় তিন বছর ধরে চাকরি করছিলেন !

করছিলাম।

কেন করছিলেন, কোন সুযোগের অপেক্ষায় কি ?

সহসা যেন চমকে মুখ তুলে তাকাল শত্রুঘ্ন, কিরীটীর সঙ্গে চোখাচোখি হল, শত্রুঘ্নর দু'চোখের মণিতে যেন চাপা আগুনের দীপ্তি !

যেন দুটো ধারাল ছুরির ফলা !

শত্রুঘ্নবাবু, কি সম্পর্ক ছিল আপনার তাঁর সঙ্গে ?

কোন সম্পর্ক ছিল না।

তবু তাঁকে আপনি প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে হত্যার সংকল্প এঁটেছেন মনে মনে—

হ্যাঁ, আর তাই—তাঁকে আমি হত্যা করেছি। শত্রুঘ্ন বলে উঠল, হ্যাঁ, আমিই তাঁকে হত্যা করেছি—আপনি থানায় সংবাদ দিন।

বুঝতে পারছি শত্রুঘ্নবাবু, প্রচণ্ড বিদ্বেষ ছিল আপনার তাঁর প্রতি—

হ্যাঁ ছিল—আর কেন ছিল জানেন ?

বলুন, থামলেন কেন ?

আমার সত্যিকারের পরিচয়টাই যখন আপনি জেনেছেন কিরীটীবাবু, তখন আর কিছুই গোপন করতে চাই না। সবই বলব যা জানতে চান। আমার মা—

মাকে তাঁর কুমারী অবস্থায়—, শত্রুঘ্ন লজ্জায় অধোবদন হল।

আন্দাজ করেছিলাম কতকটা ঐরকম—বিশেষ করে আশু বিশ্বাসের ডাইরীটা পড়ে।

ডাইরী!

হ্যাঁ। আর আপনি হয়ত শুনে আশ্চর্য হবেন, আশু বিশ্বাস আপনাকে চিনতে পেরেছিলেন আর তাই হয়ত তাঁর কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তাঁর উইলে—

চুপ করুন—চুপ করুন! তাঁর কথা বলবেন না!

আরতি এসে ঐ সময় ঘরে ঢুকল।

আসুন আরতি দেবী! কিরীটী আহ্বান জানাল।

আরতি—তুমি?

শত্রুঘ্নর কণ্ঠ হতে বিস্ময়ের সঙ্গে নামটা যেন উচ্চারিত হল।

আমিই ওঁকে আসতে বলেছিলাম।

কিন্তু কেন? ও তো আশু বিশ্বাসকে হত্যা করেনি—হত্যা করেছি আমি। আমি—আমাকে গ্রেপ্তার করুন। যেতে দিন—please, ওকে যেতে দিন কিরীটীবাবু! শত্রুঘ্ন মিনতিতে একেবারে যেন ভেঙে পড়ল।

বসুন—স্থির হোন শত্রুঘ্নবাবু। আমার এখানে পুলিস আসার কোন সম্ভাবনাই নেই, আর পুলিস জানেও না যে আপনারা এ সময় এখানে আসবেন বা আসতে পারেন। কিরীটী শান্ত গলায় বললে।

কিরীটীবাবু! আরতি ডাকল।

বলুন?

দাদা আশু বিশ্বাসকে হত্যা করেনি। করেছি আমি—আর কেন হত্যা করেছি জানেন? আমাকে চাকরি দিয়ে সে আমার উপরে—

বলতে হবে না আরতি দেবী, ব্যাপারটা আমি পূর্বেই অনুমান করেছিলাম। কিরীটী বললে।

ও কেবল শয়তানই নয়, জঘন্য একটা লম্পট! আরতি বললে, সেরাত্রে আমাদের বাসায় গিয়ে—

চেঁচিয়ে উঠল শত্রুঘ্ন, আঃ আরতি, আরতি—থাম—থাম—

না দাদা, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমিই করব, তোমাকে করতে দেবো না। আরতি বলে ওঠে।

ওর কোন কথা বিশ্বাস করবেন না কিরীটীবাবু, ও হত্যা করেনি, আরতি নির্দোষ—সম্পূর্ণ নির্দোষ—আশু বিশ্বাসকে হত্যা করেছি আমি—আমি—আমি—

না, আমি। শুনুন সেরাত্রে কি হয়েছিল—, আরতি বলবার চেষ্টা করে।

আমি জানি কি হয়েছিল আরতি দেবী। কিরীটী বললে, সেরাত্রে কিছু টাকা নিয়ে আশু বিশ্বাস আপনাদের বাড়িতে যান, তার পর হয়ত আপনি ক্ষেপে যান এবং হাতের কাছে কিছু না পেয়ে সামনেই ছিল একটা ক্রুশের কাঁটা, সেটা তাঁর বুকে বিঁধিয়ে দেন—তাই না?

হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে আশু বিশ্বাস পড়ে যায়।

আমি বুঝেছিলাম পোস্ট মর্টেমের রিপোর্ট থেকেই, যে কোন নারীর হাতেই সম্ভবতঃ আশু বিশ্বাসের মৃত্যু ঘটেছে। নচেৎ তাঁর বুকের হার্টের মাসলের মধ্যে ক্রুশ-কাঁটার ভাঙা অগ্রভাগটা পাওয়া যেত না ময়না তদন্ত করতে গিয়ে মৃতদেহে।

শত্রুঘ্ন বোবা। যেন পাথর।

কিরীটী বলতে থাকে, আপনি প্রফুল্লবাবু, হয়ত সে-সময় সন্দেহের বশে আশু বিশ্বাসকে ফলো করেই সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন!

শত্রুঘ্ন নির্বাক।

কিরীটী আবার বলতে থাকে, বোনকে বাঁচানোর জন্য আপনি আর আরতি দেবী দুজনে পরে মৃতদেহ বহন করে নারায়ণী ম্যানসনে নিয়ে যান এবং পাছে আরতি দেবীকে কেউ না দেখে ফেলে এবং দেখলেও না চিনতে পারে, তাই আপনার কালো ওভারকোটটা ওর গায়ে পরিয়ে এনেছিলেন এবং ভাগ্যক্রমে কোলাপসিবল্ গেটের তালাটা ভাঙা থাকায় ভিতরে গিয়ে ডেড বডিটা তাঁর ঘরে রেখে আসতে কোনই অসুবিধা হয়নি।

কিন্তু আপনাদের আসতে একজন দেখেছিল—নারায়ণী ম্যানসনের দারোয়ান—কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারিনি, আপনি জানতে পেরেছিলেন কি করে যে আশুবাবু গুলু ওস্তাগর লেনের বাসায় যাচ্ছেন?

আরতি বললে, আমিই টেলিফোনে দাদাকে খবরটা দিয়েছিলাম।

আর ওভারকোটটা?

ওটা আমার। প্রফুল্ল বললে।

কিরীটী অতঃপর বললে, আপনারা জানেন না, তালাটা ভেঙেছিল নুরুন্নেসা ও তার স্বামী আগেই সিন্দুক থেকে টাকা চুরি করবার জন্য—কারণ তারা জানত সেরাত্রে আশু বিশ্বাস বের হবে।

কৃষ্ণা যে ইতিমধ্যে কখন ঘরে এসেছে ও কিরীটীর কথা শুনছে কিরীটী জানতে পারে নি। হঠাৎ কৃষ্ণার প্রশ্নে ও ফিরে তাকাল।

কৃষ্ণা বললে, কি করে জানত তারা?

জানত এইজন্য যে, নুরুন্নেসা এক সময় আশু বিশ্বাসের প্রণয়িনী ছিল। আরতির প্রতি তাঁর নজর পড়েছে সেটা সে হয়ত জানতে পেরেছিল কোনক্রমে। কিন্তু মৃতদেহটা নারায়ণী ম্যানসনে নিয়ে গিয়েছিলেন কেন?

সিঁড়িতে মৃতদেহটা রেখে দেব বলে। কিন্তু আরতি হঠাৎ তালাটা টেনে দেখে তালাটা খোলা। সেকথা আমায় বলতেই আমি তখন মৃতদেহটা তার ঘরে নিয়ে গিয়ে রেখে আসি। প্রফুল্ল বললে।

কিরীটী বললে, আরতি দেবী, আইন কি বলবে না বলবে তা নিয়ে আমার এক্ষেত্রে কোন মাথাব্যথা নেই, কারণ কেতাবী আইনের বাইরেও একটা আইন আছে, বিধাতার আইন, সেই আইনে যদি কেউ আপনাদের বিচার করে তো আপনাদের নির্দোষই বলবে—আপনারা চলে যান।

প্রফুল্ল তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে, পুলিসে খবর দেবেন না ?

না ! তারা যা বুঝবে করবে।

কিন্তু আপনি—

আমার বিচারে আপনারা—আপনার বোন হত্যাকারী নন।

কিরীটীবাবু ! প্রফুল্লর গলাটা ধরে আসে।

একটা কথা প্রফুল্লবাবু কেবল বলব, আপনার স্বর্গগত জননীর উপরে কোন ক্ষোভ আর রাখবেন না।

ডাইরীটী আমি পেতে পারি ? প্রফুল্ল বলে।

না। সেটা আমি পুড়িয়ে ফেলেছি। যান এবারে !

প্রফুল্ল ও আরতি দুজনে এগিয়ে এসে কিরীটীর পায়ের ধুলো নেয়।

ভাই ও বোন বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

কৃষ্ণার চোখে জল।

কৃষ্ণা !

বল !

খুশী হয়েছে ?

তোমার কি মনে হয় ?

খুশী হয়েছ।

কৃষ্ণা হাসল।

নাগপাশ

কিন্তু আপনারা দুজন ছাড়া তো দোতলায় সেরাত্রে কেউ ছিল না। এমন কি একতলা থেকে দোতলায় উঠবার সিঁড়ির কোলাপসিব্‌ল গেটটা পর্যন্ত তালা বন্ধ ছিল। চাবিও আপনাদেরই একজনের কাছে ছিল।

থানার ও. সি. নির্মল চাটুজ্যে একটু দম নিয়ে বলতে লাগলেন, সেক্ষেত্রে কেমন করে বিশ্বাস করি বলুন আপনাদের কাকা অরবিন্দবাবুর হত্যার ব্যাপারটা আপনাদের দুজনার একজনও গতরাত্রে জানতে পারেননি!

মলয় আর বকুল পাথরের মত দাঁড়িয়ে। কারও মুখে একটি কথা নেই। নির্মল চাটুজ্যে আবার বলতে লাগলেন, একখানা ঘরের পরেই পর পর দুখানা ঘরে পাশাপাশিই বলতে গেলে ছিলেন আপনারা দুই ভাই-বোন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ঘুমন্ত অবস্থায় আপনাদের কাকা অরবিন্দ চৌধুরীকে পৃষ্ঠদেশে ছোরা-বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। বিছানার চাদরে রক্ত—নিশ্চয়ই ঘুমের মধ্যে অতর্কিতে ছোরাবিদ্ধ হয়ে খাট থেকে ছড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিলেন অরবিন্দবাবু। এবং মারাত্মক আঘাতের জন্য কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে—ধরে নিলাম না হয় বাইরের কেউই এসে ওঁকে হত্যা করেছে—কিন্তু তারপর সেই আততায়ী দোতলা থেকে পালাল কি করে? ছাদের উপর দিয়েও পালাবার কোন পথ নেই—যেতে হলে বাইরের ঐ সিঁড়ি ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথই নেই।

মলয় এতক্ষণে ক্ষীণগলায় বললে, বিশ্বাস করুন—কিছুই আমরা জানতে পারিনি।

নির্মল চাটুজ্যে হাসলেন।

স্পষ্টই অবিশ্বাসের হাসি।

নির্মল চাটুজ্যের বয়স হয়েছে—পঞ্চাশের কাছাকাছি। লোকটা অত্যন্ত রগচটা—কড়া মেজাজের এবং জীবনে কখনো কারো তোষামোদ করতে পারেননি বলেই সারাটা চাকরি-জীবনই তাঁকে দারোগাগিরি করে কাটাতে হচ্ছে আর হয়ত হলেও। ব্যাচিলার মানুষ, তাই পরোয়াও বড় একটা কিছুর করেন না। পাশেই দাঁড়িয়েছিল কিরীটী।

এ কাহিনী যখনকার কিরীটী তখন টালীগঞ্জ অঞ্চলের বাড়িতেই থাকে। গড়িয়াহাটায় নতুন বাড়ি করে উঠে আসেনি। তারও বয়স তখন চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের বেশী নয়। ঘটনাটাও ঘটেছে ঠিক তার পাশের বাড়িতেই। পাশের বাগানওয়ালা তিনতলা বাড়িটাই ধনী কোল মার্চেন্ট অরবিন্দ চৌধুরীর।

অরবিন্দ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপও ছিল কিরীটীর প্রতিবেশী হিসাবে। অমায়িক রাশভারী লোক, মধ্যে মধ্যে কিরীটীর ওখানে আসতেন তিনি, কিরীটীও তাঁর বাড়িতে যেত। অরবিন্দ চৌধুরী ব্যাচিলার। বিয়ে-থা করার নাকি সুযোগই পাননি, জীবনযুদ্ধে এত ব্যস্ত ছিলেন। গরীবের ছেলে ছিলেন

চৌধুরী—কিন্তু জীবনে ছিল উচ্চাশা। বড় হবার দুর্গম আকাঙ্ক্ষা।

কয়লার খনিতে সাধারণ কর্মচারী হিসাবে প্রথম যৌবনে চাকরি নিয়েছিলেন—তারপর ধীরে ধীরে মালিকের সুনজরে পড়ে কয়লার কনট্রাকটারী ব্যবসা শুরু করেন ছোটখাটো ভাবে। ক্রমশঃ কনট্রাকটারী ব্যবসা জমে ওঠে। আরও পরে কিনলেন একটি ছোট কয়লার খনি।

ক্রমশঃ একটা খনি থেকে দুটো খনি—তারপর তিনটে। ইতিমধ্যে অর্থের স্বাচ্ছল্য যখন এল দেখলেন অর্থোপার্জনের নেশায় বুঁদ হয়ে থেকে কখন একসময় বয়সটা কোথা দিয়ে চলে গিয়েছে, চুলেও পাক ধরেছে।

বিয়ের আর বয়েস নেই।

বাড়ি, গাড়ি, ব্যাংক-ব্যালেন্স—একজন মানুষের যা আকাঙ্ক্ষিত সবই আজ তাঁর করায়ত্ত। কিন্তু বয়েসটা তাঁর করায়ত্ত থাকেনি।

সংসারে আপনার বলতে ছিল এক বড় ভাই—সুধাবিন্দু।

তিনি প্রথম জীবনেই বি. এ. ফেল করে কোন চাকরি-বাকরি এ দেশে না জোটাতে পেরে বর্মা অঞ্চলে পাড়ি জমিয়েছিলেন একবস্ত্রে। সুধাবিন্দু অরবিন্দর থেকে দশ বছরের বড়। সব ইতিহাস অরবিন্দর কাছেই শোনা কিরীটীর।

বাপ-মা ওদের আগেই মারা গিয়েছিল—দু ভাই ও এক বোন মালতী রাণীগঞ্জ অঞ্চলে তাদের মেসোর কাছেই মানুষ। মালতীকে মেসোই বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন—সে থাকত পাটনায় তার স্বামীর কাছে। মেসো অবিনাশবাবু একটা কোলিয়ারীতে চাকরি করতেন সামান্য মাইনেয়।

সুধাবিন্দু বর্মায় গিয়ে ভাগ্যান্বেষণে যে খুব একটা কিছু লাভবান হয়েছিলেন তাও নয়—তবে ইনসিনের অয়েল রিফাইনারিতে কোনমতে একটা চাকরি পেয়ে গিয়েছিলেন এক স্থানীয় বাঙালী ভদ্রলোকের সুপারিশ ও চেষ্টায়।

তার জন্য অবিশ্যি সুধাবিন্দুকে মূল্য দিতে হয়েছিল কিছু—ভদ্রলোকের অনূঢ়া কন্যাটিকে বিবাহ করে। সুধাবিন্দুরই সন্তান মলয় আর বকুল। ছেলে মলয় বড় এবং মেয়ে বকুল তার চাইতে চার বছরের ছোট।

মলয় রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটিতেই পড়ছিল; বকুলও প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে কলেজে ভর্তি হয়েছিল। ওদের মা অল্প বয়সেই মারা গিয়েছিলেন। মলয়ের তখন ষোল ও বকুলের বারো বছর বয়স। তারপর হঠাৎ একদিন হার্ট-অ্যাটাকে সুধাবিন্দু মারা গেলেন।

ইতিমধ্যে অরবিন্দ গুছিয়ে নিয়েছেন। খনির মালিক—ব্যাংক-ব্যালেন্স—গাড়ি-বাড়ি।

অরবিন্দকে সুধাবিন্দু বছরে একখানা চিঠি লিখতেন—বিজয়া দশমীর প্রীতি ও ভালবাসা জানিয়ে। অরবিন্দও তার জবাবে প্রণাম জানাতেন। বার দুই গিয়েছিলেনও বর্মায় দাদার কাছে। ব্যাস, আর কোন যোগাযোগ দুই ভাইয়ের মধ্যে ছিল না।

সুধাবিন্দু যদিও শুনেছিলেন ছোট ভাইয়ের অবস্থার উন্নতির কথা, কিন্তু

কখনো তার কাছে হাত পাতেননি। প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাজ্ঞান ছিল তাঁর। বাবার মুখেই ভাই-বোন তাদের কাকার কথা শুনেছিল।

সুধাবিন্দুর মৃত্যুর পর মলয় টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিল তার বাপের আকস্মিক মৃত্যুর কথাটা অরবিন্দকে। অরবিন্দ সোজা চলে এসেছিলেন পরবর্তী জাহাজে বর্মায়—এবং ভাইপো ও ভাইঝিকে নিয়ে এসেছিলেন কলকাতায় তাঁর টালীগঞ্জের নবনির্মিত ভবনে।

সে আজ তিন বছর আগেকার কথা। সেই থেকে তারা কাকার আশ্রয়েই রয়েছে। অরবিন্দ মলয়কে তার ব্যবসায় ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন—বকুল কলেজে পড়ছিল।

মলয়ের বর্তমান বয়স চব্বিশ-পঁচিশ—বকুলের বাইশ-তেইশ। মলয় নিয়মিত ব্যায়াম করে—সুন্দর স্বাস্থ্য। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন যুবক। তবে একটু একরোখা ও গম্ভীরপ্রকৃতির।

বকুল ভাইয়ের একেবারে বিপরীত।

ইতিমধ্যে অর্থাৎ মলয় আর বকুল অরবিন্দর আশ্রয়ে আসার পর মাস সাতেক বাদে হঠাৎ একদিন ধীরেন এসে হাজির তার মা মালতীকে নিয়ে। ধীরেন মালতীর একমাত্র পুত্র। মালতীর স্বামীর মৃত্যু হয়েছিল ইতিমধ্যে। বিধবা বোন ও তার পুত্র ধীরেনকে ফিরিয়ে দিতে পারলেন না অরবিন্দ। নিজ গৃহেই আশ্রয় দিলেন।

মালতীর ক্ষয়রোগ ধরেছিল দারিদ্র্যের ও অভাবের মধ্যে যুদ্ধ করতে করতে। অরবিন্দ মালতীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন কিন্তু চিকিৎসায় কোন ফল হল না, মালতী মাসখানেকের মধ্যেই মারা গেল।

ধীরেনকে অরবিন্দ তার রাণীগঞ্জের কোলিয়ারীর ম্যানেজার করে দিয়েছিলেন। ধীরেন সেখানেই থাকে, মধ্যে মধ্যে কলকাতায় আসে।

এসব কাহিনীই কিরীটী প্রসঙ্গক্রমে অরবিন্দ চৌধুরীর কাছে শুনেছিল।

সকালবেলা সেদিন সবে সে ঐদিনকার দৈনিক সংবাদপত্রটা খুলে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছে—কৃষ্ণা এসে ঘরে ঢুকল।

শুনছ!

কি? স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল কিরীটী।

অরবিন্দবাবু নাকি খুন হয়েছেন।

সে কি! চমকে উঠলো কিরীটী।

হ্যাঁ—যাও না, দেখ না—পুলিসও এসে গিয়েছে, এইমাত্র জংলী এসে বললে।

কিরীটীর আর সংবাদপত্র পড়া হল না, চা খাওয়াও হল না—স্যাণ্ডেলজোড়া কোনমতে পায়ে গলিয়ে, গায়ে শালটা জড়িয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

পৌষের শেষ—কলকাতা শহরে বেশ শীত পড়েছে। গতরাত্রে আবার এক-পশলা বৃষ্টি হওয়ায় সকালে শীতটা যেন কনকনে হয়ে উঠেছিল।

একখানা বাড়ির পরেই খানিকটা খোলা জমি, তারপরই অরবিন্দ চৌধুরীর বাড়ি। তিনতলা বাড়ি। একতলায় অফিস—দোতলায় খানপাঁচেক ঘর—তার মধ্যে

দুটো নিয়ে থাকতেন অরবিন্দ এবং তারই একটার মধ্যে লাইব্রেরী।

অরবিন্দর একটা নেশা ছিল রহস্য উপন্যাস ও মাইন সংক্রান্ত যাবতীয় বই পড়ার। প্রচুর কালেকশান। কাজকম সেরে রাত আটটা নাগাদ সামান্য দুধ ও ফল খেয়ে অরবিন্দ শোবার ঘরের সংলগ্ন লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে অনেক রাত্রি পর্যন্ত পড়াশুনা করতেন। দুই ঘরের মধ্যবর্তী একটা দরজাও ছিল এবং ঘরের মধ্যেই বাথরুম।

বাড়িটা ইংরেজী 'এল' প্যাটার্নের।

দোতলায় আর দুটি ঘর নিয়ে থাকে অরবিন্দর ভাইপো ও ভাইঝি মলয় ও বকুল এবং শেষপ্রান্তের ঘরটি যেটায় বিধবা বোন মালতী এসে আশ্রয় নিয়েছিল মাসখানেকের জন্য, সেটা বর্তমানে খালি—তালা দেওয়া। এক মাস সে ঘরে মালতী ছিল। তারপর এই বাড়িতেই তার মৃত্যু হয় ক্ষয়রোগে।

তিনতলায় তিনটি ঘর। সব ঘরগুলিই খালি ও তালা দেওয়া থাকে। চার-তলার ছাতে উঠলে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। খোলা মাঠ।

নীচের তলায় পাঁচখানি ঘর।

একটা ঘরে অরবিন্দর অফিস। দিনের বেলা কর্মচারীরা আসে, কাজকম হয় —সন্ধ্যায় তারা চলে গেলে ঘরে তালা দেওয়া হয়। বাকি দুটো ঘরের একটি ঘরে কলকাতার অফিসের পুরাতন কর্মচারী বৃদ্ধ রসময় দত্ত থাকেন ও অন্য ঘরে বাড়ির ভৃত্য গোকুল, বামুন কার্তিক ও ড্রাইভার বাহাদুর এবং আর দুটো ঘরের একটায় স্টোর রুম ও একটায় কিচেন। এবং সর্বশেষের ঘরটা গেস্টরুম হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

দারোয়ান যোধা সিং বাইরে গ্যারেজের উপরের ঘরে থাকে।

গেট দিয়ে ঢুকে মাঝখানে নুড়িঢালা পথ—দু'পাশে ফুলের গাছ। এক কোণে গ্যারেজ।

গেটের সামনেই দুজন কনস্টেবল প্রহরায় ছিল, তার মধ্যে একজন মোহন সিং, সে কিরীটীকে পূর্বে দেখেছে এবং জানত যে দারোগা সাহেব নির্মল চাটুজ্যের বিশেষ পরিচিত। কিরীটীর প্রবেশে তাই কেউ বাধা দিল না।

নীচের তলাতেই জনা-দুই কনস্টেবল ছিল। কিরীটী সোজা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

বারান্দাতেই নির্মল চাটুজ্যের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নির্মল চাটুজ্যে প্রৌঢ় রসময় দত্তর সঙ্গে কথা বলছিলেন।

কিরীটীকে দেখে নির্মল চাটুজ্যে বলে ওঠেন, আরে রায়মশাই যে—আসুন আসুন—আপনার প্রতিবেশীই শেষ পর্যন্ত খুন হলেন!

তাই শুনেই তো এলাম।

পরিচয় ছিল নিশ্চয়ই চৌধুরীর সঙ্গে? নির্মল শুধালেন।

ছিল বই কি।

যান—শোবার ঘরেই ডেড বডি আছে।

শয়নঘরটিও কিরীটীর পরিচিত—কয়েকবার এসেছে সে ঘরে। ঘরের মধ্যে পা দিয়েই দাঁড়িয়ে গেল কিরীটী।

বেশ বড় সাইজের ঘরটি। উত্তর দক্ষিণ খোলা ঝকঝকে দামী মোজাইক টাইলের ফ্লোর—সাদাকালোর বরফি প্যাটার্ণ। ঘরের দেওয়াল ডিসটেম্পার করা। ঈষৎ নীলাভ রঙ। দরজায় জানালায় ওই রঙেরই ভারী মোটা দামী পর্দা ঝোলানো।

এক ধারে একটি ডবল বেড। তার পাশে ছোট একটি ত্রিপায়ার ওপরে ফোন—একটি ল্যাম্প ও দামী একটা টেবিল টাইমপিস, জার্মান মেকের। অন্যদিকে একটি ছোট ড্রয়ার ও একটি স্টীলের আলমারী দেওয়ালে গাঁথা একটা আয়রনসেফ। আর একটি ছোট ফ্রিজিডিয়ার। একটি রকিং চেয়ার। আর কোন আসবাবপত্রই নেই ঘরে। ঘরের দেওয়ালে একটিমাত্র অয়েল পেণ্টিং। ঠিক শয্যার শিয়রের দিকে টাঙানো। অরবিন্দ চৌধুরীর স্বর্গত পিতৃদেবের।

খাটের ঠিক কোণ ঘেঁষেই মৃতদেহটা পড়েছিল।

বেশ হৃষ্টপুষ্ট মানুষ এবং সত্যিই রূপবান ছিলেন অরবিন্দ চৌধুরী। সাহেবদের মত টুকটুকে ফর্সা রঙ। পরনে ডোরা-কাটা ফ্লানেলের পায়জামা ও ড্রেসিং গাউন।

বাঁদিকে কাত হয়ে পড়েছিল মৃতদেহটা। একটা হাত চাপা পড়েছে—অন্য হাতটা প্রসারিত ও মুষ্টিবদ্ধ। পৃষ্ঠদেশে বাঁদিকের স্ক্যাপুলা ও ভারটিব্রাল কলমের মধ্যস্থলে ঠিক হার্ট বরাবর একটি ছোরা বিদ্ধ।

ছোরাটা একেবারে সমূলে বিদ্ধ। কালো চকচকে মোষের সিংয়ের সুদৃশ্য বাঁটটি কেবল উঁচু হয়ে বের হয়ে আছে যেন একটা বিভীষিকার মত। খাটের একপাশে চপ্পলজোড়া তখনও পড়ে রয়েছে। যেন মনে হয় কেউ খুলে রেখেছে পা থেকে পাশাপাশি। মেঝেতে চাপ চাপ রক্ত। শয্যার চাদরেও রক্তের দাগ এবং শয্যাটি এলোমেলো। শিয়রের কাছে একটা রহস্য উপন্যাস পড়ে আছে। বইটা বন্ধ।

ঝুঁকে পড়ল কিরীটী এগিয়ে গিয়ে মৃতদেহের সামনে।

চক্ষু দুটি বিস্ফারিত—সামান্য হাঁ করা মুখ। আরও দেখতে পেল কিরীটী বাঁদিকে ঘাড়ের কাছেও একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। সেই ক্ষতস্থান দিয়েও রক্তক্ষরণ হয়ে জমাট বেঁধে কালো হয়ে শুকিয়ে আছে।

ঘরের চারপাশে আর একবার তাকাল।

শয্যার শিয়রের সামনে টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বলছে তখনও; আর নজরে পড়ল টাইমপিসটা টিক্‌টিক্ করে চলেছে। ঘরের চকচকে মেঝের কোথাও কোন পদচিহ্ন বা জুতোর চিহ্ন নেই।

মধ্যবর্তী লাইব্রেরী ঘরের দরজাটা খোলা।

এগিয়ে গেল কিরীটী মধ্যবর্তী দরজাপথে লাইব্রেরী-ঘরের মধ্যে।

ঘরের মধ্যে চারিদিকে আলমারি ও র‍্যাকভর্তি বই—সুন্দরভাবে সাজানো। একটি সেণ্টার টেবিল ও খান দুই সোফা। মেঝেতে লাল রঙের কার্পেট বিছানো। পায়ের পাতা ডুবে যায় পা ফেললে।

ঐ লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে সাধারণত বসে বসে বই পড়তেন অরবিন্দ চৌধুরী। কিরীটী ইতিপূর্বে দিন দুই ঐ লাইব্রেরীতে এসেছে—অরবিন্দর সঙ্গে গল্পও করে গিয়েছে। তাই সেই লাইব্রেরী ঘরটা কিরীটীর অপরিচিত নয়। ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন একটা বাথরুমও আছে। ঘরের সমস্ত জানালাগুলোই বন্ধ।

জানালা-দরজাগুলো বন্ধ থাকায় দিনের বেলাতেও ঘরের মধ্যে একটা আবছায়া অন্ধকার যেন থমথম করছিল।

কিরীটী সুইচবোর্ডটা খুঁজে সুইচ টিপে ঘরের সব আলোগুলো জেবলে দিয়ে আবার ঘরের চারদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতেই তাকাতেই কিরীটীর নজরে পড়ল—কিছু কাগজের টুকরো সোফার একপাশে পড়ে আছে। আর সোফার সামনে গোল টেবিলটার উপরে একটা মোটা বই পড়ে আছে।

কাগজের টুকরোগুলোতে যেন কি সব লেখা মনে হল কিরীটীর। নীচু হয়ে কাগজের টুকরোগুলো তুলে নিল এক এক করে খুঁটে খুঁটে।

কয়েকটা কাগজের টুকরো পরীক্ষা করতে থাকে কিরীটী। কয়েকটা টুকরো কোনমতে জোড়া দিতে কয়েকটা অসংবদ্ধ কথা পড়তে পারল।

যেমন: সে লজ্জার কাঁটা। তুমি মস্ত বড় লোক। কেন বঞ্চিত করি। তোমার মলু। তুমি অস্বীকারই।

মনে হয় একটা চিঠি।

কে কাকে লিখেছিল চিঠিটা? 'মলু' কে? কিরীটীর মনে হয় চিঠিটা যেন গোপনীয়ই ছিল—যার মধ্যে ছিল হয়তো কোন গোপন কাহিনী। কোন গোপন কথা কারো।

কাগজের ছেঁড়া টুকরোগুলো কিরীটী তার পকেটে রেখে দিল।

ঘরের চারপাশ সব দিক আরও ভাল করে পরীক্ষা করল—তারপরই ঢুকলো হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দরজা খুলে সলংগ্ন বাথরুমে।

ঝকঝকে তকতকে বাথরুম। সাওয়ার কমোড বেসিন মিরার টাওয়েল-র‍্যাক সবই আছে। টাওয়েল-র‍্যাকে পরিষ্কার একটি টার্কিশ তোয়ালে ঝুলছে। সোপ-কেসে সাবান।

বাথরুমটার একটি মাত্রই দরজা লাইব্রেরী ঘরের ভিতর দিয়ে। সব কাচের জানালা

কিরীটী বাথরুম থেকে বের হয়ে এল।

বাইরের বারান্দায় বের হয়ে আসতেই কিরীটী দেখতে পেল শরনঘরের ঠিক দরজার সামনে বারান্দায় একটা চেয়ার পেতে বসে সম্মুখে দণ্ডায়মান মৃত অরবিন্দর ভাইপো মলয়কে প্রশ্ন করছেন নির্মল চাটুজ্যে।

তার একপাশে দাঁড়িয়ে বকুল, আর সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ রসময় দত্ত। নির্মল চাটুজ্যে মলয়ের দিকে তাকিয়ে বলছিলেন, কেমন করে বিশ্বাস করি বলুন! সিঁড়ির কোলপসিবল্ গেটে তালা দেওয়া ছিল। সেই চাবিও আপনাদের কাছে থাকে এবং ছিল। অথচ আপনাদের কাকা অরবিন্দবাবুর হত্যার ব্যাপারটা আপনারা দুজনার একজনও কাল রাত্রে জানতে পারেননি!

মলয় আর বকুল পাথরের মতই দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ কিরীটী ওই সময় প্রশ্ন করে, মলয়বাবু, আপনারা গতকাল রাত্রে কোন-রকম অস্বাভাবিক শব্দ বা চিৎকার শোনেননি কেউ ?

ভাই ও বোন কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

কিরীটী তাদের অপরিচিত নয়। কিরীটী সম্পর্কে ওদের একটা শ্রদ্ধাও ছিল।

মলয়বাবু ?

মলয় মুখ তুলে কিরীটীর দিকে তাকাল।

'মলু' নামে কোন মেয়েকে জানেন ?

মলু ? কেমন যেন বিস্ময়ে তাকায় মলয় কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, ডাকনাম মলু বা নামের সংক্ষিপ্ত ডাক। যেমন ধরুন মালতী—মালবী—মালবিকা—মলিনা—মলয়া—ওই রকমের কোন নাম কখনও আপনার কাকার মুখে শুনেছেন ?

না তো—

বকুল দেবী, আপনি ?

কিরীটী বকুলের মুখের দিকে তাকাল।

না। তবে—

কি ?

পিসিমার নাম তো মল্লিকা ছিল।

কিরীটী যেন হঠাৎ চমকে ওঠে। বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, মল্লিকাও তো হতে পারে। ভাল কথা, মল্লিকা দেবীকে আপনাদের কাকামণি কি নামে ডাকতেন। মলু বলে কি ?

না তো—তাকে তো বরাবর মল্লিকা বলে ডাকতেই শুনেছি।

ওঃ ! মনে হল কিরীটী যেন একটু কেমন হতাশই বোধ করে।

আপনি কাল রাত্রে কখন শুতে গিয়েছিলেন বকুল দেবী ? কিরীটী আবার প্রশ্ন করল।

কাকামণি তো রাত দশটায়ই খেয়ে নিতেন। তারপর লাইব্রেরী ঘরে বসে পড়াশুনা করতেন, আমরাও তাই খেয়ে নিতাম। তাঁর আদেশ ছিল রাত দশটার পরে সিঁড়ির গেটে তালা দিয়ে দিতে হবে। আমি গতরাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বোধ হয় সাড়ে দশটায় সিঁড়ির গেটে তালা দিয়ে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলাম।

তালা আপনিই দিতেন বরাবর ?

হ্যাঁ।

কখন ঘুমোন ?

বোধ হয় এগারোটায়। শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিলাম। পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

মলয়বাবু—আপনি ? কিরীটী এবারে মলয়ের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল।

আমাদের ক্লাবের গতকাল ক্রিকেট ম্যাচ ছিল—খুব টায়ার্ড ছিলাম। আগেই

খেয়ে নিয়ে শুতে-শুতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বকুল দেবী, গেটের চাবিটা বোধ হয় আপনার কাছে থাকত?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, গতরাত্রে কোলাপসিব্‌ল্‌ গেটের তালাটা দেবার পর সেটা ঠিক লেগেছিল কিনা নিশ্চয়ই পরীক্ষা করে দেখেছিলেন?

দেখেছি। তালা ঠিকই লাগানো হয়েছিল, কারণ আজ আমিই তো তালা খুলে দিয়েছি।

কখন?

ভোর পাঁচটায়।

অত সকালেই সাধারণতঃ তালা খুলতেন নাকি?

হ্যাঁ।

কেন?

খুব ভোরে কাকামণি লেবু দিয়ে গরমজল এক গ্লাস খেতেন প্রত্যহ। গোকুল এসে গরমজল আর লেবু কাকামণিকে দিয়ে যেত।

কখন উঠতেন ঘুম থেকে অরবিন্দবাবু?

খুব আর্লি-রাইজার ছিলেন কাকামণি। কি শীত, কি গ্রীষ্ম—বরাবর ভোর চারটে নাগাদ উঠে পড়তেন। তারপরই ঠাণ্ডা জলে স্নান করতেন। ইতিমধ্যে গোকুল লেবু-জল দিয়ে যেত। সেটা খেয়ে লাইব্রেরীতে বসে বেলা আটটা পর্যন্ত পড়াশুনা করতেন। তারপর জামাকাপড় পরে নীচের অফিসে যেতেন। এখানে আমরা আসা অবধি ঐরকম দেখে এসেছি।

ভাই-বোনকে আর প্রশ্ন করার কিছু ছিল না। তাই একবার কিরীটী বৃদ্ধ রসময় দত্তর দিকে তাকালো।

রসময়বাবু!

আজ্ঞে—

আপনি তো চৌধুরী মশাইয়ের কাছে অনেক বছর আছেন?

হ্যাঁ, তা প্রায় পাঁচ-ছ' বছর তো হবেই।

ব্যাবসার সব খবরই নিশ্চয়ই আপনি জানতেন?

জানতাম।

কোথায়ও কোন গোলমাল ছিল না?

না, তবে—

তবে?

ইদানীং আমাদের রাণীগঞ্জের কোলিয়ারীর কাজকর্ম ভাল চলছিল না বলে একটু চিন্তিত ছিলেন।

আগে নিশ্চয়ই ভাল চলত?

হ্যাঁ।

তবে ইদানীং ভাল চলছিল না কেন?

পুরনো ম্যানেজার তারকদাস ঘোষ রেজিগনেশন দিলেন, তখন ওঁর ভাগ্নে ধীরেনবাবুকে ম্যানেজার করে বসানোর পর থেকেই ক্রমশঃ ঐ খনির কাজকর্ম কেমন যেন ডিটোরিয়েট করতে শুরু করে।

তারকদাস ঘোষ খুব এফিসিয়্যান্ট ছিলেন বুঝি?

সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ধীরেনবাবুকে প্রথমে সেখানে কাজকর্ম দেখবার জন্য পাঠানো হয়। বাবুর ইচ্ছে ছিল কাজকর্ম শিখলে তারপর তাকে ম্যানেজার করে দেবেন। ধীরেন ছেলেটি যেমন চালাক তেমনি বুদ্ধিমান ও কর্মঠ। দেখা গেল দু'মাসের মধ্যেই সে কাজকর্ম চমৎকার বুঝে নিয়েছে, আর তখন থেকেই তারকদাসবাবুর সঙ্গে ধীরেনের খিটিমিটি বাধে।

তারপর?

ক্রমশই ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠতে থাকে।

তারকদাসবাবুর বয়স কত হবে?

বছর আটচল্লিশ।

আচ্ছা বলুন, তারপর?

তারকদাস ঘোষ রেজিগনেশন দিয়ে চলে গেলেন।

হুঁ। তা তিনি এখন কোথায়?

শুনেছি তিনি এখন কাতরাসগড়ের কাছে অন্য একটা খনির ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েছেন।

আচ্ছা ধীরেন তো বলছিলেন খুব চালাক, চতুর, কর্মঠ এবং কাজ ভাল বুঝে গিয়েছিল, তবে তাকে ইনএফিসিয়েন্ট বলছেন কেন?

কাজকর্ম ঠিক নয়, কারণ মনোযোগ দিয়ে কাজ করলে এখনও সে করতে পারে। কিন্তু—

কিন্তু কি?

দুটি ব্যাধির জন্যই—

ব্যাধি!

আজ্ঞে, স্ত্রীলোক আর মদ— বলে আড়চোখে রসময় দত্ত যেন অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা বকুলের দিকে তাকালেন।

বকুল মাথাটা নীচু করল।

ব্যাপারটা কিন্তু নির্মল চাটুজ্যের নজরে না পড়লেও কিরীটীর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে না।

কিরীটী রসময় দত্তকে আর কোন প্রশ্ন করল না। সে হঠাৎ বকুলের দিকে তাকিয়ে বললে, বকুল দেবী কোলাপসিব্‌ল্ গেটের তালাটা একবার দেখতে পারি?

বকুল কোন কথা না বলে এগিয়ে গিয়ে কোমর থেকে চাবির গোছা নিয়ে গেট থেকে তালাটা খুলে এনে কিরীটীর হাতে দিল।

একটা ভারী মজবুত পুরাতন পিতলের তালা। একসময় ঐ তালার খুব

চাহিদা ছিল। তালাটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ কিরীটীর দৃষ্টি যেন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। সে বললে, তালাটা আমার কাছে থাক।

কিরীটী তালাটা পকেটে রেখে দিল।

চাবিটাও চাই তালার বকুল দেবী!

বকুল রিং থেকে খুলে চাবিটাও কিরীটীর হাতে তুলে দিল। চাবিটাও কিরীটী তার জামার পকেটে রেখে দিল।

অতঃপর চ্যাটার্জীর দিকে তাকিয়ে কিরীটী বললে, আমার কাউকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার নেই। এবার আপনি যা করণীয় করুন।

আপনি চললেন নাকি?

হ্যাঁ।

কিরীটী কারও দিকেই আর তাকাল না। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে চলে গেল।

নির্মল চাটুজ্যে তাঁর বাকি কাজগুলো শেষ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

জবানবন্দি সকলের নিয়ে মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে ও বাড়িতে দুজন পুলিস প্রহরা রেখে, অরবিন্দবাবুর শয়নঘরে তালা দিয়ে চাবিটা সঙ্গে করে বেরুতে বেরুতে ঐ বাড়ি থেকে বেলা চারটে হয়ে গেল।

ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলা।

কিরীটী তার বসবার ঘরে একটা শাল গায়ে জড়িয়ে সোফায় বসে একটা চুরোটে অগ্নিসংযোগ করে টানছিল।

ফিরে এসে ছেঁড়া চিঠির টুকরোগুলো জোড়া দেবার অনেক চেষ্টা করছিল, কিন্তু ঠিক যেন যথাস্থানে প্রত্যেকটি টুকরো জোড়া লাগাতে পারেনি। কিন্তু না পারলেও মোটামুটি যা ও বুঝতে পেরেছে—ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলো একটা চিঠিরই ছিল এবং নিঃসন্দেহে ঐ চিঠিটা যে যাকেই লিখুক না কেন, চিঠিটা গোপনীয়—নচেৎ চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলা হত না।

চিঠির হস্তাক্ষর দেখে কিরীটীর বুঝতে কষ্ট হয়নি, কোন স্ত্রীলোকের লেখা চিঠিখানা। চিঠির খানিকটা অংশ জোড়া দিয়ে যেটুকু সামান্য সে উদ্ধার করতে পেরেছিল সেটা হচ্ছে একটা সেনটেন্স।

"আজ তুমি মস্ত বড় লোক—কিন্তু আমি পথের ভিখারী।"

ওই লেখা থেকে অনুমান করা কষ্ট নয় কোন প্রার্থনাই ছিল কোন নারীর কাছ থেকে ঐ চিঠির মধ্যে এবং যার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছিল সে আর কেউ নয়—স্বয়ং অরবিন্দবাবুই হয়তো।

কোন নারীই তাঁকে লিখেছিল চিঠিটা।

কিন্তু কে সে নারী?

ব্যাচিলার অরবিন্দবাবুর জীবনের সঙ্গে তবে কি কোন নারী জড়িত ছিল? কিরীটী অবিশ্যি কখনও ওর সঙ্গে আলাপে সে-কথা বুঝতে পারেনি।

অরবিন্দবাবুকে দেখেও কখনও ঐ ধরনের কথা মনে হয়নি কিরীটীর। বরং

ভদ্রলোকের সৌম্য শান্ত চেহারা ও কথাবার্তা এবং আচরণের মধ্যে এমন একটা কৃষ্টি ও আভিজাত্যের ভাব ছিল যাতে করে একটা কেমন যেন শ্রদ্ধার অনুভূতিই আসত সব সময় তাঁর প্রতি।

তবে কোন মানুষকেই তো আর পুরোপুরি তার বাইরের ব্যবহার বা আচার-আচরণ দেখে জানা যায় না এবং তা সম্ভবও নয়।

তাঁর মনের নিভৃতে কোন গোপন রহস্য লুকানো ছিল কিনা সযতনে, তা কি কারো সঙ্গে কিছুদিন মেলামেশা করলেই বোঝা যায়! তা তো যায় না।

বাইরে ঐ সময় জুতোর মৃদু শব্দ শোনা গেল।

কে? রসময়বাবু?

দরজার বাইরে থেকে সাড়া এল, আজ্ঞে রায়মশাই—

আসুন ভিতরে—আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

রসময় দত্ত এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

বিকেলে আপনি আমাকে ফোন করেছিলেন আসবার জন্য?

হ্যাঁ। বসুন।

রসময় দত্ত মুখোমুখি একটা সোফায় বসলেন। যত না বয়স হয়েছে, তার চাইতে বেশী বুড়িয়ে গেছেন ভদ্রলোক।

মাথার চুল সবই প্রায় সাদা। বলিরেখাঙ্কিত কপাল। ভাঙা গাল। চোখ দুটি কোটরাগত কিন্তু দৃষ্টি বুদ্ধিদীপ্ত।

কি ব্যাপার রায়মশাই?

তখন আরো কিছু প্রশ্ন করার আমার ইচ্ছা ছিল আপনাকে, কিন্তু ওদের সামনে করতে পারিনি!

রসময় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন কিরীটীর মুখের দিকে।

বেশ কয়েক বছরই যখন আপনি অরবিন্দ চৌধুরীর সঙ্গে ছিলেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁকে ভাল করে চিনবারও অবকাশ পেয়েছেন!

রসময় চুপ করে থাকেন, কোন জবাব দেন না।

আচ্ছা রসময়বাবু, তার মানে আপনার মৃত মনিবের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু জানেন—

উনি প্রয়োজনের বেশী কখনও একটা কথাও বলতেন না। তাছাড়া আমার সঙ্গে ব্যবসা-সংক্রান্ত কথাবার্তা ছাড়া বড় একটা কথাই হত না। তবে কথাবার্তা না হলেও ইদানীং কিছুদিন ধরেই তাঁকে কেমন যেন একটা আনমনা, চিন্তিত মনে হয়েছে।

কেন?

তা ঠিক বলতে পারব না।

ব্যবসা সম্পর্কে কিছু?

না।

ইনকাম-ট্যাক্স?

না।

পারিবারিক কোন ব্যাপার ?

মনে হয় না! তাছাড়া তাঁর পরিবার বলতে তো তিনি নিজে, ভাইপো-ভাইঝি আর একটি ভাগ্নে।

কিন্তু আপনি যে সকালে বলছিলেন ওই ভাগ্নে ধীরেন ইদানীং তেমন কাজ-কর্ম করতে পারছিল না—

হ্যাঁ, বলেছি।

সেজন্যও তো চিন্তা হতে পারে!

ঠিক বলতে পারব না।

কিংবা ধরুন সেই ম্যানেজার তারকদাস ঘোষ! লোকটা কেমন ছিল ?

মনে হয় সে বেশ কয়েক বছরে গুছিয়েই নিয়েছিল। নচেৎ সে হয়ত অত সহজে রেজিগনেশন দিয়ে যেত না।

সেও তো শত্রুতা করতে পারে ?

তা করা অসম্ভব নয়, তবে সেরকম কিছু থাকলে আমি জানতে পারতাম।

লোকটার প্রকৃতি কি রকম ছিল ?

একটু উদ্ধত টাইপের ছিল। তবে বেজায় ধূর্ত ও উচ্চাভিলাষী।

অরবিন্দবাবু তার প্রতি কোন রকম বিদ্বেষ পোষণ করতেন কি ?

তা ঠিক বলতে পারব না।

আচ্ছা রসময়বাবু, আপনি তো অনেকদিন চৌধুরীর সঙ্গে ছিলেন, তাঁর জীবনে কোন ঘটনা ছিল কিনা বলতে পারবেন ?

সে রকম কোন কিছুর আভাস কোনদিন আমি পাইনি রায়মশাই ; তাছাড়া একটু আগেই তো আপনাকে বললাম, কর্তা খুবই চাপা-প্রকৃতির লোক ছিলেন, কাজকর্মের কথা ছাড়া অন্য কোন কথা আমার সঙ্গে কখনও হত না।

আপনার সঙ্গে অরবিন্দবাবুর পরিচয় কি করে হয়েছিল ?

ওঁর দাদা সুধাবিন্দুবাবুর সঙ্গে আমিও বর্মার ইনসিন অয়েল রিফাইনারিতে চাকরি করতাম। একবার অরবিন্দবাবু রেঙ্গুনে দাদার ওখানে যান, সেই সময়ই আলাপ ওঁর সঙ্গে। আমার ওঁকে ভাল লাগে, ওঁরও আমাকে ভাল লাগে। উনি আমাকে তখন বলেছিলেন এখানে এসে তাঁর কারবারে যোগ দিতে। কিন্তু আসিনি, পরে সুধাবিন্দুবাবুর মৃত্যুর পর যখন মলয় আর বকুল এদেশে চলে আসে, আমিও চলে আসি। সঙ্গে সঙ্গে উনি আমাকে ওঁর কারবারে কাজ দেন। তখন ওঁর ব্যবসাও ভাল চলছিল। সেই থেকেই আছি।

আপনার সংসারে কে আছেন ?

আমি মশাই ব্যাচিলার মানুষ।

আচ্ছা অরবিন্দুবাবুর মুখে কখনও মলু নামটা শুনেছেন ?

না তো! কে সে ?

একটি স্ত্রীলোক।

স্ত্রীলোক ?

হ্যাঁ, আমার ধারণা সেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল।

কি করে জানলেন ?

জেনেছি যেমন করেই হোক।

রসময় কোন তার জবাব দিলেন না। কেমন যেন চুপচাপ হয়ে বসে রইলেন।

রসময়বাবু !

আজ্ঞে ?

আপনি নিশ্চয়ই চান তাঁর হত্যাকারী ধরা পড়ুক !

সর্বান্তঃকরণে চাই। আমার দ্বারা কোন সাহায্য হলে আমি সর্বদাই তার জন্য প্রস্তুত আছি জানবেন।

অতঃপর রসময় দত্ত বিদায় নিলেন।

পরের দিন সকালে।

কিরীটী তার বসবার ঘরে বসেছিল, একজন সুপরিচিত সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় ঘরে এসে ঢুকলেন।

আসুন, ডঃ সেন। পরীক্ষা করেছিলেন তালাটা আর চাবিটা ?

হ্যাঁ। ডঃ সেন বললেন।

কিছু পেলেন ?

একটা আশ্চর্য ব্যাপার আবিষ্কার করেছি!

কি বলুন তো ? ঐ তালাটার চাবির ফোকরে সাবানের মত কিছু লেগেছিল কি ?

আশ্চর্য ! আপনি জানলেন কি করে ?

সেইরকম সন্দেহ হয়েছিল বলেই আপনার কাছে আমি তালাটা পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারছি, তালাটা সেরাত্রে হত্যাকারী কি করে খুলেছিল !

কি করে ? সাবানের সাহায্যে ?

মৃদু হেসে কিরীটী বলল, না।

তবে ?

একটা ডুপলিকেট চাবির সাহায্যে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, আটঘাট বেঁধেই হত্যাকারী কাজে নেমেছিল। সাবান দিয়ে ঐ চাবিটার একটা ইমপ্রেশন নিয়ে তারই সাহায্যে একটা ডুপলিকেট চাবি করে, যার সাহায্যে সে দুর্ঘটনার রাত্রে কোলাপসিব্‌ল্‌ গেটের তালাটা খুলে দোতলায় প্রবেশ করে।

তারপর ?

তারপর তো ব্যাপারটা জানেনই।

কিন্তু চাবিটা কার কাছে থাকত ?

বকুল দেবীর কাছে।

তাহলে তো—

আপনার অনুমান ঠিকই ডঃ সেন, এমন একটা লোক ডুপলিকেট চাবি করেছিল যার পক্ষে সাবানের সাহায্যে আসল চাবির একটা ইমপ্রেশন নেওয়া আদৌ কষ্ট-সাধ্য ছিল না এবং তার ঐ বাড়িতে যাতায়াত তো ছিলই, এমন কি সে ওদের সকলের পরিচিতও—যার জন্য তার প্রতি কারো সন্দেহ হবার কথা নয়। ঠিক আছে। ধন্যবাদ, ডঃ সেন। দুটি সূত্র যা আমার হাতে এসেছে, তার একটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

আরো কিছুক্ষণ পরে ডঃ সেন বিদায় নেবার পর হঠাৎ কিরীটী উঠে দাঁড়াল।

কৃষ্ণা ওই সময় এক কাপ কফি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। কিরীটীকে শালটা গায়ে জড়াতে দেখে প্রশ্ন করল, বেরুচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ, একটু বেরুব। কথাটা বলে কিরীটী কৃষ্ণার হাত থেকে কফির কাপটা নিল।

কোথায় যাচ্ছ? ফিরতে দেরি হবে নাকি?

না। অরবিন্দ চৌধুরীর বাড়ি যাচ্ছি—ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসব।

কৃষ্ণা আর কোন কথা বলল না।

অরবিন্দর গৃহে বাইরের ঘরেই রসময় দত্তর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কিরীটীর।

আসুন রায়মশাই।

ময়লবাবু, বকুল দেবী—সবাই আছেন? কিরীটী শুধায়।

হ্যাঁ, তারা উপরেই আছে, ধীরেনবাবুও এসেছেন—রসময় বললেন।

তাই নাকি? কখন?

কাল রাত্রে।

তিনি বাড়িতে আছেন?

হ্যাঁ, যান না—সকলকে বোধ হয় উপরে কর্তার ঘরেই পাবেন। সলিসিটার মিত্রও এসেছেন।

সলিসিটার!

হ্যাঁ, মলয়বাবু গতকাল তাঁকে ফোন করেছিলেন আসবার জন্য।

কেন?

কোন উইল করে গিয়েছেন কিনা জানবার জন্য।

উইল আছে নাকি তাঁর?

হ্যাঁ, সেই উইলের ব্যাপারেই তো সলিসিটার মিত্র এসেছেন কিছুক্ষণ আগে।

চলুন না উপরে যাওয়া যাক।

না, আপনি উপরে যান—আমি যাব না।

কিরীটী আর রসময় দত্তকে অনুরোধ করল না, উপরের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

সিঁড়ির মাথাতেই ভৃত্য গোকুলের সঙ্গে কিরীটীর চোখাচোখি হয়ে গেল।

গোকুল একটা ট্রেতে কয়েকটি ধূমায়িত চায়ের কাপ নিয়ে অরবিন্দের শয়ন-

ঘরের দিকে এগুচ্ছিল।

গোকুল! কিরীটী ডাকল।

সবাই ওই ঘরে আছেন—আসুন। গোকুল বললে।

কিরীটী গোকুলকে অনুসরণ করল। ঘরে গোকুলের পিছনে পিছনে ঢুকতেই ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেরই নজর পড়ল কিরীটীর উপরে।

পাশাপাশি দুটো সোফার একটায় মলয় ও বকুল—ভাই-বোন বসে। অন্য একটা সোফায় দুজন অপরিচিত ব্যক্তি।

তার মধ্যে একজন মোটাসোটা প্রৌঢ়, মাথার সম্মুখভাগে অর্ধেকটার বেশী চকচকে টাক। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। পরনে সুট। বেশ দামী গরম সুট, কোলে একটি চামড়ার ফোলিও ব্যাগ।

তার পার্শ্বে উপবিষ্ট যে সে বয়সে তরুণ। মনে হয় চব্বিশ-পঁচিশের বেশী বয়স হবে না।

ফর্সা রং—বেশ স্বাস্থ্যবান। পরনে দামী সুট।

কিরীটী যেন কয়েকটা মুহূর্ত যুবকের মুখের দিকে চেয়ে থাকে, তারপরই মলয়ের কুঞ্চিত ভুরু তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মলয়ের মুখে যেন একটা স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ।

মিঃ রায়, আমরা একটু এখন বৈষয়িক ব্যাপারে ব্যস্ত আছি—আপনি অন্য সময় আসবেন, যদি আপনার কিছু কথা থাকে!

কিরীটী মলয়ের কথার কোন জবাবই দিল না, সলিসিটার মিত্রর দিকে তাকিয়ে বললে, আপনিই বোধ হয় মিঃ মিত্র—মৃত অরবিন্দ চৌধুরীর সলিসিটার?

মিঃ মিত্র জবাব দিলেন, আপনি—

জবাব দিল মলয়, উনি কিরীটী রায়।

সলিসিটার মিঃ মিত্রের মুখখানা সহসা যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, আপনিই কিরীটী রায়! আসুন আসুন, আপনার নামই শুনেছি, কিন্তু চাক্ষুষ পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি। বসুন না—

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, না—বসব না। আপনাদের মধ্যে বোধ হয় অরবিন্দবাবুর উইল-সংক্রান্ত—মানে বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল!

হ্যাঁ, মলয়বাবু কাল আমাকে ফোন করেছিলেন উইলের ব্যাপারে, তাই এসেছি।

কিন্তু প্রবেশন না নেওয়া পর্যন্ত তো উইল কার্যকরী করা যাবে না। কিরীটী মৃদু হেসে বললে।

তা অবিশ্যি যাবে না—উইলও দেখাব না, কেবল উইল সম্পর্কে মোটামুটি ওঁদের জানিয়ে যাব।

ওই সময় সুশ্রী যুবকটি কথা বললে, আচ্ছা মিঃ মিত্র, আমি তাহলে এবারে যাই—তাছাড়া আমার উইলের ব্যাপার জেনেই বা কি হবে!

মিঃ মিত্র বললেন, কেন? জানবেন না কেন? আপনিও বসুন ধীরেনবাবু, আপনারও জানা দরকার—

না মিঃ মিত্র, ধীরেন জবাব দিল, আমার জানবার কিছু নেই ; আমি তাঁর বোনের ছেলে— ভাগ্নে, আমাকে তিনি জীবনে স্থিতি করে দিয়ে গিয়েছেন তাতেই কৃতজ্ঞ আমি। আমাকে যে উইলে কিছু দেননি তা আমি জানি।

কি করে জানলেন ? মিঃ মিত্র প্রশ্ন করলেন।

কেন জানব না, এ তো সোজা কথা। নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রীকে ছেড়ে আমাকে সম্পত্তি দিতে যাবেন তিনি কোন্ দুঃখে।

সে জানি না—তবে আপনি ভালভাবেই লাভবান হয়েছেন উইল অনুযায়ী।

সে কি। মশাই, আপনি যে আমাকে রীতিমত তাজ্জব বানিয়ে দিচ্ছেন।

খুব তাজ্জব লাগছে বুঝি ?

তা একটু লাগছে বইকি। অসম্ভব কিছু ঘটলে তাজ্জবই তো বনতে হয়।

কিরীটী চকিতে একবার সকলের মুখের দিকে তার দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিল। মলয়ের চোখেমুখে যেন রীতিমত একটা বিস্ময়।

তাহলে জেনে রাখুন ধীরেনবাবু, আপনি উইলের মধ্যে যা লেখা আছে তা জানতে পারলে হয়ত রীতিমত তাজ্জবই হবেন !

তাই নাকি ?

ধীরেনের কণ্ঠস্বরে কৌতূহল নয়, যেন খানিকটা বিদ্রূপই প্রকাশ পেল।

মলয় ঐ সময় বিশেষ যেন আগ্রহের সঙ্গেই প্রশ্ন করল, কি লেখা আছে উইলে মিঃ মিত্র ?

মিঃ মিত্র বললেন, প্রবেশন নেওয়ার পর আপনারা উইলের ডিটেলস্ জানতে পারবেন। কারণ আমার উপরে মিঃ চৌধুরীর নির্দেশ আছে, প্রবেশন না নেওয়া পর্যন্ত উইলের সব কথা আপনাদের না জানাতে। এবং তাই বলছি তাঁর সম্পত্তির ওয়ারিশন হিসাবে আপনাদের তিনজনকেই অর্থাৎ আপনি, আপনার বোন বকুল দেবী ও ধীরেনবাবু—জয়েণ্ট পিটিশন করে হাইকোর্ট থেকে প্রবেশন নেবেন, কারণ আপনারা সকলেই তাঁর সম্পত্তি ও টাকাকড়ির ওয়ারিশান।

মলয় অধৈর্যকণ্ঠে বললে, তিনজনই আমরা ওয়ারিশান ?

হ্যাঁ—তিনজনই—

সমান ভাবে ?

না।

তবে ? মলয় প্রশ্ন করল।

মোটামুটি এই মুহূর্তে এইটুকু বলতে পারি, অরবিন্দবাবু অর্থাৎ আমার মক্কেলের ব্যাংক-ব্যালেন্স, তিনটে মাইন, এখানকার বাড়ি—পাটনার বাড়ি ও কাশীর বাড়ি—সব অ্যাসেট ধরলে প্রায় কোটি টাকার কাছাকাছি হবে।

ধীরেন বলে, বলেন কি ! এ যে একটা রীতিমত ফরচুন !

তা বলতে পারেন ধীরেনবাবু।

মলয় আবার অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে, কিন্তু ভাগাভাগিটা কেমন হয়েছে ? সমান তিন ভাগ ?

না। আগেই তো বললাম তা নয়—কলকাতার বাড়ি ও ব্যাঙ্কের চল্লিশ হাজার নগদ টাকা পাবেন বকুল দেবী।

সকলেই যুগপৎ বকুলের মুখের দিকে তাকাল। তার চোখ দুটি যেন ছলছল করে ওঠে।

তারপর? মলয়ই আবার প্রশ্ন করল।

কাশীর বাড়ি ও দুটো খনির মালিক হবেন ও ব্যাঙ্কের নগদ বিশ হাজার টাকা পাবেন ধীরেনবাবু।

ধীরেন বলল, বলেন কি? সত্যি বলছেন স্যার?

হ্যাঁ, তবে তার মধ্যে একটা শর্ত আছে।

শর্ত!

হ্যাঁ।

কি শর্ত?

আপনি তাঁর মনোনীত পাত্রীটিকে বিবাহ করার পরই সব পাবেন।

পাত্রী! তাঁর মনোনীত পাত্রী?

হ্যাঁ।

সেটি আবার কে? ভারী অদ্ভুত—কিছুই আমি জানলাম না, অথচ—

আপনার নামে একটা চিঠি আছে—সেই চিঠি পড়লেই সব কিছু জানতে পারবেন। এসব ছাড়াও উইলে আরও অনেক কথা আছে যা উইলের প্রবেশন পাবার পর আমি জানাব।

হুঁ, তা তো বুঝলাম—তা পাত্রীটি কে, কোথায় থাকেন ভদ্রমহিলা?

কাশীতে।

কাশীতে!

হ্যাঁ, সেখানে হরিসাধন চট্টোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক আছেন—তাঁরই একমাত্র মেয়ে বিমলা! বেঁচে থাকলে তিনিই বিয়ে দিয়ে যেতেন। কিন্তু—

কিরীটী নিঃশব্দে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ওঁদের কথোপকথন শুনছিল, সে এবারে প্রশ্ন করল, কিন্তু কি মিঃ মিত্র—

উইলটা মিঃ চৌধুরী মাত্র মাস দুই আগে করেছিলেন মিঃ রায়!

তাই নাকি?

হ্যাঁ, কারণ তাঁর কেমন যেন ধারণা হয়েছিল—

কি ধারণা হয়েছিল? কিরীটী জিজ্ঞাসা করল।

তাঁর হঠাৎ কোন বড় রকমের বিপদ-আপদ হতে পারে।

বিপদ-আপদ—মানে জীবন-সংশয়?

ঠিক তাই।

তার কোন কারণ দর্শিয়েছিলেন কি?

না, তবে বলতেন প্রায়ই আমাকে—হয়ত শেষ পর্যন্ত বেঘোরে প্রাণ দিতে হতে পারে।

আর কিছু বলেননি ?

না।

মলয় ওই সময় প্রশ্ন করল, আর আমার ভাগ্যে কি পড়েছে ?

ব্যাঙ্কের পঞ্চাশ হাজার টাকা।

আর ?

আর কিছুই নয়।

বলেন কি ? ব্যাঙ্কে কি মাত্র ওই এক লাখ দশ হাজার টাকাই ছিল ?

না। সম্ভবতঃ বেশীই আছে—সে-সব একটা ট্রাস্টির হাতে যাবে—তারা পাটনার বাড়িটা আশ্রমে পরিণত করে সমাজে যারা নির্যাতিত, অত্যাচারিত—সেই রকম মেয়েদের আশ্রয় দেবে।

মলয় হঠাৎ বলে ওঠে, দিজ ইজ অ্যাবসার্ড' ! এ হতেই পারে না।

উইলে তাই লেখা আছে মোটামুটি—

আমি মামলা করব।

দাদা ! বলে ওঠে বকুল।

তুই থাম ! আমরা আপন ভাইপো-ভাইঝি কিছুই পাব না, আর কোথাকার কে এক ভাগ্নে সে পাবে লায়ন'স শেয়ার !

কিন্তু কাকামণি যা করে গেছেন—

ভীমরতি হয়েছিল তাঁর।

আমি কিছু চাই না দাদা—তুমি সব নিও—

গ্র্যাটিস ! ওর মধ্যে শর্মা নেই।

ধীরেন শান্ত গলায় ঐ সময় বললে, আমিও কিছু চাই না, মলয়দা।

কেন হে, তুমি তো বাদশা বনে গিয়েছ !

না, ও বাদশাহী আমি চাই না, কথাগুলো বলে ধীরেন সোফা থেকে উঠে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

ঘরের মধ্যে সহসা যেন একটা স্তব্ধতা নেমে এল।

এমন কি মলয়ও যেন নির্বাক।

মিঃ মিত্র উঠে দাঁড়ালেন, তাহলে আমি চললাম, আপনারা প্রবেশন নেবার জন্য উইলের ব্যাপারে যা করণীয়—আমি আপনাদের বলে দেব আমার অফিসে এলে।

মিঃ মিত্র ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

মলয়ও বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

একা কেবল বকুল সোফায় বসে রইল। তার দু'চোখের কোণ বেয়ে তখনো অবিরল অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

বকুল দেবী !

বকুল কিরীটীর ডাকে মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল।

একটা কথার জবাব দেবেন ?

কি ?

অরবিন্দবাবু আপনাদের সত্যিই খুব ভালবাসতেন, তাই না ?

সে ভালবাসার তুলনা হয় না কিরীটীবাবু।

তবে ?

কি তবে ?

আপনার দাদার কথাবার্তা শুনে তো মনে হল—উনি আপনার কাকামণির উপরে খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না।

না, না, সেরকম কিছু নয়—দাদা কাকামণিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত।

শ্রদ্ধা আর ভালবাসা দুটো তো এক বস্তু নয় বকুল দেবী! নচেৎ উইলের ব্যাপারটা জানবার পর আপনার দাদা অতটা হতাশ হবেনই বা কেন ? যাক আর নয়, আজ আমি একটু ব্যস্ত আছি, কাল একবার সন্ধ্যাবেলা আমার বাড়িতে আসবেন।

আপনার বাড়ি!

হ্যাঁ, অরবিন্দবাবুকে যে কে হত্যা করেছে—

কে—কে হত্যা করেছে ?

সেই ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করব আপনার সঙ্গে। তখন আপনি নিজেই হয়তো অনুমান করতে পারবেন কার ঐ কাজ।

কে ? কে ? আপনি জানতে পেরেছেন ? উৎকণ্ঠায় যেন বকুলের কণ্ঠস্বর বুঁজে এল।

পেরেছি।

পেরেছেন ? কে ?

এখন আর বেশী কিছু বলবার আমার নেই। কাল সন্ধ্যাবেলা আসুন—আচ্ছা চলি। কিরীটী আর দাঁড়াল না—ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী নীচে অফিসঘরে গিয়ে ঢুকল।

অফিসের কাজকর্ম সব বন্ধ! কোন কর্মচারীই আসেনি। একা রসময় দত্ত ঘরের মধ্যে চুপটি করে বসেছিলেন।

রসময়বাবু!

য়্যাঁ! চমকে তাকালেন রসময় দত্ত কিরীটীর মুখের দিকে।

উইলের ব্যাপারটা শুনলেন ?

হ্যাঁ।

কার কাছ থেকে শুনলেন ?

ধীরেন এসে আমাকে সব কথা বলে চলে গেল।

চলে গেল ? কোথায় ?

কোলিয়ারিতে।

চলে গেল হঠাৎ ?

কি জানি! বলছিল সম্পত্তি সে চায় না।

আপনার কি মনে হয় রসময়বাবু ?

কিসের কি মনে হয় ?

কেন সম্পত্তি চান না ধীরেনবাবু !

রসময় চুপ করে রইলেন।

কিরীটী রসময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, রসময়বাবু, আমি বুঝতে পারছি কোন কথা আপনি চেপে যাচ্ছেন বা বলতে ইতস্ততঃ করছেন—

ঠিক তা নয় কিরীটীবাবু, যে কথাটা আমি অনেক সময়ই ভেবেছি—কিন্তু ভেবে কোন মাথামুণ্ডু বুঝতে পারিনি—

কিরীটী কোন প্রশ্ন করল না বটে, তবে চেয়ে রইল নিঃশব্দে রসময়ের মুখের দিকে। রসময়বাবু বলতে লাগলেন, জানি না কেন, হয়তো আমার বোঝবার ভুলও হতে পারে—ধীরেন কোনদিনই যেন তার মামাকে ভাল চোখে দেখত না।

ভাল চোখে দেখত না !

না। কেমন যেন একটা চাপা বিদ্বেষ বরাবরই লক্ষ্য করেছি ধীরেনের তার মামার প্রতি। অথচ আমি জানি—বুঝতেও পারতাম সত্যিকারের স্নেহই করতেন অরবিন্দবাবু তাঁর ঐ ভাগ্নেটিকে।

অরবিন্দবাবু বুঝতে পেরেছিলেন ব্যাপারটা আপনার মনে হয় ?

বুঝতেন বৈকি। অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন তিনি।

ঐ সম্পর্কে কখনও কোন কথা প্রকাশ করেছেন ?

না।

দুজনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ কখনও হয়েছে ?

না। তবে ধীরেনের ঐ ধরনের ব্যবহারে যে তিনি মর্মাহত ব্যথিত সেটা আমি বুঝতে পারতাম।

কোন কারণ ছিল বলে আপনার মনে হয় ?

কি কারণ থাকতে পারে বলুন ! ধীরেন উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির, অত্যধিক মদ্যপান করত—খনির কাজকর্মও ভালভাবে দেখাশোনা করত না। সব জানতেন অরবিন্দবাবু, তবু কখনও ধীরেনকে কিছু বলতে শুনিনি। অথচ মলয়বাবুর কাজে বা ব্যবহারে এতটুকু গাফিলতি দেখলে তাকে রীতিমত বকাঝকা করতেন। এই তো দুর্ঘটনার দিন দুই আগেও এক রাত্রে কাকা-ভাইপোর মধ্যে বেশ রাগারাগি হয়ে গিয়েছিল।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

কি ব্যাপারে ?

মলয়বাবু কর্মঠ এবং কাজকর্ম ভাল বোঝেন ঠিকই, কিন্তু বড্ড খেয়ালী এবং একগুঁয়ে—তাই নিয়েই কাকা-ভাইপোর মধ্যে প্রায়ই রাগারাগি হত।

শেষদিকে কি হয়েছিল, মানে দুর্ঘটনার দিন দুই আগে ?

একটা ট্র্যানজাকশনের ব্যাপারে মলয়বাবুর গাফিলতির জন্যই প্রায় লাখখানেক

টাকার অর্ডার নষ্ট হয়ে যায়। সেই ব্যাপারেই—আরো একটা কথা বোধ হয় আপনাকে আমার বলা দরকার, মলয়বাবুরও যেন একটা চাপা আক্রোশ ছিল তাঁর কাকার ওপরে—ঠিক আক্রোশ নয়—যেন একটা ঘৃণাও।

আচ্ছা বকুল দেবী, তিনিও কি—

না, ওই একটিমাত্র প্রাণী এ বাড়িতে, মনে হয় যে অরবিন্দবাবুর সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষিনী ছিল।

আচ্ছা রসময়বাবু ?

বলুন।

অরবিন্দবাবুর উইলের ব্যাপারটা আপনি জানতেন ?

জানি। আমি তো উইলের অন্যতম ও প্রধান সাক্ষী।

বলতে পারেন, উইলটাতে অমনভাবে কেন তিনি তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা করেছিলেন ?

না।

আপনি জিজ্ঞাসাও করেননি ?

না।

কোন কৌতূহলও হয়নি ?

না।

আচ্ছা রসময়বাবু, মল্লিকা দেবী তো পাটনায় ছিলেন ? তাঁর স্বামীর নাম কি ? এবং কতদিন আগে মারা গিয়েছেন তিনি ?

হ্যাঁ, পাটনায় ছিলেন। ভদ্রলোকের নাম ছিল জীবন চট্টোপাধ্যায়, মারা গেছেন বছর তিনেক।

তারপর পাটনার কোথায় থাকতেন জিজ্ঞাসা করায় রসময়বাবু বললেন, কদমকুঁয়াতে।

কিরীটী তার গৃহে ফিরে এল অতঃপর।

উইলের ব্যাপারটাই তার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকে। অমনভাবে ভাগবাঁটোয়ারা কেন করে গিয়েছেন অরবিন্দবাবু তাঁর সমস্ত সম্পত্তির ? যেন একটা বিশেষ পক্ষপাতিত্ব নজরে পড়ে—ধীরেনের প্রতি বিশেষ করে। এবং ঠিক বিপরীত নজরে পড়ে মলয়ের ব্যাপারে।

কেন এই বৈষম্য ?

সোফাটার উপরে গা এলিয়ে দিয়ে পাইপটা মুখে দিয়ে কিরীটী চোখ বুজে ছিল। কেন যেন তার মনে হচ্ছিল ঐ উইলের মধ্যেই কোথায় হত্যার মোটিভটা সুপ্ত হয়ে আছে।

ভাগ্নেকেই বেশী দিলেন—

কিন্তু কেন ? ভাইপোর থেকে কি ভাগ্নে বেশী আপন ছিল তাঁর ?

তাছাড়া রসময়ের কথাগুলোও যেন মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকে।

ধীরেন যেন কোনদিনই তার আপন মামা অরবিন্দবাবুকে ভাল চোখে দেখত না, কেমন যেন একটা চাপা বিদ্বেষের ভাব বরাবরই লক্ষ্য করা গিয়েছে।

কেন? তার কারণ কি? বরং তাদের—তাকে ও তার মাকে অরবিন্দবাবু কেবল আশ্রয়ই দেননি, রীতিমত ভাল ব্যবস্থাও ভবিষ্যতের জন্য করে গিয়েছেন—যাতে করে ধীরেনের তার মামার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত।

কৃতজ্ঞ তো নয়ই, বরং বলে গিয়েছে সে ঐ সম্পত্তি চায় না।

ধীরেন উচ্ছৃঙ্খল, মদ্যপ—কাজকর্মেও মন নেই!

সেটা হয়ত ধীরেনের প্রকৃতিই হতে পারে, কিন্তু তার অমন মামার প্রতি বিদ্বেষের কি এমন কারণ থাকতে পারে? তারপর ওই মলয়—তারই বা তার কাকার প্রতি বিদ্বেষের কারণ কি?

সারাটা দিনই কিরীটী বসে বসে কথাগুলো ভাবল।

কোথায় যেন একটা জট পাকিয়ে আছে। অন্ধকারের কোথায় যেন একটা আবর্ত। আর যত কথাটা মনে হয় ততই যেন কিরীটীর মন বলতে থাকে, হত্যার মোটিভ ওই জটের মধ্যে বা আবর্তের মধ্যেই লুক্কায়িত আছে।

হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা কিরীটী উঠে দাঁড়াল।

কৃষ্ণা ইতিমধ্যে বার-দুই এসে স্বামীকে চিন্তাগ্রস্ত দেখে তাকে বিরক্ত না করে ফিরে গিয়েছিল। সে বুঝতে পেরেছিল কোন একটি বিশেষ সমস্যাই কিরীটীর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

তৃতীয়বার ওই সময় এক কাপ কফি নিয়ে এসে কৃষ্ণা ঘরে ঢুকল।

কৃষ্ণা, আজই দিল্লী এক্সপ্রেসে আমি পাটনা যাব। কিরীটী বলল।

পাটনা—হঠাৎ?

শিউশরণ সেখানে এখন এস. পি.—

তা তো বুঝলাম, কিন্তু হঠাৎ শিউশরণের কাছে কি এমন দরকার পড়ল? কৃষ্ণা তাকাল।

কিরীটী হাসতে হাসতে বলল, জান না কবি বলে গিয়েছেন, যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই—মিলিলে মিলিতে পারে অরূপ রতন! যাক শোন, স্নান করতে যাচ্ছি, তুমি হাওড়া এনকোয়ারীতে একটা ফোন করে জেনে নাও তো দিল্লী এক্সপ্রেস কখন ছাড়বে, কোন্ প্ল্যাটফরম থেকে!

কথাগুলো বলে কিরীটী আর দাঁড়াল না।

ঘর থেকে বের হয়ে গেল। কৃষ্ণা এগিয়ে গিয়ে ফোন করল হাওড়া এনকোয়ারীতে। রাত নটা চল্লিশে দিল্লী এক্সপ্রেস ছাড়বে। জংলীকে বললে নীচে গিয়ে হীরা সিংকে খবর দিতে, গাড়ি বের করবার জন্য।

কিরীটী যখন স্নান সেরে জামা-কাপড় পরে খাওয়ার টেবিলে এল, কৃষ্ণা তখন খাবার নিয়ে প্রস্তুত।

চল না—যাবে পাটনা? কিরীটী যেতে যেতে বললে।

পাটনায় গিয়ে কি হবে! আমাকে তো শেলি সেনের হোটেলে রেখে তুমি

শিউশরণের সঙ্গে কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়াবে!

আরে না না, কখনই না। তাছাড়া শিউশরণকে তুমি তো চেনো না—আলাপ করে খুশিই হবে।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। তার স্ত্রী যে বাঙালী।

তাই নাকি?

যাও, চট্‌পট রেডি হয়ে নাও।

কিন্তু জ্যাকী যে একা থাকবে!

কেন শ্রীমান জংলী তো আছে।

বেশ, তুমি তাহলে খেয়ে নাও, আমি প্রস্তুত হয়ে আসি।

এক কাজ কর—জংলীকে বল টিফিন-ক্যারিয়ারে খাবারটা ভরে দিতে, ট্রেনেই খাওয়া যাবে।

অগত্যা সেই ব্যবস্থাই হল।

স্টেশনে পৌঁছে রিজারভেশন ক্লার্ককে খুঁজে বের করল কিরীটী এবং ভাগ্যক্রমে একটা ফার্স্ট ক্লাস কুপেও পাওয়া গেল।

ট্রেন ছাড়ার পর কৃষ্ণা কিরীটীকে গ্লাসে হুইস্কি ও সোডা দিল।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, এনেছ?

নাহলে তো ঘুম হত না!

কিরীটী মৃদু হাসল।

পরের দিন সকাল আটটা নাগাদ পাটনায় গাড়ি পৌঁছাল। একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে গিয়ে প্রথমেই শিউশরণকে ফোন করল কিরীটী।

সে তো কিরীটীর গলা শুনে অবাক, কিরীটীবাবু আপনি – পাটনায়!

একটা ব্যাপারের কিছু ইনফরমেশন চাই। কখন তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে?

আপনি কোথা থেকে বলছেন?

হোটেল থেকে। সঙ্গে কৃষ্ণা আছে।

না, ওসব চলবে না—হোটেলে আপনাদের থাকা হবে না। ভাবীকে বলুন রেডি হতে, আমি আসছি।

শিউশরণ ফোনটা ছেড়ে দিল।

এবং আধঘণ্টার মধ্যেই শিউশরণ তার গাড়ি নিয়ে এসে গেল হোটেলে। ওদের তার কোয়ার্টারে নিয়ে এল। শিউশরণের স্ত্রী এসে কৃষ্ণাকে ভিতরে নিয়ে গেল।

চা পানের পর শিউশরণ বললে, বলিয়ে কেয়া বাত হ্যায় রায় সাব্!

এখানে কদমকুঁয়াতে বছর তিন-চার আগে জীবন চাটুজ্যে নামে এক ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র ছেলে থাকতেন। ছেলেটির বয়স তখন একুশ-বাইশ হবে। দেখতে ভারী সুশ্রী, চমৎকার চেহারা ছিল ছেলেটির। বোধ হয় এখানকার কলেজে তখন পড়ত-টড়ত।

কদমকুঁয়া তো ছোট জায়গা নয় রায় সাব্ ! তা ভদ্রলোক কি করতেন ?

কি করতেন ঠিক জানি না।

ছেলের নাম কি ছিল ?

ধীরেন চ্যাটার্জী।

ঠাড়িয়েঠাড়িয়ে—হঠাৎ শিউশরণ বলে ওঠে, পাটনা কলেজে পড়ত কিনা জানি না, তবে ওই নামে খুব সুন্দর একটি যুবক এখানের নামকরা ফুটবল ও ক্রিকেট প্লেয়ার ছিল। যদিও দুটো খেলাতেই সে ছিল সমান দক্ষ—হ্যাঁ, তার বোধ হয় একটা ফটোও আমার বসবার ঘরে আছে।

ফটো !

একবার শীল্ড খেলায় প্রাইজ দিয়েছিলাম আমি। সে সময়ে প্লেয়ারদের সঙ্গে আমার একটা ফটো তোলা হয়—পাশের ঘরে আসুন, প্রত্যেক প্লেয়ারের নামও এখানে লেখা আছে।

দুজনে ড্রয়িংরুমে গিয়ে ঢুকল। একটা ফটো দেখিয়ে বললে শিউশরণ, ওই ফটোটা দেখুন !

কিরীটী ফটোর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে চোখ বোলাতেই তার চোখের মণি দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ধীরেন আছে ফটোটার মধ্যে।

বছর তিনেক আগেকার তোলা ফটো হলেও চিনতে কষ্ট হয় না ধীরেনকে।

কিরীটী শিউশরণের দিকে তাকিয়ে বললে, ঐ ছেলেটি সম্পর্কে বিশেষ করে তার বাপ জীবন চাটুজ্যে সম্পর্কে একটু খোঁজখবর করতে পার ?

বোধ হয় অসুবিধা হবে না। কারণ ধীরেন ছিল এখানকার একসময় নামকরা ফুটবল ও ক্রিকেট প্লেয়ার। তাছাড়া কদমকুঁয়াতেই আমাদের পাবলিক প্রসিকিউটার বিনয়ানন্দন পাণ্ডে থাকে। আমি আজই খোঁজ নেবার চেষ্টা করছি।

ওইদিনই রাত্রে বিনয়ানন্দন পাণ্ডেকে নিজের গৃহে ডেকে এনে শিউশরণ কিরীটীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। আগেই সে পাণ্ডের মুখে শুনেছিল জীবন চাটুজ্যেকে তিনি চিনতেন। জীবন চাটুজ্যে একজন উকিল ছিলেন, পাটনা হাই-কোর্টে প্র্যাকটিস করতেন।

বিনয়ানন্দন পাণ্ডের কাছ থেকে কিরীটী যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করল তা হচ্ছে ঃ

জীবন চাটুজ্যে লোকটা অত্যন্ত শান্ত ও নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। অবস্থা বিশেষ ভাল না, কারণ প্র্যাকটিস করে বিশেষ কিছু পেতেন না। তাছাড়া কেমন রুগ্ন ছিলেন বলে নিয়মিত কোর্টেও যেতে পারতেন না। আর তাঁর ছেলে—ধীরেনও চমৎকার ছেলে ছিল। লেখাপড়াতেও শোনা গেল খারাপ ছেলে ছিল না। তবে খেলাধুলা নিয়েই বেশী থাকত।

বছর তিনেক আগে হঠাৎ জীবন চাটুজ্যে মারা যান।

ধীরেন তখন লেখাপড়া ছেড়ে কাজকর্মের যাহোক একটা চেষ্টা করতে থাকে।

খেলার জন্যই বোধ হয় কলেজে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট লাইব্রেরীয়ানের কাজ পেয়েছিল। তারপর বছর তিন আগে স্বামীর মৃত্যুর পর তারা মা ও ছেলে চলে যায়।

কোথায় গিয়েছিল জানেন? কিরীটী জানতে চাইল।

জীবনবাবুর শালা বিরাট ধনী লোক, বলতে পারেন একজন শিল্পপতি, তিনিই এসে তাঁর বোন ও ভাগ্নেকে নিয়ে যান।

কিরীটীর যা জানবার প্রয়োজন ছিল জানা হয়ে গেল। পরের দিনই কিরীটী কলকাতা অভিমুখে রওনা হল।

কলকাতায় ফিরে জানতে পারল মলয় চৌধুরীকে নাকি নির্মল চাটুজ্যে অ্যারেস্ট করেছেন। নির্মল চাটুজ্যেও ফোনে সংবাদটা কিরীটীকে দিল।

কিরীটী ভাল-মন্দ কিছুই বললে না।

সেইদিনই সন্ধ্যায় কিরীটী নিজের ঘরে বসেছিল, সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল। তার মনে হল কোন স্ত্রীলোকের পায়ের শব্দ।

কিরীটী দরজার দিকে তাকাল।

বকুল এসে ঘরে ঢুকল।

বকুল দেবী, কি খবর! বসুন।

বকুলের চুল উস্কোখুস্কো, চোখ দুটি ফোলা-ফোলা। সাধারণ একটি শাড়ি পরিধানে, গায়ে একটা কমলালেবু রংয়ের শাল জড়ানো।

কিরীটীবাবু, দাদাকে ওরা অ্যারেস্ট করে নিয়ে গিয়েছে কাল সন্ধ্যায়।

শুনেছি।

শুনেছেন? কার কাছে শুনলেন?

থানার ও. সি.ই ফোন করেছিলেন আমাকে দশটার সময়।

কিন্তু আমি বলছি, আপনি বিশ্বাস করুন কিরীটীবাবু, দাদা কখনো কাকামণিকে খুন করতে পারে না।

কিন্তু এটা তো ঠিক বকুল দেবী, মলয়বাবু তার কাকাকে ঠিক ভাল চোখে দেখতেন না?

না, না—

হ্যাঁ, আমি জানি। কিন্তু কেন বলুন তো? কোন কারণ ছিল কি তার? আমার কাছে কোন কথা গোপন করবেন না। আমার সাহায্য যদি চান তো অকপটে সব আমাকে বলুন।

বকুল মাথা নীচু করে বসে থাকে।

কিরীটী আবার বললে, কি, কথাটা সত্যি নয়?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন—কেন তার কাকার প্রতি এ ধরনের মনোভাব ছিল?

ঠিক জানি না। তবে—

তবে?

কাকার প্রতি দাদা সন্তুষ্ট ছিল না।

আপনাকে কখনো কোন কথা বলেননি মলয়বাবু ?

না।

ঝগড়া-বিবাদ হয়েছে কখনো ?

না। কাকামণিকে দাদা ভয় করত।

তিনি তো শুনেছি আপনাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করতেন। তবে ভয়ের কি কারণ থাকতে পারে ?

জানি না। বলতে পারব না।

বকুল দেবী !

বলুন।

আপনার পিসীমা মানে ধীরেনবাবুর মা তো মৃত্যুর আগে কয়েক মাস ঐ বাড়িতেই ছিলেন, তাই না ?

হ্যাঁ।

পিসীমা কেমন লোক ছিলেন ?

কিরীটীবাবু !

বলুন ?

পিসীমা বাবা-কাকাদের আপন বোন ছিলেন না—

সে কি ! আপন বোন ছিলেন না ?

না। দাদুর এক বন্ধুর মেয়ে। হঠাৎ একটা অ্যাক্সিডেন্টে ওঁর মা-বাবা মারা যাওয়ায় ওঁকে দাদু নাকি নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। বাবার মুখেই শুনেছিলাম। তবে কাকামণি ওঁকে নিজের ভগ্নীর মতই ভালবাসতেন। আর কাকামণিই পিসীমার বিয়ে দিয়েছিলেন।

তারপরই একটু থেমে বকুল বললে, আর সেদিন একটা কথা আপনাকে আমি মিথ্যা বলেছিলাম—

কি বলুন তো ?

কাকামণি বোধ হয় পিসীমাকে 'মলু' বলে ডাকতেন।

সত্যি ?

হ্যাঁ, তবে সবার সামনে কখনো তাঁকে ডাকতে শুনিনি। পিসীমা যখনই কলকাতার বাড়িতে বছর তিন আগে এলেন তখন তিনি খুব অসুস্থ। কাকামণি গিয়ে তাঁকে আর ধীরুদাকে কলকাতায় নিয়ে আসেন।

তারপর ?

দোতলার একটা ঘরে—পিসীমা যে মাস-দুই বেঁচে ছিলেন সেই ঘরেই থাকতেন, কখনো বের হতেন না। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় কাকামণি পিসীমার ঘরে গিয়ে ঘণ্টাখানেক থাকতেন, সেই সময় একদিন বোধ হয়—সেটা পিসীমা মরার দিন পাঁচেক আগে—কাকামণি যখন পিসীমার ঘরে ছিলেন, সেই ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কাকামণির কয়েকটা কথা আমার কানে এসেছিল—

কি কথা ?

কাকামণি বলছিলেন, মলু, আমি জানি তোমার ক্ষমার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না। তবে প্রায়শ্চিত্ত আমি আজ করছি—

আর কিছু ?

না, আর কোন কথা কানে যায়নি আমার। তবে তার দিন-দুই বাদে ধীরুদা ধানবাদ থেকে—ধানবাদের অফিসে তখন কাজ করছে—এসেছিল পিসীমার সঙ্গে দেখা করতে। রাত্রে মা ও ছেলেতে কি কথা হয়েছিল জানি না, পরের দিন ধীরুদা হঠাৎ আবার কলকাতা থেকে চলে গেলেন, সেই যে গেলেন পিসীমার মৃত্যুসংবাদ শুনেও আসেননি। দাদাই পিসীমার মুখাগ্নি করে। এমন কি ধীরুদা তাঁর মায়ের পারলৌকিক কাজও করেননি।

সত্যি ?

হ্যাঁ।

হঠাৎ কিরীটী ওই সময় প্রশ্ন করল, ধীরেনবাবু আপনার কাকামণি খুন হওয়ার আগে শেষ কবে কলকাতায় এসেছেন ?

তাঁর মার মৃত্যুর পর একবার মাত্র এসেছিল—কাকামণির মৃত্যুর দিন পনের আগে—এক রাত্রি ছিল, তারপর আর আসেনি।

একবারও না মাঝখানে ?

না। কাকামণির দুর্ঘটনার কথা ট্রাঙ্ক-কলে রসময়বাবু জানাবার পর সে আসে।

কিরীটী যেন চিন্তার মধ্যে ডুবে যায়।

অন্ধকারের মধ্যে একটা ক্ষীণ আলোর রশ্মি এতক্ষণে সে দেখতে পাচ্ছে।

কিরীটীবাবু, দাদাকে জামিন দিল না—

তা তো দেবেই না, হত্যার ব্যাপারে সন্দেহ করে যখন অ্যারেস্ট করা হয়েছে।

কিন্তু বিশ্বাস করুন, দাদা কখনোই ঐ কাজ করতে পারে না।

আপনি চিন্তিত হচ্ছেন কেন ! হত্যা যদি সে সত্যিই না করে থাকে—অন্ততঃ আমি সেটা প্রমাণ করতে পারব।

সেই আশাতেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি কিরীটীবাবু।

একটা কথা বকুল দেবী, আপনার কাকামণির উইলের কথা কি আপনি জানতেন?

জানতাম।

জানতেন ?

হ্যাঁ, দুর্ঘটনার দিন-দুই আগে এক রাত্রে কাকামণি আমাকে তাঁর লাইব্রেরী ঘরে ডেকে পাঠান।

তারপর ?

সেই রাত্রে একটা কথা তিনি আমায় বলেছিলেন।

কি ?

তিনি আর হয়ত বেশীদিন বাঁচবেন না—তাই একটা উইল করেছেন।

শরীর তো তাঁর সুস্থই ছিল—তবে ও-কথা বললেন কেন ?

জানি না, তবে বলেছিলেন।

উইলের বিষয়বস্তু কিছু বলেছিলেন ?

না, শুধু বলেছিলেন যে উইল করেছেন।

আপনার দাদাকে সেকথা আপনি জানিয়েছিলেন ?

না, কাকামণি কাউকে কথাটা বলতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

বকুল দেবী, আর একটা কথা—

বলুন !

গেটের চাবিটা আপনি কোথায় রাখতেন ?

আমার ঘরের টেবিলের উপরেই চাবির রিংটা থাকত।

কিরীটী আর কোন কথা বলল না।

অনেকক্ষণ কিরীটী চুপ করে রইল।

বকুল আবার বললে, একটা জিনিস কাল আমি পেয়েছি।

কি ?

একটা ম্যারেজ সার্টিফিকেট।

ম্যারেজ সার্টিফিকেট ! কার ?

পিসীমা ও পিসেমশাইয়ের।

মানে জীবনবাবু আর মল্লিকা দেবীর ?

হ্যাঁ। এই দেখুন—বলতে বলতে কিরীটীর হাতে এগিয়ে দিল ভাঁজ-করা একটা কাগজ নিজের ছোট হ্যাণ্ডব্যাগটা খুলে।

কিরীটী ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা দেখতে লাগল। ম্যারেজটা হয়েছিল রাঁচিতে, চব্বিশ বছর আগে।

হঠাৎ কিরীটীর মনের মধ্যে যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। সে অস্ফুট কণ্ঠে কতকটা যেন স্বগতোক্তির মতই বললে, আশ্চর্য ! আশ্চর্য ! তবে কি—

কিছু বলছেন কিরীটীবাবু ? বকুল প্রশ্ন করে।

য়্যাঁ ! না—কিছু না। এটা আমার কাছে থাক।

বেশ।

কিন্তু এটা আপনি পেলেন কোথায় ?

দুর্ঘটনার দিন-পনের আগে কাকামণির লাইব্রেরী ঘর থেকে একটা বই-এনেছিলাম পড়তে. আলেকজাণ্ডার ডুমার থ্রি মাসকেটিয়ার্স। বইটা শেষ হয়নি বলে গতকাল দুপুরে বইটা নিয়ে বসেছিলাম, হঠাৎ ঐ সার্টিফিকেটটা বের হয়ে পড়ল বইটার মধ্যে থেকে।

কাউকে এ সার্টিফিকেটের কথা বলেছেন ?

না।

কাউকে বলেননি তো সত্যি ?

না, বলিনি।

বলবেন না কাউকে। তারপরই কিরীটী বললে, একটা জটিল ব্যাপার বোধ

হয় পরিষ্কার হয়ে গেল বকুল দেবী।

কি ?

একটা চিঠি—

চিঠি!

হ্যাঁ, চিঠি। আচ্ছা আপনি এখন আসুন, আপনার দাদার জন্য আমি চেষ্টা করে দেখব যদি তাকে জামিন দেওয়াতে পারি।

অতঃপর বকুল বিদায় নিল।

কিরীটীর মধ্যে যেন ঝড় বইছিল তখন। কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করল কিরীটী; তারপর ড্রয়ারের সামনে গিয়ে ড্রয়ার থেকে সেদিন অরবিন্দ চৌধুরীর ঘরে যে চিঠির ছেঁড়া টুকরোগুলো পেয়েছিল সেগুলো নিয়ে আবার বসল, প্রায় ঘণ্টা দুই কাটল টুকরোগুলো নিয়ে। এবারে অনেক চেষ্টায় মোটামুটি ভাবে টুকরোগুলো জোড়া দিতে সক্ষম হল।

এবং সে জোড়া টুকরোগুলো থেকে অবশেষে একটা চিঠি উদ্ধার করতে পারে।

চিঠিতে কোন সম্বোধন নেই।

কাকে চিঠি লিখছে বোঝা যায় না।

কোন সন-তারিখও চিঠিতে নেই।

কেবল নীচে আছে লেখা, "তোমার মলু"।

গভীর মনোযোগ সহকারে চিঠিটা পড়তে থাকে কিরীটী:

ওকে তোমার কাছে নিয়ে যাও। ভেবেছিলাম ওর ব্যাপারে তোমাকে কখনো বিরক্ত করব না। যাকে তুমি অস্বীকারই করছ, সে লজ্জার কাঁটা হয়ে চিরকাল আমার বুকেই বিঁধে থাক। আজ তুমি মস্ত বড়লোক, কিন্তু ও পথের ভিখারী। তাই শেষ পর্যন্ত মনে হল ওকে কেন বঞ্চিত করি! আর আমার দিন তো শেষ হয়েই এসেছে। প্রণাম নিও। তোমার মলু।

স্পষ্ট—অন্ধকার এখন অনেকটা স্পষ্ট হয়ে আসছে। ঐ ম্যারেজ-রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট চব্বিশ বছর আগেকার, আর ওই খণ্ড ছিন্ন চিঠি—যে দুটোই ছিল অরবিন্দের লাইব্রেরীতে, দুটো যেন আলোকবর্তিকার মত তার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাণীগঞ্জ।

একবার রাণীগঞ্জ যেতে হবে, জীবনবাবুর ছেলে ধীরেন হয়ত শেষ আলোটুকু জেলে দিতে পারবে।

কিন্তু পরক্ষণেই একটা কথা মনে হতে কিরীটী উঠে গিয়ে ঘরের কোণে রক্ষিত টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল।

হ্যালো—রসময়বাবু আছেন ?

কথা বলছি,— অন্য প্রান্ত থেকে জবাব এল।

আমি কিরীটী রায়।

কি খবর রায় মশাই? শুনেছেন বোধ হয় মলয়কে নির্মলবাবু অ্যারেস্ট করে নিয়ে গিয়েছেন?

হ্যাঁ। আপনি একবার আসতে পারেন আমার বাড়িতে?

কখন?

এখন। সময় করে—

আসছি আমি।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই রসময় দত্ত এলেন।

বসুন দত্ত মশাই।

রসময় একটা সোফায় উপবেশন করলেন।

আচ্ছা ধীরেনবাবুর বর্তমান বয়স কত হবে বলতে পারেন?

বোধ হয় পঁচিশ-ছাব্বিশ কি এক আধ মাস বেশীও হতে পারে।

হুঁ।

কিন্তু কেন বলুন তো? ধীরেনের বয়স জানতে চাইলেন কেন? রসময় প্রশ্ন করলেন।

কারণ আমার ধারণা—

কি?

ধীরেন বোধ হয় জীবনবাবুর সন্তান নয়।

রসময় চুপ করে রইলেন।

আপনার কি মনে হয় রসময়বাবু?

প্রশ্নটা করে কিরীটী রসময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন বলে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা—আপনিই যখন উইলের প্রধান ও অন্যতম সাক্ষী!

জানি।

কি জানেন?

না, ওদের সন্তান সে নয়।

অরবিন্দবাবুই সন্তান, তাই না?

কি করে বুঝলেন?

একটা চিঠি থেকে অনুমান করেছিলাম। মনে কিছুটা সন্দেহ জেগেছিল। তারপর একটা ম্যারেজ-সার্টিফিকেট অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে।

ম্যারেজ-সার্টিফিকেট! কার?

সুধাবিন্দু ও অরবিন্দবাবুর তথাকথিত বোনের—হ্যাঁ, উনি যে অর্থাৎ ধীরেনের মা যে ওঁদের সহোদর বা সাক্ষাৎ বোনও ছিলেন না তা কি আপনি জানতেন না?

জানতাম। কিন্তু আপনি কার কাছে শুনলেন?

বকুলের কাছে।

বকুল বলেছে! সে তাহলে জানত কথাটা?

জানত।

রসময় কিছুক্ষণ অতঃপর চুপ করে থেকে বললেন, আপনি যখন সবই জেনেছেন, সত্য কথাটা বলতে আর আপত্তি কি! সত্যিই ধীরেনের মা অরবিন্দ-বাবু আর সুধাবিন্দুবাবুর বোন ছিলেন না। ওঁদের বাবার এক বন্ধুর মেয়ে, মেয়েটি মা-বাবার অ্যাকসিডেণ্টে মৃত্যু হওয়ায় এঁদের কাছে সে আশ্রয় পায়।

তারপর বোধ হয় অরবিন্দবাবু ও ধীরেনের মার মধ্যে ভালবাসা জমে ওঠে? কিরীটী বলে।

হ্যাঁ।

কিন্তু তাই যদি হয় তো তারা বিয়ে করল না কেন?

শুনেছি সে এক বিশ্রী ব্যাপার! হঠাৎ একদিন অরবিন্দবাবুর অবর্তমানে তাঁদের বাবা মল্লিকার বিয়ে দেন জীবনবাবুর সঙ্গে।

এখন বুঝতে পারছি—জীবনবাবুর স্ত্রী কেন অন্তস্বত্বা ছিলেন!

তারই ফলে যা হবার তাই হয়েছিল! জীবনবাবু যখন বিয়ের পর জানতে পারলেন তাঁর স্ত্রী সন্তানসম্ভবা, বুঝতেই পারছেন তাঁর মনের কি অবস্থা হতে পারে। স্ত্রীকে তিনি ত্যাগই করবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু অরবিন্দবাবুর জন্যই পারেননি।

কেন?

জীবনবাবুর অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, অরবিন্দবাবু বরাবর ভাল অর্থ-সাহায্য করেছেন।

মল্লিকা দেবী জানতেন না কথাটা?

বোধ হয় না।

কিরীটীর কাছে যেন অতঃপর সব জটই খুলে যেতে শুরু করে।

সে এতক্ষণে বুঝতে পারে যেন অরবিন্দর হত্যার বীজটা কোথায় ছিল, কোন্ গভীরে এবং সবার অলক্ষ্যে নিয়তির নির্মম বিধানেই সেই বীজ থেকে কালসাপ নির্গত হয়ে হতভাগ্য অরবিন্দকে দংশন হেনেছে।

আত্মধিক্কারে, আত্মঘৃণায় জর্জরিত হয়েছে একটা মানুষ দিনের পর দিন। সত্যিই তো, কেমন করে দোষ দেবে আজ তাকে সে!

কিরীটী বোধ করি নিজের চিন্তার মধ্যে তলিয়ে ছিল।

কখন কৃষ্ণা এসে ঘরে প্রবেশ করেছে জানতেও পারেনি। ইতিমধ্যে কখন এক-সময় বেলা দ্বিপ্রহর গড়িয়ে গিয়েছে।

কি গো, আজ খাওয়াদাওয়া হবে না?

কে! কৃষ্ণা—হ্যাঁ চল!

কিরীটী উঠল।

খাওয়ার টেবিলে স্বামীকে অন্যমনস্ক দেখে কৃষ্ণা একসময় শুধাল, আচ্ছা এত কি ভাবছ বল তো?

ভাবছি কৃষ্ণা—মানুষই ভুল করে, বিশেষ করে সেটা বোধ হয় যৌবনের

বিশেষ একটা ধর্ম, কিন্তু পরবর্তীকালে সেরকম ভুলের জন্য সে যদি প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় তবু কি তার সে ভুলটা ক্ষমা করা যেতে পারে না ?

কেন যাবে না !

সেই কথাটাই ভাবছিলাম এতক্ষণ।

কিন্তু কে ভুল করল ?

সম্ভবত—

কিন্তু কিরীটীর কথাটা শেষ হল না, পাশের ঘরে ফোনটা বেজে উঠল ক্রিং ক্রিং করে।

দেখ তো কে ? কিরীটী বললে।

কৃষ্ণা টেবিল থেকে উঠে গিয়ে ফোন ধরল এবং একটু পরে ফিরে এল।

তোমার ফোন—নির্মল চাটুজ্যে !

কি চায় ?

কি জরুরী কথা আছে।

কিরীটী উঠে গিয়ে ফোনটা ধরল, কি খবর নির্মলবাবু ?

মলয়বাবু স্বীকারোক্তি করেছেন।

তাই নাকি !

হ্যাঁ, তিনিই সেরাত্রে অরবিন্দবাবুকে ছোরা মেরে হত্যা করেছেন।

তা হঠাৎ ছোরা মারতে গেল কেন ?

সে এক বিশ্রী কেলেঙ্কারি মশাই !

কি রকম ?

আসুন না। সহজে কি স্বীকার করতে চায়, গুঁতোয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

হুঁ। তা আমি তো এখন যেতে পারব না !

আসতে পারবেন না ?

না, একটা বিশেষ কাজে এখুনি আমাকে বেরুতে হবে, বোধ হয় ফিরব কাল সন্ধ্যা নাগাদ।

বেশ, তবে আর কি হবে !

কৃষ্ণা শুধাল, কোথায় যাবে ?

রাণীগঞ্জ—কিরীটী বললে।

হঠাৎ ?

আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি। তুমি হীরা সিংকে গাড়ি বের করতে বল।

ঝড়ের বেগেই গাড়ি চালাচ্ছিল হীরা সিং।

বেলা আড়াইটেয় ওরা কলকাতা থেকে বের হয়েছে, রাত সাড়ে দশটা নাগাদ দূরে রাতের আকাশে আলোকমালা দেখা গেল।

রাণীগঞ্জ। কোলিয়ারীর আলো।

কোলিয়ারীতে ম্যানেজার ধীরেন চাটুজ্যের বাংলোটা খুঁজে বের করতে দেরি হল না। বাংলোর সামনে এসে গাড়ি থেকে নামল কিরীটী।

একটি ঘরে তখনও আলো জ্বলছে।

কনকনে শীত।

চৌকিদার গাড়ির শব্দে এগিয়ে এল, কৌন!

সাব্ হ্যায় কোঠি মে?

জী।

সাব্‌কে যাকে বলো—এক সাব্ কলকত্তা সে আয়া হ্যায়।

লেকিন সাব্, ইস বখত হাম্‌রা সাব্‌কো সাথ তো মুলকাত নেই হো সক্‌তা।

কিঁউ?

ইস টাইমমে হামরা সাব্ কিসকো সাথ মুলকাত নেহি করতে।

লেকিন হমারা বহুৎ জরুরী কাম হ্যায়? মোলাকত হোনাই চাহিয়ে।

নেহি সাব্, হুকুম নেহি হ্যায়।

ঠিক হ্যায়—তব খুদই ম্যায় যাউঙ্গা।

নেহি সাব্—কৌসিস্ মাত কিজিয়ে। সাব্ কো আপ সায়দ জানতে নেহি। ইস বখৎ সাব্ দারু পিকে—

ঠিক হ্যায়, ঘাবড়াও মাৎ। কোন্ কামরা মে হ্যায় তোমারা সাব্?

ওহি যো কামরামে বাত্তি দেখায়া দেতা।

কিরীটী আর বাক্যব্যয় না করে এগিয়ে গেল।

ঘরের দরজা বন্ধ ছিল।

বন্ধ দরজার গায়ে টোকা দিল কিরীটী।

কে? হু ইজ দেয়ার? গলার স্বর শোনা গেল, বেশ জড়ানো জড়ানো মনে হল যেন গলার স্বরটা।

দরজা খুলুন মিঃ চ্যাটার্জী!

দরজা খুলে গেল।

ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে। ছিমছাম ফিটফাট সাজানো ঘরটা, কয়েকটি সোফা ও একটা ডিভান, সেই ডিভানে বসেই ধীরেন ড্রিংক করছিল।

সামনে নীচু কাচের টেবিলের উপরে স্কচ হুইস্কির একটা প্রায়সমাপ্ত বোতল, একটা অর্ধেক তরল পদার্থপূর্ণ কাচের গ্লাস।

গোটা দুই সোডার বোতল।

পরনে পায়জামা ও গরম ফ্ল্যানেলের ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে দাঁড়িয়ে দরজার উপরেই একেবারে ধীরেন।

কে?

আমি কিরীটী রায়—

কিরীটী রায়!

হ্যাঁ, চিনতে পারছেন না?

পারছি বইকি। তা—

আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।

কি কথা—আমি তো বলেই এসেছি সম্পত্তি আমি চাই না।

আসুন, বসুন মিঃ চ্যাটার্জী।

কিরীটীই ঘরের মধ্যে এগিয়ে গেল। এবং ধীরেনের কোন অনুরোধের অপেক্ষা না রেখেই সোফায় উপবেশন করল।

মনে হল চোখ-মুখ দেখে, ধীরেন যেন একটু বিস্মিতই হয়েছে।

বসুন মিঃ চ্যাটার্জী—বী সীটেড প্লীজ!

ধীরেন একটা সোফায় বসে পড়ল ধপ্ করে। সে বোধ হয় আর দাঁড়াতে পারছিল না।

ধীরেনবাবু, আমি জানি কে অরবিন্দবাবুকে হত্যা করেছে—মানে—আপনার মামাকে! শান্ত গলায় কিরীটী কথাগুলো বলল।

জানেন?

হ্যাঁ।

কে হত্যা করেছে?

সম্ভবতঃ তাঁরই সন্তান, তাঁরই আত্মজ—

কি? কি বললেন? কার সন্তান? মানে—মামা তো বিয়েই করেননি?

মামা নয়, বলুন আপনার জন্মদাতা—বাপ—

হঠাৎ যেন ক্ষেপে উঠল ধীরেন। বললে উন্মাদের মত চেঁচিয়ে, ইয়েস, হ্যাঁ—আই কিল্ড হিম! কিন্তু সে আমার বাপ নয়, আমার বাপ জীবন চাটুজ্যে।

আমি জানি মিঃ চ্যাটার্জী, বুঝি আপনার দুঃখ ও লজ্জার কথা। কিন্তু একটা মানুষ যদি ভুল করেও থাকে তার যৌবনে, তার জন্য তো সে জীবনভোর প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়েছে। তাছাড়া দোষ তো তার নয়—

কি বলছেন আপনি? দোষ তার নয়?

না। তাঁর অনুপস্থিতিতেই আপনার মার বিয়ে দিয়ে দেন অরবিন্দবাবুর বাবা। দোষ অবশ্যি তাঁকেও দেওয়া যায় না। তিনি ব্যাপারটা জানতে পারলে হয়ত ঘটত না এমন ঘটনাটা। সবটাই একটা অনিবার্য ভবিতব্য।

ভবিতব্য!

হ্যাঁ, যার উপর কোন মানুষের কোন হাত নেই।

তবু—তবু তাকে আমি ক্ষমা করতে পারি না।

নিজের হাতে হত্যা করেও বলবেন ওই কথা! অকস্মাৎ কিরীটীর কথাগুলো যেন অব্যর্থ একঝাঁক বুলেটের মত ধীরেনের উপর নিক্ষিপ্ত হল।

চমকে সে তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ ধীরেনবাবু, আমি জানি, ক্ষমাহীন এক আক্রোশের বশেই আপনি আপনার জন্মদাতাকে হত্যা করেছেন। আর চাবি আপনি ডুপ্লিকেট করিয়ে নিয়েছিলেন—সিঁড়ির কোলাপসিব্‌ল্ গেটের তালার সাবানের ইমপ্রেশন একটা

করে ওরিজিনাল চাবিটার, তাই নয় কি ?

হ্যাঁ, কিন্তু—

বকুল দেবী হয়ত সন্দেহ করেছিলেন—

বকুল !

হ্যাঁ, কিন্তু তিনিও মুখ খোলেননি, কারণ—

কি কারণ ?

তিনি আপনাকে ভালবাসেন।

বকুল আমাকে ভালবাসে ?

বোঝা উচিত ছিল আপনার—

ধীরেন মাথাটা নীচু করল।

একটা খবর বোধ হয় জানেন না—

কি ?

মলয়বাবুকে পুলিস অ্যারেস্ট করেছে।

সে কি ! কেন ?

নির্মল চাটুজ্যের ধারণা, তিনি তাঁর কাকাকে হত্যা করেছেন। আর বিচিত্র কি জানেন, এ আপনিও যেমন বুঝতে পারেননি বকুল আপনাকে ভালবাসেন, তেমনি মলয়বাবুও বুঝতে পারেননি তাঁর বোন আপনাকে ভালবাসেন। যাক, আমার একটা কথা শুনবেন ?

কি ?

অতীতকে ভুলে যান।

কি করে ভুলব !

আমি আপনাকে সাহায্য করব।

আপনি !

হ্যাঁ। শুনুন ধীরেনবাবু, একটা কথা ভুলে যাবেন না যে দুর্ভাগ্যের মধ্যে অব্যর্থ নিয়তির ইঙ্গিতে আপনি জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন, অন্ততঃ আমার চোখে—সে দুর্ভাগ্যের জন্য আপনি দায়ী নন। যে কোন মানুষই হয়ত ওই ধরনের কাজ করতে পারত।

কিন্তু—

মলয়বাবুর কথা ভাবছেন ?

ধীরেন তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

মলয়বাবু যে স্বীকৃতিই দিন না কেন, সেটা তাঁকে দিয়ে উইড্র করানো কষ্টকর হবে না, আর পুলিস ও আদালতের পক্ষেও প্রমাণ করা সম্ভব হবে না যে তিনিই হত্যাকারী।

সহসা ধীরেন দু হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় যেন ভেঙে পড়ল।

কিরীটী সোফা থেকে উঠে এসে ধীরেনের মাথার উপর একখানি হাত রেখে গভীর স্নেহে বলল, যা হয়ে গিয়েছে তা তো আর ফিরবে না। আর আপনি যে

পাপ করেছেন তারও দণ্ড বিধাতা আপনাকে দিয়েছেন।

জলভরা দুটি চোখ তুলে ধীরেন কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ ধীরেনবাবু, আপনার ওই চোখের জলের মধ্য দিয়ে আপনার মহাপাপের অনুতাপ, সেই তো বিধাতার দণ্ড। তাছাড়া আমি জানি—আমি বিশ্বাস করি এবং করবও চিরকাল—যা ঘটেছে তার উপর আপনার কোন হাত ছিল না,—এক-জন নেশাগ্রস্ত মানুষের মত নিজের জন্মকলঙ্কের গ্লানিতে আপনি মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন—যেটা সকলের পক্ষেই হয়ত সম্ভব।

কিন্তু আমি—আর ক্ষমা তো পাব না!

পাবেন বইকি—স্বর্গ থেকে তিনি নিশ্চয় আপনাকে ক্ষমা করেছেন। এবারে চলুন আমার সঙ্গে—উঠুন।

কোথায়?

কলকাতায়।

না, না—সেখানে আমি যেতে পারব না।

পারবেন। তাছাড়া মলয়বাবুকে মুক্ত করতে হবে না! সে দায়িত্বও যে আপনারই উপরে এখন। চলুন—উঠুন।

কিন্তু এখন তো কোন ট্রেন নেই। ধীরেন বললে।

জানি, ট্রেন নেই। সঙ্গে আমার গাড়ি আছে, সেই গাড়িতেই যাব আমরা। নিন, আর দেরি করবেন না—উঠুন।

একটা প্রাণহীন পুতুলের মতই যেন ধীরেন উঠে দাঁড়াল।

ধীরেনকে নিয়ে কিরীটী এসে তার গাড়িতে উঠে বসল।

হীরা সিং গাড়ি ছেড়ে দিল।

রাত শেষ হতে তখন আর বাকি নেই।

আকাশের পূর্বপ্রান্তে বিদায়ী রাতের অন্ধকার যেন ক্রমশঃ স্বচ্ছ হয়ে উঠছে।

শীতের সকালের ঠাণ্ডা বাতাস চোখেমুখে এসে লাগে।

একসময় কিরীটী প্রশ্ন করল, একটা কথা ধীরেনবাবু, আপনি জানলেন কি করে আপনার জন্মবৃত্তান্ত, আর কবেই বা জেনেছিলেন?

মার মৃত্যুর আগে।

তিনিই বলেছেন?

তাঁর মৃত্যু-শয্যাতেই সব কথা আমাকে বলে যান।

আমিও ওইরকমই একটা কিছু অনুমান করেছিলাম—

কিরীটীবাবু!

বলুন।

আপনি কি প্রথম থেকেই আমাকে সন্দেহ করেছিলেন?

না।

তবে?

তবে মনে মনে সব কিছু পর্যালোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে আমি উপনীত

হয়েছিলাম।

কি!

হত্যাকারী বাইরের কোন অপরিচিত ব্যক্তি নয়—এমন কেউ যে ওই বাড়ির সব কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিল এবং যার পক্ষে ওই বাড়িতে আসা-যাওয়া ও সকল সংবাদ সংগ্রহ করা আদৌ কষ্টকর ছিল না।

কিন্তু—

জানি কি বলবেন, সেক্ষেত্রে একমাত্র মলয়বাবুর উপরেই সন্দেহটা পড়া উচিত সকলের—

কিন্তু ও-কথা একবারও তো আমার মনে হয়নি।

জানি, তা হলেও সন্দেহটা তাঁর উপরই পড়ত—নির্মলবাবুরও তাই পড়েছে, কিন্তু দুটি ব্যাপারে তাঁর উপর থেকে সন্দেহটা চলে যায়। প্রথমতঃ তিনিই যদি হতেন তো তাঁকে সিঁড়ির কোলাপসিব্‌ল্‌ গেটের তালার ডুপলিকেট চাবি সংগ্রহ করতে হত না, কোন প্রয়োজনই তাঁর ছিল না, এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি তাঁর কাকাকে হত্যা করতে যাবেনই বা কেন? কাকার তো তাঁকে তাঁর সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করবারও কোন কারণই ছিল না। স্বর্ণডিম্বপ্রসূ হংসকে কি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি হত্যা করে!

তবে ঐ ধরনের স্বীকৃতি থানায় তিনি দিতে গেলেন কেন?

বলেছি তো সে তাঁর বোনের জন্য। প্রথমটায় হয়ত তিনি বুঝতে পারেননি ব্যাপারটা এবং সেই সঙ্গে হয়ত তিনি আপনাকেই সন্দেহ করেছিলেন।

আমাকে!

হ্যাঁ, এবং তার পরে হয়ত কোন একসময় বোনের মনের কথাটা জেনেছিলেন; তাই অ্যারেস্টেড হবার পর একমাত্র বোনের কথা ভেবেই আপনাকে বাঁচাবার জন্য ঐ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

কিন্তু পরে জানা গিয়েছিল একটি কথা বকুলের জবানবন্দি থেকে, যা সে স্বেচ্ছায় কিরীটীর কাছে প্রকাশ করেছিল, সমস্ত ব্যাপারটা মিটে যাবার পর।

মলয়কে সেই দুর্ঘটনার রাত্রে কাকার ঘর থেকে বকুল বের হয়ে আসতে দেখেছিল। মলয়ের সারা জামাকাপড়ে রক্ত ও তার হাতে রক্ত ও হাতের পাতায় রক্ত।

ধীরেন তার বাপকে হত্যা করে বের হয়ে যাবার পর—মলয় ঢুকেছিল ওই ঘরে একটা অদ্ভুত চিৎকার শুনে। ঘরে ঢুকে দেখে ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালতেই সেই বীভৎস দৃশ্যটা তার চোখে পড়ে—সে হতভম্ব হয়ে যায়, কাকার দেহটা নাড়াচাড়া করে বোঝে তিনি মৃত—ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি আলোটা না নিভিয়েই সে বের হয়ে এসেছিল।

সেই অবস্থাতেই বকুল তাকে দেখেছিল।

বকুলের কাছে পরে স্বীকার করেছিল কথাটা মলয়।

সেতারের সুর

॥ এক ॥

সুনীল,

সত্যি আমি ভাবতেও পারিনি আর এখনো ভাবতে পারছি না বাসবীকে কে নাকি হত্যা করেছে। এখনো যেন ভাবতে পারছি না তাকে কেউ হত্যা করতে পারে কোন দিন। বাসবীকে হত্যা করেছে কেউ। পরশু হঠাৎ দুপুরের দিকে সুহাস আমার বাড়িতে এসে হাজির। সেতারে তখন আমি একটা বহু পুরাতন গৎ বাজাচ্ছিলাম আমার তেতলার ঘরে একা একা বসে। অনেকদিন সেতারে হাত দিই না—বাজাতে আজকাল আর ভাল লাগে না বলে কিংখাবে মোড়া অবস্থায় সেতারটা আলমারির মাথায় তোলাই ছিল যেমন থাকে ইদানীং। একপর্দা ধুলো জমেছিল—ঝেড়েপুঁছে সেতারটা নিয়ে বসেছিলাম, হঠাৎ যে কখন বাজাতে বাজাতে বাসবীর সেই চিরদিনের প্রিয় সুরটা বাজাতে শুরু করেছি মনেও ছিল না। মনে হচ্ছিল বাজাতে বাজাতে—আশ্চর্য, বাসবী যেন আমার সামনে বসে আমার সেতার বাজানো শুনছে, যেমন করে সে বরাবর শুনত। বিশ্বাস করো সত্যিই। সত্যিই যেন বাসবী সামনে বসে ছিল আমার মনে হচ্ছিল। কেমন একটা শিথিল অলস ভঙ্গিতে দেহটা কোমল করে আমার সামনেটিতে বসে আছে। পরনে একটা কালোপাড় সাদা শাড়ি, মোমের মত সাদা নিরাভরণা দুটি হাত—বাম হাতটি কোলের উপরে আলতোভাবে পড়ে আছে। গোল-গলা সাদা ব্লাউজটার উপরিভাগে তার বুকের অনেকখানি চোখে পড়ে। কয়েকগাছি রুক্ষ কুন্তল কপালের পাশ দিয়ে গালের উপর এসে পড়েছে। পা দুটি পিছন দিকে ভাঁজ করা। কোমল স্নিগ্ধতার সেই আশ্চর্য নীল দুটি চোখের তারা যেন সুরের মধ্যে ডুবে গিয়েছে।

মনে হচ্ছিল যেন কতকাল পরে বাসবী আবার আমার ঘরে এসেছে। একটা যুগ যেন। তা একটা যুগই বইকি। সেই যে এক বছর আগে এক বর্ষণমুখর অপরাহ্নে তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি, তারপর তো আর কখনো তার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। সেও আসেনি আমার বাড়িতে, আমিও যাইনি তাদের বাড়িতে। কেউ কারো খোঁজ পর্যন্ত নিইনি। সত্যি বিশ্বাস কর, খোঁজ নেওয়ার কোন তাগিদই যেন ভিতর থেকে আমি অনুভব করিনি। আর এও আমি জানি, সেও কখনও আমার খোঁজ নেয়নি। আর খোঁজ নেবার অবকাশই বা তার কোথায় ছিল? ব্রজেশের প্রেমে সে তখন হাবুডুবু খাচ্ছে।

ব্রজেশ চৌধুরী—আমাদের দলে লেখাপড়ায় সবচাইতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কীর্তিমান। অথচ চালচলনে ও কথাবার্তায় সবচাইতে যাকে বলে ক্যাবলা-মার্কা... যেমন বোকাটে বোকাটে নাদুসনুদুস চেহারা তেমনি বেরসিক ভোঁতা। দুটো কথা একসঙ্গে বলতে গেলেই তো-তো করে তোতলাতে শুরু করে দিত। কত হাসাহাসি করেছি আমরা তাকে নিয়ে, মনে আছে নিশ্চয়ই তোর। আমাদের

দলের অভিজিৎ বলত, ব্রজেশ চুপ দে। আর কথা কস্ না—বাঙাল ভাষায় ওকে ভেঙিয়ে বলত। ও কিন্তু হাসতে হাসতে জবাব দিত, কি ক—করুম ক? কথা কওন আমার একটা ব্যা—ব্যা—ব্যাধি।

খিলখিল করে ঐ সময় হেসে উঠত বাসবী, বলত, মুখে একটা মারবেল রাখ—শুনেছি তাতে করে তোতলামি সারে—

সত্য নাকি? সত্য কইতাছো বাসবী?

হ্যাঁ—বাসবী হাসতে হাসতে বলেছে।

তাই রাখুম তুমি যখন কইতাছো—

তার পর থেকে কটা দিন মুখে মারবেল রেখে, মনে পড়ে তোর, তোতলামি সারাবার ব্রজেশের কি অসাধারণ প্রয়াস। সব কথাই যেন এখনো স্মৃতির পটে জ্বল-জ্বল করছে—এম. এ. ক্লাসের সেই দিনগুলো—রেস্তোরাঁয় ময়দানে সেই আড্ডা।

ব্রজেশ চৌধুরী ঐ সময় নিয়মিত আসতে পারত না আমাদের আড্ডায়, বোধ হয় তুই ভুলিসনি। বি. ই. কলেজের ছুটিছাটা ছিল কম—তারপর মেকানিক্যাল ইনজিনীয়ারিংয়ে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে সে চলে গেল গ্লাসগো। আমরাও একটা-আধটা চাকরি জুটিয়ে নিলাম। এক বছরের মধ্যেই ডক্টরেট হয়ে ব্রজেশ ফিরে এল মোটা মাইনের একটা চাকরি নিয়ে একটা বিদেশী ফার্মে। তারপর তিনটে মাসও গেল না—হঠাৎ আবিষ্কার করলাম বাসবী ব্রজেশকে ভালবাসে। শুধু তাই নয়, এও জানতে পারলাম সেইদিন, ওদের ভালবাসার খেলা নাকি গত তিন বছর ধরেই তলে তলে চলছিল।

অস্বীকার করব না আজ—সংবাদটা যেন আমার বুকে একটা তীক্ষ্ম শরের মত বিদ্ধ হয়েছিল সেদিন।

আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম।

কি বোকা আমি! কি বোকা! আসলে ও ব্রজেশকেই ভালবাসে, অথচ আমি কিনা আগাগোড়া ভেবে এসেছি বাসবী সত্যিকারের আমাকেই ভালবাসে। সে আমার। একান্তই আমার। সত্যি বলছি তোকে সুনীল, বিশ্বাস করতে পারিনি কথাটা প্রথমে—ভেবেছি সবটাই বুঝি আগাগোড়া একটা কৌতুক, একটা তরল রহস্য।

কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তরে বাসবী যখন বললে, রঞ্জন, সত্যিই ওকে আমি ভালবাসি—

কি বলছ তুমি বাসবী, অর্ধস্ফুটভাবে যেন একটা চিৎকার বের হয়ে আসে আমার গলা থেকে।

কেন, তুমি বুঝতে পারনি? আমি কিন্তু ভেবেছিলাম—

কি ভেবেছিলে বাসবী?

তুমি বুঝতে পেরেছ! সবাই তোমরা বুঝতে পেরেছ!

বাসবী!

বল।

বাইরে তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি—সোঁ সোঁ হাওয়া—উঃ, কি বৃষ্টিই নেমেছিল সেদিন!

আজ কি ঐ কথাটা বলবার জন্যই তুমি এসেছিলে? বললাম ওর মুখের দিকে তাকিয়ে।

না।

তবে?

তোমার সেতার বাজানো শুনতে।

রসিকতা করছ?

বাঃ, রসিকতা করব কেন!

বাইরে ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি পড়ছে।

কিন্তু তুমি থামলে কেন—বাজাও না। মেঘমল্লার বাজাও—please, বাজাও রঞ্জন।

হাসলাম আমি অস্ফুট হাসি।

বাজাও রঞ্জন—ও আবার অনুরোধ করল।

সে আর একদিন হবে। তা তোমাদের বিয়ে কবে?

এখনো বছরখানেক দেরি হবে।

কেন? দেরি কি জন্য?

আছে কিছু অসুবিধা—

অসুবিধাটা কার? তার না তোমার?

আমারই—

ওঃ, তা বিয়ের নেমন্তন্ন করবে তো?

বাঃ, তোমাকে নেমন্তন্ন করব না! তুমি সুহাস সুনীল অভিজিৎ তোমরা চার মাসকেটিয়ার না গেলে তো বিয়েই হবে না—কিন্তু সত্যি, বাজাও না মেঘমল্লার!

তার ছিঁড়ে গেছে বাসবী সেতারের—

সে কি! কখন ছিঁড়ল? তার তো সব দেখছি ঠিক আছে!

না। সব তার ছিঁড়ে গিয়েছে।

বাসবী আর কোন কথা বললে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উঠে দাঁড়াল। বললে, তাহলে আজ চলি—

আমি একবারও বললাম না, বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে। এখন যাবে কি করে? বাসবী সত্যি-সত্যিই বের হয়ে গেল সেই প্রচণ্ড বৃষ্টি মাথায় করেই।

আমি পাথরের মত ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলাম।

জান সুনীল, সেই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ! তার পর আর দেখা হয়নি আমাদের। প্রায় এক বছর পরে হঠাৎ সেদিন অফিস থেকে ফিরে টেবিলের উপরে দেখি একটা রঙিন খাম পড়ে আছে। ডাকে এসেছে। বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র।

খাম থেকে চিঠিটা বের করে দেখি ব্রজেশ আর বাসবীর বিয়ের চিঠি। তাতে লেখা—আমাদের বিয়ে সামনের দশ তারিখে, আসা চাই কিন্তু—ব্রজেশ—বাসবী।

প্রথমে ভেবেছিলাম, যাব না।

বিয়েতে যাব না ওদের—তারপর হঠাৎ মনে হল, না গেলে বাসবী নয় কিন্তু ব্রজেশ দুঃখ পাবে। বন্ধুকে দুঃখ দেব না।

কিন্তু কি প্রেজেনটেশন দেওয়া যায়! অনেক ভেবে ভেবে এক সেট রবীন্দ্র রচনাবলী ও একটা দামী শাড়ি কিনলাম। গুছিয়ে রেখে দিলাম আলমারির মধ্যে সিল্কের রঙীন ফিতে দিয়ে বেঁধে।

বিয়ের আর মাত্র চারদিন তখন বাকি। রবিবার—কাজকর্ম নেই—মাও বাড়িতে নেই, কাশী গেছেন তীর্থ করতে। একা একা সময় যেন আর কাটছিল না, তাই একসময় বহুকাল পরে সেতারটা নামালাম আলমারির মাথা থেকে। ধুলো জমেছে সেতারে। ঢিলে হয়ে গিয়েছে তার। ধুলো ঝাড়লাম—তার বাঁধলাম, তারপরে মেরজাপটা আঙুলে পরে বাজাতে শুরু করলাম।

ভেবেছিলাম, বুঝি দীর্ঘদিনের অনভ্যাস—বাজাতে পারব না—কিন্তু কিছু-ক্ষণের মধ্যেই বাজনার মধ্যে তন্ময় হয়ে গেলাম।

সেদিনও বাইরের আকাশে মেঘ জমেছিল। ধরলাম মেঘমল্লার। হঠাৎ মনে হল বাসবী যেন এসে আমার সামনে বসেছে।

ও হাসল আমার দিকে চেয়ে—আমি বাজিয়েই চললাম। বাজাতে বাজাতে কেমন যেন আমার ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল।

বাইরে তখন বৃষ্টি নেমেছে। জানলার কাচের সার্শিগুলো খোলা, বৃষ্টির ছাট ঘরে আসছে, তবু উঠে গিয়ে সার্সি বন্ধ করব—যেন ইচ্ছাই হল না। অঝোরধারায় বৃষ্টি—মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমকানি—আমি ঘরের মধ্যে বসে মেঘমল্লার আলাপ করে চলেছি সেতারে!

সুহাস কখন এসে ঘরে ঢুকেছে জানতেও পারিনি। কড়কড় করে প্রচণ্ড শব্দে বাইরে কোথায় যেন একটা বাজ পড়ল আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঝনঝন শব্দ তুলে সেতারের তারিটা আমার ছিঁড়ে গেল।

থমকে থেমে গেলাম, আর সেই মুহূর্তে সুহাসের ডাকটা আমার কানে এল, রঞ্জন!

কে?

ঘুরে তাকিয়ে দেখি সুহাস। সর্বাঙ্গ তার জলে ভিজে যেন সপসপ করছে। চুল থেকে নাকে-মুখে জলের ফোঁটা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। চোখের পুরু লেন্সের চশমাটা খুলে রুমালে মুছতে মুছতে সুহাস ঘরের মধ্যে আরো কয়েক পা এগিয়ে এল।

রঞ্জন!

এ কি, সুহাস! এই বৃষ্টিতে—

পথে বের হয়ে বৃষ্টি নামল হঠাৎ—তারপর ট্রাম থেকে নেমে তোর এখানে আসতে আসতে একেবারে ভিজে গিয়েছি।

যা—আগে পাশের ঘরে গিয়ে গা-মাথা মুছে আয়—আলনায় দেখ আমার ধুতি আছে—চট্ করে বদলে আয়।

সুহাস যায় না, তবু দাঁড়িয়েই থাকে।

কি রে—যা!

অ্যাঁ—হ্যাঁ—যাই—

হ্যাঁ হ্যাঁ—যা, চট্ করে জামাকাপড়গুলো বদলে আয়—ততক্ষণ ইলেকট্রিক হিটারে আমি চায়ের জল চাপিয়ে দিচ্ছি—যা—

চায়ের জন্যে তোকে ব্যস্ত হতে হবে না রঞ্জন—তুই বোস্। একটা অত্যন্ত দুঃসংবাদ আছে—

দুঃসংবাদ!

বুকের মধ্যে যেন আমার হঠাৎ ধ্বক করে ওঠে। সুহাসের মুখের দিকে তাকালাম আমি, কি দুঃসংবাদ সুহাস?

বাসবী—

বাসবী—কি? কি হয়েছে বাসবীর? উৎকণ্ঠায় গলার স্বরটা যেন আমার বুজে আসতে চায়। বললাম, চুপ করে আছিস কেন সুহাস? কি—কি হয়েছে বাসবীর?

রঞ্জন, বাসবী নেই—

নেই! কণ্ঠ চিরে যেন আমার একটা চাপা আর্তনাদ বের হয়ে এল।

সুহাস আবার তার কথাটার পুনরাবৃত্তি করল, হ্যাঁ রে—বাসবী নেই।

কি বলছিস সুহাস! বাসবী নেই—মানে কি? মারা গিয়েছে?

হ্যাঁ, মারাই গিয়েছে, তবে—

তবে—কি তবে? Please সুহাস, সব কথা আমাকে বল।

রঞ্জন—বাসবী—তাকে মৃত অবস্থায় তার ঘরে গতকাল সকালে পাওয়া গিয়েছে—

আত্মহত্যা করেছে বাসবী?

সুহাস একটু চুপ করে থেকে বললে, প্রথমটায় সবাই ভেবেছিল তাই—বাসবী বুঝি আত্মহত্যাই করেছে—কিন্তু—

কিন্তু কি? উৎকণ্ঠায় যেন তখন আমার গলা শুকিয়ে উঠেছে প্রায়।

কিন্তু—, বলে সুহাস যেন শেষ কথাটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল, আমার মুখের দিকে তাকাল, তারপর বললে, পরে পুলিস মৃতদেহ পরীক্ষা করে বলেছে, তাদের ধারণা নাকি সে আত্মহত্যা করেনি—তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে—brutally murdered!

হত্যা করা হয়েছে? বাসবীকে কেউ হত্যা করেছে?

হ্যাঁ—পুলিসের তাই ধারণা। গলায় রুমাল জাতীয় কিছু পেঁচিয়ে শ্বাস-রোধ করে তাকে চরম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে।

উঃ, কি সাংঘাতিক—না, না—সুহাস—ব্যাপারটা যেন এখনো আমার কল্পনাতেও আসছে না। বাসবীকে হত্যা করা হয়েছে! কিন্তু কেন—কেন, তাকে হত্যা করতে যাবেই বা কেউ কেন? বাসবীর তো কেউ এ সংসারে শত্রু ছিল না। সেরকম কথাও তো কখনও তার মুখে আমরা শুনিনি, বরং তাকে সবাই ভালই

বাসত। হাসিখুশী প্রাণবন্ত—

অথচ তাকে হত্যা করা হয়েছে যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।—

সুহাস হঠাৎ চুপ করে গেল ঐ পর্যন্ত বলে।

ঘরের মধ্যে যেন একটা মৃত্যুর মত হিমশীতল স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল। বাইরে তখন বোধ হয় বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। মেঘলা আকাশে অপরাহ্নের শেষ আলো প্রায় মিলিয়ে এসেছে। কেউ আমরা কিছুক্ষণ আর যেন কথাই বলতে পারি না। সব কথাই যেন আমাদের হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়েছে। ফুরিয়ে গিয়েছে আমাদের সব কথা। সব কথা বলা হয়ে গিয়েছে।

বাসবী আর নেই। তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। কিন্তু সুনীল, সত্যি বলতে কি এখনো যেন ব্যাপারটা আমি কল্পনাতেও আনতে পারছি না।

রঞ্জন! সুহাস ডাকল।

ওর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালাম।

জানিস—ওর মানে বাসবীর শোবার ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের মধ্যে একটা রুমাল পাওয়া গিয়েছে—রুমালটা বেসিনের মধ্যে পড়েছিল।

রুমাল!

হ্যাঁ, রুমালের এক কোণে ইংরেজীতে লাল সুতোয় মনোগ্রাম করা 'B' কথাটা।

'বি' ইংরেজী অক্ষর মনোগ্রাম করা রুমালে?

হ্যাঁ, জেনট্‌স্ রুমাল। পুলিস ইন্সপেক্টর যিনি তদন্ত করছেন ব্যাপারটা, তাঁর ধারণা হত্যাকারী ঐ রুমালটাই হয়ত বাসবীর গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে তাকে হত্যা করেছে। ওর বাড়ির মধ্যে একমাত্র পঙ্গু বৃদ্ধ জেঠা বিরাজবাবু আর তাঁর সেই পুরনো চাকর মাধব ব্যতীত তৃতীয় কোন পুরুষ মেম্বার নেই। কার ঐ রুমালটা হতে পারে বল তো?

কেমন করে বলব বল?

আমার কি মনে হয় জানিস!

কি?

যে হত্যা করেছে বাসবীকে তার নামের আদ্যক্ষর নিশ্চয়ই 'বি'—ইংরেজিতে—

মানে?

মানে 'বি' দিয়ে যার নাম শুরু তেমন কেউই হয়ত ওকে হত্যা করেছে। বলছিস পুলিস ইন্সপেক্টরেরও তাই ধারণা?

হ্যাঁ।

কিন্তু তুই আর ঐ ভিজে জামাকাপড়গুলো পরে থাকিস না। ঠাণ্ডা লাগবে। যা পাশের ঘরে গিয়ে জামাকাপড়গুলো ছেড়ে আয়।

সুহাস পাশের ঘরে চলে গেল।

সেরাত্রে প্রায় আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ সুহাস বিদায় নিল।

আচ্ছা সুনীল, তোর কি মনে হয়? কে হত্যা করতে পারে এমন নিষ্ঠুরভাবে

বাসবীকে আমাদের, আর কেনই বা হত্যা করল—যদি 'ইন্সপেক্টরের' কথাই সত্যি হয়, তাকে হত্যা করাই হয়েছে ?

॥ দুই ॥

দিন দশেক পরে।

সুহাসের টালীগঞ্জের বাড়ির বাইরের ঘরে বেলা দশটা নাগাদ বসে তিন বন্ধুতে মিলে রঞ্জনের চিঠি ও বাসবীর হত্যার ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছিল।

সুনীল, সুহাস ও অভিজিৎ। সুনীল গত পরশু মাত্র কলকাতায় পেঁাচেছে। মাস দশেক হবে সে বোম্বাইয়ের একটা মিলে ভাল মাইনের চাকরি পেয়ে চলে গিয়েছিল। অবিশ্যি বাসবী ও ব্রজেশের বিয়ের ব্যাপার না থাকলেও সুনীল কলকাতায় আসতই, কারণ ঐ একই তারিখে তার ছোট বোনের বিবাহ ধার্য হয়েছিল। গতকাল বিয়ে হয়ে গিয়েছে—২১শে শ্রাবণ।

সুনীল বাসবী ও ব্রজেশের কাছ থেকে তাদের বিবাহের আমন্ত্রণলিপি পেয়ে জানিয়েছিল, ঐ একই তারিখে তার বোনেরও বিয়ে, অতএব সে আসছে কলকাতায় এবং যেমন করেই হোক সে তাদের বিয়েতে এক ঘণ্টার জন্য হলেও যাবে।

কলকাতায় রওনা হওয়ার আগের দিনই সুনীল রঞ্জনের চিঠিটা পায়।

সুনীলই একসময় সুহাসের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা সুহাস, বাসবীর জেঠামশাই বিরাজবাবু ওদের বিয়েতে মত দিয়েছিলেন ? ব্রজেশরা তো খুব নীচু জাত !

হ্যাঁ, মত দিয়েছিলেন শুনেছি। সুহাস বললে।

মত দিয়েছিলেন ? আশ্চর্য !

হ্যাঁ—মত মানে তাঁর ইচ্ছা না থাকলেও কোন বাধা দেননি।

কি রকম ?

ঐ দুর্ঘটনার দিন সাতেক আগে, সুহাস বলে, বাসবীর সঙ্গে আমার কলেজ স্ট্রীটে দেখা হয়েছিল—বিয়ের কি সব মার্কেটিং করতে এসেছিল ও। দুজনে এক সময়ে কফি হাউসে গিয়ে ঢুকি, তখনই কথায় কথায় বলেছিল বাসবী, ধীরাজ সান্যাল নাকি প্রথমটায় ব্রজেশকে ও বিবাহ করছে শুনে বলেছিলেন, কারো স্বাধীন ইচ্ছায় তিনি বাধা দিতে চান না, জীবনে কখনো দেনওনি কাউকে, তবে বাসবী যেন মনে রাখে ব্রজেশকে সে বিবাহ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মনে করবেন তাঁর কাছে বাসবীর মৃত্যু হয়েছে।

তারপর ?

বাসবীকে তো জানিস, এমনিতে অত্যন্ত সফ্‌ট্‌ ছিল সে, কিন্তু কোন কোন ব্যাপারে তাকে রীতিমত অনমনীয়—অ্যাডামাণ্ট স্টাবর্ণ মনে হত—অত্যন্ত জিদী, একরোখা। বিশেষ করে একবার মনে মনে কোন সিদ্ধান্ত সে নিলে তা থেকে

কোনমতেই ফেরানো যেত না। সেও সঙ্গে সঙ্গে নাকি জবাব দিয়েছিল, তুমিই বা ভাবলে কি করে জেঠু, তোমার অমতে যখন বিয়েই করছি বিয়ের পর আবার তোমার এখানে আসব—তবে হ্যাঁ, প্রণাম করতে আসব আমরা, কিন্তু তাতে যদি তোমার আপত্তি থাকে তো তাও আসব না।

বলেছিল ঐ কথা বাসবী তার জেঠাকে? সুনীল প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ—এবং বিরাজবাবু নাকি অতঃপর বলেছিলেন, না, আসার আর দরকার নেই।

কিন্তু আমি যতদূর জানি, বাসবী তার জেঠাকে সত্যিকারের ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত।

মিথ্যা নয় কথাটা—সুহাস জবাবে বলে।

বাসবী বিরাজের আশ্রয়ে আসে বছর পনের বয়সের সময়। বিরাজ সান্ন্যাল—ওরা বাসবীর মুখেই শুনেছিল—তাঁর যৌবনেই একদিন সহসা ভাগ্যানুসন্ধানে বাড়িঘর ছেড়ে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যান। দীর্ঘ পনের বছর তারপর আর কেউ তাঁর কোন সংবাদ পায়নি।

পনের বছর বাদে হঠাৎ কলকাতায় ফিরে এলেন তিনি—তাও জাহাজ থেকেই অসুস্থ হয়ে সোজা হাসপাতালে। তারপর নাকি সুস্থ হয়ে হোটেলে কয়েকদিন ছিলেন এবং হোটেল থেকেই সহসা আবার একদিন হঠাৎ—যেমন কলকাতায় এসে হাজির হয়েছিলেন তেমনি হঠাৎই বর্মা মুলুকে ফিরে গিয়েছিলেন। ঐ সময় নাকি শোনা গিয়েছিল, বর্মায় কাঠের ব্যবসা করে প্রচুর বিত্তশালী হয়েছেন তিনি।

বাসবীর বাবা বিরাজের একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদর ডাঃ ধীরাজ সান্ন্যাল যখন মেডিক্যাল কলেজে পড়েন তখন এক ইউরেশিয়ান নার্সকে ভালবাসেন—তারপর পাস করার পর তাকে বিবাহ করে মহীশূরে একটা চাকরি নিয়ে চলে যান।

মহীশূরে বছর চারেক ছিলেন ধীরাজ সান্ন্যাল, তারপর একদিন একমাত্র শিশু-কন্যা বাসবীকে নিয়ে বাংলা দেশে ফিরে এসে দেশ বনগাঁয়ে প্র্যাক্‌টিস শুরু করেন।

বাড়িতে এক বুড়ী ঝি, ছিল বাসন্তী—সেই বাসবীকে দেখাশোনা করত। ধীরাজের স্ত্রী সম্পর্কে নানা গুজব শোনা যেত—যদিও তিনি বলেছিলেন তাঁর স্ত্রী জুনিফারের মৃত্যু হয়েছে।

দীর্ঘকাল পরে লোকমুখে দাদার সন্ধান পেয়ে দাদাকে একটা পত্র দিয়েছিলেন ধীরাজ কিন্তু কোন জবাব পাননি। তারও বছর দশেক পরে ঠিক তাঁর মৃত্যুর কয়েক দিন আগে হঠাৎ ধীরাজ সংবাদ পান বিরাজ নাকি দেশে ফিরে এসেছেন।

ফিরে এসেছেন নাকি পঙ্গু হয়ে।

স্ট্রোকে প্যারালিসিস হয়ে ডান পা-টা পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। বিয়ে-থা করেননি। একা মানুষ। বাসবী সেবার স্কুলফাইন্যাল পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সে বলেছিল সংবাদটা শুনে তার বাপকে, তুমি যাবে না বাবা?

কোথায় মা? ডাঃ ধীরাজ সান্ন্যাল কন্যাকে শুধিয়েছিলেন।

জেঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে?

না মা।

কেন ?

বাসন্তী জানত না তখনো, যেহেতু ডাঃ ধীরাজ সান্ন্যাল তো তাঁর কন্যাকে কোনদিন বলেননি কথাটা যে দাদাকে একদিন চিঠি দিয়েছিলেন তিনি কিন্তু সে চিঠির জবাব তাঁর দাদা দেননি। শুধু বললেন, না। পরে ধীরাজের ডাইরী থেকে কথাটা বাসবী জানতে পেরেছিল—ঐ চিঠি দেওয়ার ব্যাপারটা।

তার দু'দিন পরেই আশ্চর্যভাবে ঘটল ঘটনাটা।

ডাঃ ধীরাজ সান্ন্যাল হঠাৎ করোনারী অ্যাটাকে মারা গেলেন এবং তার পরদিনই বিরাজ সান্ন্যালের বিরাট গাড়িটা ডাঃ ধীরাজ সান্ন্যালের বনগাঁয়ের জীর্ণ একতলা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রৌঢ় পঙ্গু বিরাজ সান্ন্যাল ক্রাচে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ি থেকে নামলেন।

অবিশ্যি বাসবী কি ভেবে আগের দিন তার জেঠামশাইকে কলকাতার ঝাউতলার বাড়ির ঠিকানাটা দিয়ে তার বান্ধবীর দাদা কলকাতার কলেজের ছাত্রকে বলেছিল তার বাপের মৃত্যুসংবাদটা তার জেঠামশাইকে দিতে।

বাসবী ইতিপূর্বে তার জেঠামশাইকে দেখেনি—চেহারাটা তাঁর কেমন তাও সে জানত না। কল্পনাও করতে পারেনি।

ডাঃ ধীরাজ সান্ন্যাল ছিলেন কালো বেঁটেখাটো রোগা। সর্বদেহে ও চোখেমুখে ছিল একটা আজীবন সংগ্রামের ও পরাজয়ের যেন একটা নিষ্ঠুর চিহ্ন। একে তো ছোট শহরে ডাক্তারিতে বিশেষ কিছু পেতেন না, তার উপরে মন দিয়ে উৎসাহ নিয়ে কোনদিন তেমন করে প্র্যাকটিসও করেননি। বেশীর ভাগ সময়ই নিজের ঘরে মোটা মোটা ডাক্তারী বই নিয়ে পড়ে থাকতেন। রোগী ডাকতে এলেও বড় একটা ঘর থেকে বেরুতেন না, বেরুতে চাইতেন না।

আর বিরাজ সান্ন্যাল যেন ঠিক তার বিপরীত ছিলেন।

প্রায় ছ ফুটের কাছাকাছি লম্বা। গোরাদের মত টকটকে গায়ের বর্ণ। মাথার চুল প্রায় সবই পেকে গিয়েছে—সাদা। পাকা চুল সযত্নে ব্যাকব্রাশ করা। বলিষ্ঠ দেহের গড়ন। সে সময়টা ছিল শীতকাল। বিরাজ সান্ন্যালের পরনে ছিল পায়জামা গরম পাঞ্জাবি আর গায়ে জড়ানো ছিল দামী সাদা-কাজ-করা কাশ্মীরী শাল। পায়ে সাদা চটি। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা।

সঙ্গে ভৃত্য মাধব ছিল। সে ও ড্রাইভার হরদয়াল দুজনে নামতে সাহায্য করে বিরাজ সান্ন্যালকে গাড়ি থেকে।

মোটরের শব্দেই বাসবী বাইরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। সে চিনতে পারেনি বিরাজ সান্ন্যালকে।

বিরাজ সান্ন্যাল ক্রাচের সাহায্যে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, এটাই তো ডাঃ ধীরাজ সান্ন্যালের বাড়ি ?

আজ্ঞে। মৃদুকণ্ঠে বাসবী জবাব দেয়।

তুমিই বোধ হয় তার মেয়ে বাসবী ?

হ্যাঁ।

আমি কলকাতা থেকে আসছি—আমার নাম বিরাজ সান্যাল।

বাসবী তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে জেঠার পায়ের ধুলো নেয়।

থাক থাক, হয়েছে। তা হয়েছিল কি?

করোনারী অ্যাটাক—

হবে না! বাড়ির চেহারা যা দেখছি, হয়ত খেতেও পেত না দু'বেলা পেট ভরে। যাক গে যা হবার হয়েছে—চল আমার সঙ্গে।

কোথায় যাব?

আমার কলকাতার বাড়িতে।

কিন্তু—

এর মধ্যে আবার কিন্তুটা আসছে কোথা থেকে? যাবে না তো এখানে বয়েসের মেয়ে একা পড়ে থাকবে নাকি? চল চল—

বাসবী কোন কথা বলতে পারে না যেন। চুপ করে কেমন যেন একটু হতভম্ব হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে।

কি হল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বিরাজ একটু যেন তিক্তকণ্ঠেই কথাগুলো বললেন।

বাসবীর কোন প্রতিবাদ করতে আর ইচ্ছা করেনি। সে ভিতরে গিয়ে প্রস্তুত হবার জন্য পা বাড়াতেই বিরাজ বলেছিলেন, আবার চললে কোথায়?

আমার জিনিসপত্র—

থাক ওসব এখানেই পড়ে—চল, আর জিনিসপত্র নিতে হবে না।

কেমন যেন একটু ভ্যাবাচাকা খেয়েই তবু আবার বলেছিল বাসবী, নেব না কিছু?

না—চল।

আর কিছু বলবার মত সাহস খুঁজে পায়নি বাসবী সেদিন। মানুষটার চেহারা—তাঁর আভিজাত্য, কথা বলবার ভঙ্গি কেমন যেন পঙ্গু করে দিয়েছিল সেই মুহূর্তে বাসবীকে। একে দুদিন কিছু খায়নি—শ্মশান থেকে ফিরে একপ্রকার উপবাসই করে পড়েছিল। দুদিন থেকে ক্রমাগত নিজের অসহায় অবস্থার কথাটাই ভাবছিল,—এবারে কি করবে, কেমন করে চলবে, বাবা যে তার একটি কপর্দক সংস্থান রেখে যাননি এবং যে কথাটা ধীরাজের আকস্মিকভাবে চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গেই বার বার ঘুরেফিরে মনে পড়ছিল, আর ঠিক যে কারণেই জেঠার কথাটা তার মনে হওয়ায় বান্ধবীকে অনুরোধ করেছিল তার জেঠার কলকাতার ঠিকানাটা দিয়ে তার ভাইকে দিয়ে জেঠা বিরাজমোহনকে একটা সংবাদ দেবার জন্য, সব কিছু মিলিয়ে সে যেন সত্যি-সত্যিই কেমন অসহায় হয়ে পড়েছিল।

বাসবী আর কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি। বুড়ী ঝি বাসন্তীও ঐ সময় ওদের কথাবার্তা শুনে ওদের এক পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। শেষ মুহূর্তে একবার বাসবী বাসন্তীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

বাসন্তীও সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, তাই যাও বাছা—জেঠা ছাড়া আর তোমার এখন আশ্রয়ই বা কোথায়!

বিরাজ বাসন্তীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, তুমি কে ?

আমি আর কে বাবু—ঝি !

তা তুমিও ওর সঙ্গে ইচ্ছে হলে যেতে পার।

বাসন্তী আর বাসবী দুজনে গিয়ে বিরাজের বিরাট গাড়িতে উঠে বসেছিল। ঘনগা থেকে সোজা এসে সন্ধ্যার কিছু পরে গাড়ি থেকে নেমে বাসবী ও বাসন্তী বিরাজমোহনের ঝাউতলার বাড়িতে ঢুকেছিল। ঝাউতলার বাড়িটা এমন বিরাট কিছু নয়, তবে খুব ছোটও নয়—সেকেলে আমলের পুরাতন একটা দোতলা বাড়ি কিনে বিরাজমোহন নিজের পছন্দমত অদলবদল করে সাজিয়ে তুলেছিলেন।

ঠিক বড় রাস্তার উপর বাড়িটা নয়। একটু ভিতরের দিকেই বড় রাস্তার থেকে বাড়িটা। সামনে একটু বাগানমত—পিছনেও খানিকটা বাগান আছে। প্রাচীরের ওপাশে সরু একটা গলি—তার পিছনে কিছু নিম্নশ্রেণীর লোকের ঘরবাড়ি। বেশ নির্জন।

সেকেলে বাড়ি বলেই উপরে ও নীচে খানদশেক ছোটয়-বড়য় মিলিয়ে ঘর ছিল। বিরাজ নীচের তলাতেই থাকতেন, উপরের ঘরগুলো খালিই পড়েছিল, বাসবী ও বাসন্তীর থাকবার ব্যবস্থা দোতলাতেই করে দিলে ভৃত্য মাধবকে ডেকে।

মাধব, উপরে ওদের থাকার সব ব্যবস্থা করে দে। ঠ্যাকুরকে বলে দিবি। কথা-গুলো বলে ক্রাচে ভর দিয়ে পা-টা টেনে টেনে পঙ্গু বিরাজমোহন তাঁর নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ওদের দিকে আর তাকালেনও না।

মাধব বললে, চলুন দিদিমণি—

কোথায় ? বাসবী জিজ্ঞাসা করে।

উপরে—সাহেব সকালেই আমাকে বলে রেখেছিলেন আপনাকে আনতে যাবার আগে, সব ব্যবস্থা করে গোছগাছ করে রাখতে। সব ঠিক করে রেখেছি—চলুন।

বাসন্তীকে নিয়ে মাধবের পিছনে পিছনে সিঁড়ি ভেঙে বাসবী উপরে গেল। অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল—ঘরে ঢুকে মাধব আলো জ্বালিয়ে দিল। বেশ বড় সাইজের ঘর। একধারে একটা খাটের উপরে ধবধবে শয্যা বিছানো, একপাশে একটা পড়ার টেবিল, একটা স্টীলের আলমারী, খান-দুই চেয়ার।

একেবারে নতুন না হলেও জিনিসগুলো দামী—মনে হয় কোন সেলে সাহেব-বাড়ির ফার্নিচার কেনা।

মাধব জিজ্ঞাসা করে, চা খাবেন তো দিদিমণি ?

চা ?

হ্যাঁ।

না—এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দাও।

পাশের ঘরে কুঁজোতে জল ছিল, একটা কাচের গ্লাসে করে জল এনে দিল মাধব।

এক চুমুকে ঢকঢক করে কুঁজোর জলটা খেয়ে নিল বাসবী।

সাহেব বলে গিয়েছিলেন, আপনার জন্য কিছু জামা ও শাড়ি আন্দাজমত ঐ

আলমারীতে কিনে এনে রেখেছি। রাত্রে তো আপনি দুধ-মিষ্টি খাবেন—ঐ যে কলিং বেলটা রয়েছে ওটা টিপলেই আমি আসব। কথাগুলো বলে মাধব চলে গেল ঘর থেকে বের হয়ে।

বাসবী আশ্রয় পেল। নিশ্চিন্ত হল। ক্রমশঃ পরে অবিশ্যি বাসবী বুঝতে পেরেছিল, তার জেঠা বিরাজ সম্পর্কে যতটা সে বাবার ডাইরীতে পড়েছিল তেমন কিছুই নয়। কাঠের ব্যবসা করে কিছু টাকা জমিয়েছিলেন বিরাজ এবং তার বেশীর ভাগ টাকাটাই ব্যবসায় খাটতো। যুদ্ধের মুখেই সব কিছু বিবেচনা করে সব কিছু ফেলে যতটা পেরেছিলেন নগদ টাকাকড়ি নিয়ে ভৃত্য মাধবসহ বাংলা দেশে ফিরে আসতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছিলেন। স্ট্রোকের পর পঙ্গুও হয়ে পড়েছিলেন, বর্মা মুলুক থেকে চলে আসবার সেও একটা কারণ ছিল। কলকাতায় ফিরে এসে আর নতুন করে জীবন শুরু করবার চেষ্টা করেননি। ঐ বাড়িটা কিনে, ব্যাঙ্কের সঞ্চিত অর্থের উপর নির্ভর করেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন মনস্থ করেছিলেন।

বিরাজমোহনের বাড়িতে এসে বাসবী উঠল বটে, তবে জেঠার সঙ্গে বড় একটা দেখাসাক্ষাৎ হত না। অবিশ্যি দেখাসাক্ষাৎ না হলেও বাসবীর পড়াশুনা জামা-কাপড়—তার সুখ-সুবিধার উপর যথেষ্ট নজর ছিল বিরাজের সর্বক্ষণ।

মধ্যে মধ্যে অবিশ্যি দেখাসাক্ষাৎ হত জেঠা ও ভাইঝির—সামান্য দু-চারটে কথাবার্তাও হত বিশেষ প্রয়োজনীয়—তার বেশী কিছু নয়। বাসবী ক্রমে পাস করে কলেজে ভর্তি হল—বি. এ. পাস করে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হল—বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেল। ঐ বাড়িতে থাকার ব্যাপারটাও ইতিমধ্যে সহজ হয়ে এসেছিল বাসবীর কাছে। বাসন্তী ইতিমধ্যে মারা গিয়েছিল। নতুন এক ঝি এসেছিল—শ্যামা। মধ্যবয়েসী শ্যামা চতুরা ও কর্মঠ।

এম. এ. পাস করার পর হঠাৎ একদিন বিরাজ ডেকে পাঠালেন তাঁর নীচের ঘরে বাসবীকে।

ডেকেছ আমাকে জেঠু?

হ্যাঁ। এবারে কি করবে ঠিক করেছ? এম. এ. তো পাস করলে।

ভাবছি রিসার্চ করব।

আমি ভাবছি তোমার এবারে একটা বিয়ে দেব।

বিয়ে!

হ্যাঁ, কোন আপত্তি আছে নাকি? প্রশ্নটা করে বিরাজ তাকাল বাসবীর মুখের দিকে, কি চুপ করে রইলে কেন? না কোথাও প্রেমট্রেম করেছ? যদি করে থাক তো সেই নামটাই না হয় বলো—

সময় হলে জানাব।

ওঃ, সময় হলে জানাবে! তা বেশ—তবে একটা কথা মনে রেখো, কোন কিছু অশোভন ব্যাপার বা বেলেল্লাপনা আমি সহ্য করব না। যেতে পার এখন।

কথাগুলো বলে হাতের সামনে মোটা বইটা তুলে নিয়েছিলেন বিরাজমোহন।

ঐ সব কথা বাসবীর মুখেই সুহাসদের শোনা। বাসবীই বলেছিল ওদের। কথাটা শুনে রঞ্জন বলেছিল, তাহলে তোমার জেঠামশাই তোমার কোন স্বাধীন ইচ্ছাকে মেনে নেবেন না!

না। বাসবী বলেছিল, সেরকম কোন আশংকাই আমার নেই—জেঠাকে যতদূর চিনেছি, কারো স্বাধীন ইচ্ছায় উনি বাধা দেবেন না কখনো।

ঠিক জান?

হ্যাঁ। লোকটা একটু peculiar type-এর বটে তবে একটা principle আছে।

॥ তিন ॥

সুহাস বলছিল আলোচনা প্রসঙ্গে, কাজেই বাসবী যখন ব্রজেশকে বিয়ে করার কথা জানিয়েছিল তার জেঠামশাইকে—নিজে ব্রাহ্মণ ও ব্রজেশ কৈবর্ত হওয়া সত্ত্বেও কোন আপত্তি করেননি তিনি।

কেবল শুধিয়েছিলেন, সব একেবারে ঠিক? পাকাপাকিই মনস্থ করে ফেলেছ ওকেই বিয়ে করবে?

হ্যাঁ।

তা বেশ। তা ছেলেটি কি করে?

ব্রজেশের সব কথা বলেছিল বাসবী অতঃপর। চেয়ারের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় বাসবীর কথা শুনতে শুনতে ঐদিনকার সংবাদপত্রটার উপর চোখ বুলোচ্ছিলেন বিরাজমোহন আর মধ্যে মধ্যে নিঃশব্দে চোখ তুলে তাকাচ্ছিলেন বাসবীর মুখের দিকে। সব শোনার পর বলেছিলেন, তুমি যে এমন কিছু একটা করবে শেষ পর্যন্ত আমি জানতাম। জুনিফারের রক্তই তো তোমার দেহে। তারপর একটু থেমে বলেছিলেন, রঞ্জনের সঙ্গে—ঐ রঞ্জন ছেলেটির সঙ্গে তাহলে এতদিন খেলাই করছিলে?

বাসবীর মুখটা হঠাৎ লাল হয়ে উঠেছিল, সে বলেছিল, আপনি ভুল করছেন—ভুল!

হ্যাঁ, রঞ্জন সম্পর্কে যে কথাটা আপনি বললেন—মানে ঐ ধারণাটা আপনার ঠিক নয়।

ধারণাটা মিথ্যা আমার?

হ্যাঁ, কারণ রঞ্জনের সঙ্গে সেভাবে কখনো আমি মিশিনি। আর সেকথা সেও জানে। আমাদের পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই—ভুল বোঝাবুঝির কোন কারণ নেই।

বিরাজমোহন অতঃপর তাকিয়েছিলেন বাসবীর মুখের দিকে কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর বলেছিলেন, হুঁ। তা বিয়েটা কবে হচ্ছে আর কি মতে?

আমরা রেজিস্ট্রী করে বিয়ে করছি।

বেশ। বলে বিরাজ হাতের সংবাদপত্রটা আরো সামনে তুলে ধরে তাতে মনঃ-সংযোগ করেছিলেন।

অভিজিৎ হঠাৎ সুহাসের বিবৃতিতে বাধা দিয়ে বলে, এসব কথা তুই জানলি কি করে সুহাস?

ব্রজেশই আমাকে বলেছিল—সুহাস বললে।

সুনীল বললে, আমি জানতাম না এসব কথা। তবে এ জানতাম বাসবীর মা একজন ইউরেশিয়ান মহিলা ছিলেন—কিন্তু বাসবীর জেঠামশাই হঠাৎ সেদিন বাসবীকে তার মার কথা বলে খোঁচা দিয়েছিলেন কেন জানিস কিছু?

ঠিক জানি না—আর ব্যাপারটা এত delicate যে বাসবীকেও ও সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারিনি। তবে আমার কি মনে হয় জানিস সুনীল?

কি? সুনীল প্রশ্ন করে।

বাসবীর মায়ের কোন একটা ব্যাপার ছিল নিশ্চয়ই!

ব্যাপার মানে?

মানে কেলেঙ্কারি—

কি করে বুঝলি?

প্রথমতঃ ভেবে দেখ্, বাসবী কখনো তার মার সম্পর্কে কোন কথাই কোনদিন স্পষ্ট করে আমাদের কাউকে বলেনি—বরং মায়ের ব্যাপারটা বরাবর সে সযত্নে এড়িয়েই গিয়েছে। তাছাড়া আরো ভেবে দেখ্,—বাসবীর বাবা ডাঃ ধীরাজ সান্যাল মেডিকেল কলেজের একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। খুব ভালভাবে পাস করে ভালবেসে ঐ বিদেশিনীকে বিবাহ করে সস্ত্রীক ভাল চাকরি নিয়ে মহীশূরে যান, কিন্তু হঠাৎ চার বছর পরে মহীশূর থেকে ফিরে এলেন দেড় বছরের শিশুকন্যা বাসবীকে নিয়ে—সবাইকে বললেন স্ত্রী মারা গিয়েছে এবং এসে বনগাঁয়ের মত একটা জায়গায় গিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করলেন। ব্যাপারটা কেমন নিজেকে একেবারে নির্বাসিত করার মতই মনে হয় না কি? এবং মানুষ সাধারণতঃ নিজেকে নির্বাসিত করে একপ্রকার কখন—

তুই বলতে চাস সুহাস—সুনীল বাধা দিয়ে সুহাসকে উদ্দেশ করে বলে, তাঁর স্ত্রীর দিক থেকে কোন আঘাত পেয়েই তিনি অমন করে মহীশূর থেকে চলে এসে-ছিলেন?

ঠিক তাই। আর আমার মনে হয় তাঁর স্ত্রী তখনো মরেননি, বেঁচেই ছিলেন—ও'দের সেপারেশন হয়ে গিয়েছিল এবং সেই কারণেই হয়ত কোনদিন আর ভাল করে ডাক্তারিও করেননি- কারো সঙ্গে মেশেননি—দিবারাত্র বই নিয়ে পড়ে থাকতেন।

অভিজিৎ বলে, সুহাস হয়ত ঠিকই বলেছে সুনীল। হয়ত বাসবীর বাবা ডাঃ ধীরাজ সান্যালের জীবনে কোথাও একটি নিদারুণ ক্ষত ছিল যার দাহ তাঁকে সর্বক্ষণ পীড়ন করত।

ঐ সময় রঞ্জন এসে ঘরে ঢুকল। রঞ্জনের বেশভূষা চিরকালই ছিমছাম—তার নিজস্ব একটা রুচিও আছে। সুন্দর চেহারা। এককালে নিয়মিত অনেকদিন ব্যায়াম

করায় সুগঠিত দেহ। ভালভাবে ইকনমিক্সে এম. এ. পাস করে একটা ব্যাংকে ভাল মাইনের চাকরিও করছে বছরখানেক। আরো উন্নতির আশা আছে। ঐ চাকরির সঙ্গে সঙ্গে সে চার্টার্ড অ্যাকাউনটেনসিও পড়ছিল। সংসারে সে ও তার বিধবা মা।

কিন্তু আজ রঞ্জনের বেশভূষা ও চেহারার মধ্যে কেমন যেন একটা বিশৃংখলতা। তার স্বাভাবিক সযত্ন পারিপাট্যের অভাবটা যেন বেশ স্পষ্টই চোখে পড়ে সকলের।

রঞ্জন ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। মনে হচ্ছিল যেন খুবও ক্লান্ত এবং চিন্তিত।

সুহাস, অভিজিৎ, সুনীল সকলেরই ধারণা ছিল, বরাবর বাসবী বুঝি রঞ্জনকেই ভালবাসে এবং একদিন ওরা বিবাহ করবে। ব্রজেশের সঙ্গে বিবাহের ব্যাপারটা জানতে পেরে ওরা সত্যি কথা বলতে কি তিনজনই যেন একটু বিস্মিত হয়েছিল।

সুনীল ওদের মধ্যে একজন কবি—নানা কাগজে তার কবিতা প্রকাশিত হয়, সে সব শুনে মৃদু হেসে বলেছিল, নারীচরিত্র সত্যই দুর্জ্ঞেয়!

সুহাস বলে, চা খাবি নাকি রঞ্জন?

ইতিমধ্যে দু'প্রস্থ চা ওদের মধ্যে হয়ে গিয়েছিল। সামনে টেবিলটার উপরে শূন্য চায়ের কাপ-ডিসগুলো ও অ্যাশট্রে-ভর্তি পোড়া সিগারেটের টুকরো আর ছাই। সুহাসের কথার জবাবে রঞ্জন কিছু বলবার আগেই সুনীল বলে ওঠে, মন্দ প্রস্তাব নয়—বলে দে সকলের জন্য চা সুহাস।

রঞ্জন কোন জবাব দিল না।

সুহাস উঠে গেল ভিতরে চায়ের কথা বলবার জন্য। রঞ্জন তখনও চুপচাপ বসে। ওদের—সুনীল ও অভিজিতের কেমন যেন একটু অস্বস্তিই বোধ হয়। ওরা ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারে না কিভাবে আলাপ শুরু করা যায় ঐ মুহূর্তে, কারণ ওরা তো কয়েক দিন আগে পর্যন্ত জানত বাসবী রঞ্জনকেই ভালবাসে। আর রঞ্জনও যে বাসবীকে ভালবাসে সেটা তো ওদের কারো অজ্ঞাত ছিল না। তাইতেই তো ওরা বিস্মিত হয়েছিল ব্রজেশ ও বাসবীর বিবাহের নিমন্ত্রণলিপি পেয়ে।

রঞ্জনই ওদের যেন ঐ অস্বস্তি থেকে মুক্তি দিল। বললে, আমি শীগগিরি আমাদের বোম্বাই ব্রাঞ্চে চলে যাচ্ছি রে—

কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছিস? সুনীল প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ।

তবে যে তুই বলতিস, কলকাতা থেকে বদলি করলে তখনি তুই চাকরিতে ইস্তফা দিবি? সুনীল বলে।

রঞ্জন মৃদু হাসল, হ্যাঁ, একদিন তাই মনে হয়েছে কিন্তু আজ আর মনের সে স্থিতি নেই। তাছাড়া কলকাতায় যেন কেমন দমবন্ধ হয়ে আসছে ভাই।

সুহাস ঐ সময় ঘরে এসে ঢুকল।

অভিজিৎ প্রশ্ন করে, কবে তাহলে যাচ্ছিস?

এখনো অবিশ্যি মাস দেড়েক দেরি আছে।

কিসের দেরি রে রঞ্জন? সুহাস প্রশ্ন করে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে।

সুনীল বলে, রঞ্জন ওদের ব্যাঙ্কের বোম্বাই ব্রাঞ্চে বদলি হয়ে চলে যাচ্ছে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

তাহলে এখানকার বাসা—

তুলে দেব। রঞ্জন বললে, বুড়ো মাকে নাহলে একা কার কাছে রেখে যাব এখানে বল্ ?

তা তো ঠিকই। আচ্ছা রঞ্জন—

সুনীল ডাকে রঞ্জন ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, যদি তুই কিছু মনে না করিস—

কি কথা ? রঞ্জন সুনীলের মুখের দিকে তাকাল।

বাসবী যে ব্রজেশকেই ভালবাসে, তুই ঠিক কবে জানতে পেরেছিস বল্ তো ?

ওদের বিয়ের মাস দেড়েক আগে। রঞ্জন বললে, তোকে তো সবই চিঠিতে লিখেছিলাম—

হ্যাঁ, কিন্তু সে নিজে থেকেই কথাটা তোকে জানিয়েছিল—না তুই জিজ্ঞাসা করতে বলেছিল সে ?

আমি ওকে বিয়ের কথা বলতেই বলেছিল। একটু ইতস্তত করে বলে রঞ্জন।

তুই এতটুকুও কখনও সন্দেহ করিসনি ?

না। স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। আর ভাববই বা কি করে বল্! অত ঘনিষ্ঠতার পরও আমার সঙ্গে সে যে সর্বক্ষণ ব্রজেশেরই ধ্যান করছে মনে মনে কেমন করেই বা ভাবব! পরে আমার কি মনে হয়েছিল জানিস সুনীল—

কি ? সুনীল ওর মুখের দিকে তাকাল।

ওরা হয়ত আমার ব্যাপার নিয়ে কত হাসাহাসি করেছে নিজেদের মধ্যে—

না, না—বাসবী সে ধরনের মেয়ে ছিল না। সুনীল বলে ওঠে।

কতটুকু তোরা তার সম্পর্কে জানতিস সুনীল জানি না, তবে বাসবী ছিল সত্যিকারের একজন পাকা অভিনেত্রী—

অভিনেত্রী! সুহাস অর্ধস্ফুটভাবে কথাটা উচ্চারণ করে যেন।

নয় ? ভেবে দেখ্ আগাগোড়া ব্যাপারটা। রঞ্জন তিক্তকণ্ঠে কথাগুলো বলে, তার কাছে অজ্ঞাত বা অস্পষ্ট ছিল না কথাটা যে তাকে আমি ভালবাসি। তা সত্ত্বেও ব্রজেশকে সে যে ভালবাসে, সে কথাটা আগে আমাকে জানিয়ে দিল না কেন ? জানালে তো কোন ক্ষতি হত না কারুরই ?

হয়ত জানাবার অবকাশ হয়নি বলে। সুহাস ঐ সময় বলে।

কিন্তু ব্রজেশ—ব্রজেশও তো জানাতে পারত আমাকে কথাটা!

ব্রজেশ কেমন করে বলতে পারে বল্ ? বন্ধু মানুষ—তাছাড়া ব্যাপারটা অত্যন্ত delicate বলেই হয়ত—

তাই বুঝি আমার proposal দেওয়ার আগে পর্যন্ত তারা মুখ বুজে থেকে মজা দেখছিল আমাকে নিয়ে ?

কথাগুলো বলে হঠাৎ রঞ্জন উঠে দাঁড়াল। বললে, চললাম—

চা আসছে—খাবি না? সুহাস প্রশ্ন করে।

না।

রঞ্জন বের হয়ে গেল ঘর থেকে। যেমন হঠাৎই এসে ঘরে ঢুকেছিল, তেমনি হঠাৎই যেন ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সুহাস বললে, বেচারী! অত্যন্ত shocked হয়েছে—সত্যিই ও বাসবীকে ভালবাসত।

অভিজিৎ বলে, স্বাভাবিক।

ভৃত্য ঐসময় ট্রেতে করে চার কাপ চা নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। চা-পান করতে করতে সুনীল বলে, আচ্ছা অভিজিৎ, বাসবীকে ঐভাবে কে হত্যা করতে পারে বল্ তো?

কি জানি ভাই, ব্যাপারটা সত্যিই দুর্বোধ্য! অভিজিৎ জবাবে বলে।

কিন্তু আমি ঠিক করেছি যেমন করেই হোক বাসবীর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতেই হবে—করবই। আর সেটা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য। সুনীল বলে।

পুলিসই এখনো কোন কূলকিনারা করতে পারল না—যেভাবে তারা চেষ্টা করছে জানি পুলিস হয়ত কোন দিনই সত্যিকারের হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে পারবে না সেভাবে। কিন্তু আমি চেষ্টা করলে পারব।

কি ভাবে চেষ্টা করবি শুনি?

সুনীল বলে, জানি না—তবে চেষ্টা করব।

সুহাস ঐ সময় বলে, তোর কি কাউকে সন্দেহ হয় সুনীল?

সুহাসের প্রশ্নে সুনীল যেন হঠাৎ কেমন চমকে ওঠে। বলে, সন্দেহ! না, না, —সন্দেহ কাকে আর করব—

তবে?

একটা কথা, বাসবীর হত্যার কথাটা জানবার পর থেকেই আমার কি মনে হচ্ছে জানিস সুহাস—

কি?

বাসবীকে বাইরের কোন তৃতীয় ব্যক্তি হত্যা করেনি ঐভাবে—করতে পারে না—absurd!

তার মানে কি বলতে চাস তুই? সুহাস সুনীলের মুখের দিকে তাকাল।

বলতে চাই আপাততঃ এইটুকুই যে, বাইরের কোন অচেনা অজানা তৃতীয় ব্যক্তি ঐভাবে তার দোতলার শোবার ঘরে ঢুকে তাকে হত্যা করে যেতে পারে না। সংবাদপত্রে যেটুকু প্রকাশিত হয়েছিল নিশ্চয়ই তোরা সকলেই পড়েছিস। বাসবীকে মৃত অবস্থায় ঘরের মেঝেতে পাওয়া গিয়েছিল। তার শয্যা সেরাত্রে কেউ স্পর্শও করেনি। আর তার পড়বার টেবিলে একটা বই খোলা ছিল—পাশে একটা রাইটিং প্যাড ও কলম খোলা অবস্থায়—তাতে মনে হয় হত্যাকারী যখন তার শোবার ঘরে ঢুকেছিল তখনও সে জেগে কোন চিঠি লিখছিল কাউকে—

সে বেচারী হয়ত বুঝতেও পারেনি যে তার ঘরে ঐসময় গিয়ে ঢুকল শেষ পর্যন্ত তাকে সে শ্বাসরোধ করে হত্যা করবে—

অভিজিৎ বললে, কিন্তু সে যে বাসবীর অজানা অচেনা ছিল না কি করে বুঝলি ?

তা যদি হত সে নিশ্চয়ই চিৎকার করে উঠত—পাশের ঘরে তার ঝি শ্যামা জানতে পারত। সুনীল বলে একটু থেমে, শ্যামাও কিছু জানে না—জানতে পারেনি বলে পুলিসের কাছে জবানবন্দি দিয়েছে।

হয়ত এমনও হতেপারে সে সময়টুকুও সে পায়নি। হত্যাকারী অতর্কিতে তাকে শ্বাসরোধ করেছে—কণ্ঠরোধ করেছে হঠাৎ পিছন দিক থেকে এসে যখন সে চিঠি লেখায় বা বইয়ের মধ্যে ডুবেছিল !

না। আমার তা মনে হয় না। শুধু আমারই নয়—ব্রজেশেরও তাই ধারণা।

ব্রজেশ !

হ্যাঁ, কাল আমি ব্রজেশের কিড স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। সুনীল বললে, তাছাড়া ব্রজেশ কি বলছিল জানিস সুহাস—

কি ?

তারও ধারণা কোন পরিচিত ব্যক্তিই বাসবীকে হত্যা করেছে। সেও চায় বাসবীর হত্যাকারী ধরা পড়ুক।

অভিজিৎ বলে ওঠে, কেবল সে-ই কেন—আমরা সবাই চাই বাসবীর হত্যাকারী ধরা পড়ুক !

আরো কিছুক্ষণ পরে সুনীল সুহাসের গৃহ হতে বের হয়ে বাড়ির দিকে হেঁটে চলে।

বেলা প্রায় সোয়া এগারোটা হবে—তবে ছুটির দিন বলে সর্বত্রই যেন একটা নিষ্ক্রিয় শিথিলতা। কোন ব্যস্ততা নেই কোথায়ও। আকাশে মেঘ করেছে—রৌদ্রের কোন তীব্রতা তাই অনুভূত হয় না। বরং বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডাই মনে হয়—বাতাসে একটা ঠাণ্ডার আমেজ, দূরে হয়ত কোথায়ও বৃষ্টি নেমেছে।

সুহাসের বাড়ি টালীগঞ্জে। বাড়ি থেকে বের হয়ে বেশ কিছুটা হাঁটলে তবে ট্রাম-রাস্তা। ট্রাম বা ট্যাক্সি পেতে হলে বড় রাস্তায় না পেঁছানো পর্যন্ত পাওয়া যাবে না।

সুনীল সুহাসদের একটু আগে যে কথাগুলো বলে এল—গত দু'তিন ঘণ্টা ধরে সে কথাগুলো কেবলই কেন যেন তার মনে হচ্ছিল। বাসবীকে কেউ অজানা অচেনা সেরাত্রে হত্যা করেনি। কোন পরিচিতজনই সেরাত্রে তাকে ঐভাবে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে তার দোতলার শোবার ঘরে ঢুকে। কিন্তু কে ? কে হতে পারে—কে ?

সে যদি অজানা অচেনা না হয়—তাহলে নিশ্চয়ই কোন পরিচিতজন ! কিন্তু পরিচিতজন কে সে ?

কে হতে পারে—ঐ সময় সুনীলের মনে একটা প্রশ্ন জাগে, কার কার সঙ্গে পরিচয় ছিল বাসবীর—শুধু পরিচয় নয়—ঘনিষ্ঠ পরিচয়—যে অন্ততঃ রাত্রে তার দোতলার শয়নঘরে গিয়ে ঢুকলে বাসবী খুব বেশী একটা বিস্মিত হত না। এবং যে গিয়েছিল সেরাত্রে বাসবীর শয়নঘরে, সে ঠিক কখন গিয়েছিল? অবিশ্যি যেই গিয়ে থাক সে বাড়ির লোকদের অজ্ঞাতেই গিয়েছিল, কারণ বাড়ির লোকেরা পুলিসের কাছে জবানবন্দি দিয়েছে কাউকেই নাকি তারা সেদিন রাত্রে বাসবীর সঙ্গে দেখা করতে যেতে দেখেনি। বাসবীও নাকি বিকেলে সেই যে ফিরে এসে তার শয়নঘরে প্রবেশ করছিল আর বের হয়নি। রাত্রি সাড়ে নটা নাগাদ শ্যামা নাকি তাকে খাবার কথা বলতে গিয়েছিল কিন্তু খিদে নেই বলে বাসবী শ্যামাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। খায়ওনি সেরাত্রে সে। তাতেই মনে হয় হত্যাকারী রাত দশটার পর কোন এক সময় তার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করেছিল হয়ত।

॥ চার ॥

সত্যিই বাসবীর হত্যার ব্যাপারটা রীতিমতই যেন একটা রহস্য। দুর্বোধ্য লাগছিল বিরাজমোহনের কাছেও। বিরাজমোহনের ঝাউতলার বাড়ির দোতলায় বাসবী যে ঘরটায় থাকত—দোতলার পাঁচখানি ঘরের মধ্যে সেটা একেবারে শেষ-প্রান্তের ঘর, পূর্ব ও দক্ষিণমুখী। প্রথমে বাসবীকে থাকবার জন্য তৃতীয় ঘর-খানি বিরাজ নির্দিষ্ট করেছিলেন। মাসখানেক সেই ঘরটায় ছিলও বাসবী—তারপর নিজেই ইচ্ছে করে ঘর বদল করে শেষপ্রান্তের ঘরটিতে চলে গিয়েছিল।

বিরাজমোহনকে কথাটা জানিয়েছিল বাসবী ভৃত্য মাধবের দ্বারা, বিরাজ শুনে কোন আপত্তি করেননি।

শেষপ্রান্তের ঐ ঘরটি থাকবার জন্য বেছে নেওয়ার বাসবীর দুটি উদ্দেশ্য ছিল। এক, পূর্বদিকটা ঘরের খোলা—শীতের দিনে সকাল থেকেই রোদ তো আসেই, আলোও প্রচুর। দুই, দোতলার ঘরগুলোর মধ্যে ঐ ঘরটিই সব চাইতে প্রশস্ত এবং ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড্‌ বাথরুম আছে।

দোতলায় অবিশ্যি আরো একটি বাথরুম আছে, ঠিক মাঝামাঝি তৃতীয় ও চতুর্থ ঘরের মধ্যস্থানে।

বাসবীর পাশের ঘরটা ছোট। প্রথমে সেটায় থাকত বাসন্তী, তারপর বাসন্তীর মৃত্যুর পর শ্যামা এসেও দোতলার ঐ ঘরটিই অধিকার করেছিল।

বাদবাকি তিনটে ঘরে নানা ধরনের অকসনে কেনা ফার্নিচার ছিল। বিরাজ-মোহনের বাতিক বল বাতিক, নেশা বল নেশা ছিল—অকসন থেকে প্রতি মাসেই প্রায় নানা ধরনের ফার্নিচার, কার্টলারী ও কিউরিও কেনা আর নতুন ও পুরাতন বই কেনা।

নীচের তলার চারটি ঘরের মধ্যে বাথরুম ও কিচেন বাদ দিয়ে একটি বিরাজের

শয়নঘর, একটি বসবার ঘর নিজস্ব—চারিদিকে আলমারিতে ঠাসা বই, ম্যাগাজিন ও নানা ধরনের বিচিত্র কিউরিও। পাশের ঘরটি ভোজনকক্ষ—ডাইনিং হল। তার পাশের সর্বাপেক্ষা ছোট ঘরটা মাধবের জিম্মায়।

দরোয়ান ও সোফার গেটের পাশে ছোট ঘরটায় থাকে।

বিরাজ তো কখনো দোতলায় যেতেনই না—মাধবও বড় একটা যেত না বিশেষ কোন প্রয়োজন না হলে। দোতলাটা তাই কয়েক বছর ধরে বাসবী ঐ বাড়িতে আসবার পর থেকে তার অধিকারভুক্তই ছিল। তার নিজস্ব এলাকা ছিল যেন বাড়ির দোতলাটা সম্পূর্ণ।

দোতলায় ওঠবার সিঁড়িটা সামনের বারান্দার শেষ পশ্চিমপ্রান্তে—রান্নাঘরের লাগোয়া। পুরাতন আমলের কাঠের চওড়া সিঁড়ি—ঘোরানো কাঠের রেলিং। আগে আগে ঐ সিঁড়ি দিয়ে কেউ উঠলে বা নামলে ধপধপ একটা শব্দ হত। শেষে অকসন থেকে সেলে একটা কার্পেট কিনে এনে বিরাজ সিঁড়িটায় আগাগোড়া বিছিয়ে দিয়েছিলেন ও রেলিংয়ে নতুন করে মেহগনি পালিশ করে দিয়েছিলেন। দামী একটা ডুমওয়ালা ল্যাম্প সিঁড়ির মাথায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।

সিঁড়ির চেহারাটাই যেন বদলে গিয়েছিল তাতে করে। একটা বনেদী আভিজাত্যের ছাপ পড়েছিল যেন। সিঁড়ি দিয়ে কেউ উঠলে বা নামলে আর কোন শব্দ পাওয়া যেত না। সিঁড়ি থেকে বিরাজের ঘরটা বেশ দূরে—কাজেই শব্দ তো দূরে থাক, কেউ সিঁড়ি দিয়ে উঠলে বা নামলে চট্ করে বিরাজের নজর পড়বারও কথা নয়, যদিও রাত্রে সাড়ে নটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত ঘুমোবার সময়টুকু ছাড়া বাদবাকি সময়টুকু বিরাজের বসবার ঘরেই বই ও লেখা নিয়ে কাটে।

বছর দুই ধরে বিরাজ পৃথিবীর এক ইতিহাস রচনায় মগ্ন। পড়াশুনা আর লেখাই ছিল তাঁর বলতে গেলে সর্বক্ষণের রুটিন।

রাত্রে বড় একটা কিছু খান না বিরাজ। খানিকটা মুর্গির সুপ, দুটো হার্ড টোস্ট ও দুটো সন্দেশ। ঐ খাওয়াটুকু সেরে সোজা শয়নকক্ষে প্রবেশ করে একেবারে শয্যায় আশ্রয় নেন। ঘুমিয়ে পড়েন সঙ্গে সঙ্গে প্রায়, কারণ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে আটটা—ঐ সময়টায় নিজের ঘরে বসে বসে দুটো পেগ খাওয়ার অভ্যাস তাঁর দীর্ঘ দিনের। ঐ নেশাই হয়ত তাঁকে ঘুমের জগতে নিয়ে যায়।

ঘুম ভাঙে ঠিক নিয়মিত ভোর চারটেয়। সেজন্য কোন ঘড়ির অ্যালার্মের প্রয়োজন হয় না তাঁর কখনো। দীর্ঘকালের অভ্যাস। উঠে হাতমুখ ধুয়ে ঘরে এসে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই মাধব এক কাপ চা দিয়ে যায় ও সঙ্গে দুটো বিস্কুট।

চা-পানের পর পাইপটা ধরিয়ে বাগানের দিককার খোলা জানালার সামনে বসবার ঘরে আরাম-চেয়ারটার উপর বসেন ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে। অমনি করে বসে থাকেন অনেকক্ষণ।

বাড়ির পিছনের বাগানটা অন্ধকারে তখন সবই অস্পষ্ট। ক্রমশঃ একটু একটু করে শেষরাত্রির অন্ধকার তরল হয়ে আসে—ঝাপসা ঝাপসা আলোয় চোখের সামনে বাগানের গাছগুলো স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হতে থাকে একটু একটু করে যেন।

কাকের ডাক ও পাখীদের ঘুম ভাঙার বিচিত্র সব শব্দ ঝাপসা সেই আলো-আঁধারির ভিতর থেকে ভেসে আসে। চুপচাপ সেই দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন বিরাজ।

জীবনটাই তার বলতে গেলে সেই শুরু থেকেই একক। আত্মীয় নেই বন্ধু নেই স্ত্রী নেই পুত্র কন্যা কেউ নেই—একমাত্র পার্শ্বচর ঐ ভৃত্য মাধব। কিন্তু সত্যিই কি আসেনি কেউই কখনো জীবনে তাঁর? কোন নারী বিশেষ করে?

এসেছিল একজন। হঠাৎ তার একক নির্বান্ধব জীবনে এসেছিল একজন। যে কথা কেউ কখনো জানতে পারেনি—অবিশ্যি একজন ছাড়া। উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ভাগ্যান্বেষণে বর্মামুলুকে পালিয়ে গিয়ে একনাগাড়ে পনের বছর খাটবার পর যখন একটু গুছিয়ে এনেছেন, হঠাৎ মনে হয়েছিল বুঝি এবার একটা বিবাহ করলে মন্দ হয় না। পনের বৎসর যাঁর কোন সন্ধান ছিল না—জীবিত কি মৃত তিনি কেউ জানত না সেই বিরাজ দেশের পথে জাহাজে চেপে বসলেন। ইচ্ছা ছিল একটি মেয়ে দেখে বিবাহ করে আবার বর্মামুলুকে ফিরে যাবেন।

কিন্তু হল না—সব প্ল্যান তাঁর ভেস্তে গেল। জাহাজেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং জাহাজঘাটা থেকে সোজা অ্যাম্বুলেন্সে গিয়ে মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে এক কেবিনে আশ্রয় নিতে হল! দেশে যে ফিরছেন কাউকেই জানাননি, যদিও তখন তাঁর বৃদ্ধ বাপ সরোজমোহন জীবিত কি মৃত তাও তিনি জানতেন না। বনগাঁয় দেশের বাড়িতে পেনসন নিয়ে তাঁর বাপ ঐ সময় অবসর জীবনযাপন করে বছর দুই আগে তখন মারা গিয়েছিলেন। ছোটভাই—একমাত্র ভাই ধীরাজেরও কোন খবরই রাখতেন না বিরাজ। পনের বৎসর আগে যখন হঠাৎ ভাগ্যান্বেষণে জাহাজে চেপে বসেন কাউকে কিছু না জানিয়ে, তৃতীয়বার বি. এ. পরীক্ষায় অকৃত-কার্য হয়ে ধীরাজ সেবারে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ধীরাজ তাঁর থেকে দশ বছরের ছোট। অনেক ছোট বয়েসে।

হাসপাতালে কেবিনে রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে হঠাৎ যেন বিরাজ নিজেকে কেমন অসহায় বোধ করেন। বোধ হয় ঐ সময়টা মৃত্যুভয়ও তাঁকে কেমন ঘিরে ধরেছিল। আর মনের সেই নিঃসঙ্গ অসহায় দুর্বল মুহূর্তে একজনকে তাঁর বাড়ির ঠিকানা ও ধীরাজের নাম দিয়ে একটা সংবাদ পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

বিরাজমোহন জানতেন না ধীরাজ তখন ডাক্তারী পাস করে ঐ হাসপাতালেই হাউস সার্জন। সংবাদ পেয়েই ধীরাজ কেবিনে এসেছিলেন তাঁর দাদার সঙ্গে দেখা করতে। দীর্ঘ পনেরো বছর পরে দুই সহোদরে সাক্ষাৎ—দুজনেরই অনেক পরি-বর্তন হয়েছে। একজন তখন গুছিয়ে নিয়ে অর্থবান—অন্যজন জীবনযুদ্ধে সবে প্রবেশ করেছেন। সামনে তাঁর এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। ভাইয়ের মুখেই শুনলেন বিরাজ অনেকদিন আগেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়েছে।

আপনজনের মধ্যে যে সম্পর্ক বা মেলামেশা থাকলে পরস্পরের ভালবাসা গড়ে উঠতে পারে সে সম্পর্ক তো আর উভয়ের মধ্যে ছিল না, কাজেই কেউ হয়ত কারো প্রতি সেদিন পরস্পর তাঁরা একান্ত আপনজন হওয়া সত্ত্বেও আকর্ষণবোধ করেননি।

তবু আসতেন নিয়মিত কেবিনে ধীরাজ জ্যেষ্ঠের সঙ্গে দিনে অন্ততঃ একটিবার সাক্ষাৎ করতে। দু-চারটা কথাবার্তা হত পরস্পরের মধ্যে।

আর সেই সময়ই ঘটেছিল একটা বিচিত্র ঘটনা। যে নার্সটিকে স্পেশাল নার্স হিসাবে বিরাজ এনগেজ করেছিলেন সেই নার্সটিকে কেন্দ্র করে।

বিরাজের ভাল লেগেছিল নার্সটিকে—তার চেহারা তার কথাবার্তা সব কিছু যেন একটা মোহসঞ্চার করেছিল বিরাজের মনে।

হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বিরাজ একদিন গিয়ে হোটেলে উঠলেন। নার্সটি সেই হোটেলে বিরাজের কাছে যাতায়াত করতে লাগল। সম্পর্ক ক্রমশঃ উভয়ের মধ্যে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগল। বিরাজ একদিন বিবাহের প্রস্তাব করলেন তার কাছে।

সেও রাজি হয়ে গেল।

বিরাজ জানালেন বিবাহ করে দু-চারদিনের মধ্যেই তাঁরা বর্মা চলে যাবেন। সব ঠিকঠাক এমন কি বিবাহের দিন পর্যন্ত।

রেজিস্ট্রীমতেই বিবাহ হবে—এমন সময় একদিন ধীরাজ দাদার সঙ্গে হোটেলে দেখা করতে এলেন। এতদিন বিরাজ ছোট ভাইকে তাঁর বিবাহের ব্যাপারটা বলেন নি, সেদিন অকপটে সব বললেন—কাকে বিবাহ করছেন, কবে বিবাহের দিন স্থির হয়েছে!

ধীরাজ কিন্তু সব শুনে কেমন চুপ করে রইলেন। কোন মন্তব্যই করলেন না। এক সময় চলেও গেলেন তারপর।

পরের দিন সেই মেয়েটি এল না। তারপরের দিনও নয়। চিন্তিত হলেন বিরাজ। ট্যাক্সি নিয়ে ছুটে গেলেন সন্ধ্যায়, সেই মেয়েটি যে নার্সের কোয়ার্টারে থাকত সেখানে। কিন্তু দেখা হল না। পরের দিন সকালে একবার ও বিকেলে একবার গেলেন দেখা হল না। ব্যাপার কি—কোথায় গেল সে!

চতুর্থ দিন উৎকণ্ঠায় যখন বিরাজ প্রায় ভেঙে পড়েছেন—সকালে উঠে সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ যেন তাঁকে স্তম্ভিত করে দিল।

যুগল ফটোর নীচে প্রকাশিত হয়েছে সংবাদটি।

ডাঃ ধীরাজ সান্যাল ও জুনিফারের গতকাল বিবাহ হয়ে গিয়েছে।

নার্সটি ছিল জুনিফার।

অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন সোফাটার উপরে বিরাজমোহন। ব্যাপারটা তার কাছে কেবল কল্পনাতীতই নয়, রীতিমত দুর্বোধ্যও। সারাটা দিন বলতে গেলে ঝিম দিয়ে বসে রইলেন বিরাজমোহন। তারপর সন্ধ্যার দিকে হোটেলের ওয়েটারকে ডেকে এক বোতল হুইস্কি আনালেন।

সারাটা রাত্রি ধরে মদ্যপান করলেন। পরের দিন বেলা দেড়টা পর্যন্ত নেশার ঘোরে ঘুমোলেন। এবং তার পরের দিনই জাহাজে উঠে বসলেন। কতই বা বয়স তখন বিরাজের—বছর তেত্রিশ-চৌত্রিশ।

সেই যে বর্মামুলুকে আবার ফিরে গিয়েছিলেন বিরাজ—ফিরলেন তারপর

দীর্ঘ সতের বছর পরে পঙ্গু হয়ে।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে আরাম-কেদারাটার উপর বসে সামনের আলোছায়াভরা বাগানটার দিকে চেয়ে ঐসব অতীত স্মৃতিরই রোমন্থন করতেন বিরাজমোহন।

সেই জুনিফারেরই মেয়ে ঐ বাসবী।

জুনিফারের সঙ্গে আবারও দেখা হয়েছিল বিরাজমোহনের। দীর্ঘ আট বছর পরে জুনিফারই তাঁর রেঙ্গুনের মার্চেণ্ট স্ট্রীটের বাড়িতে দেখা করতে এল। বয়স তখন জুনিফারের তেত্রিশ-চৌত্রিশ তো হবেই, কিন্তু দেহে যৌবন যেন তখনও অটুট আছে—রূপের আকর্ষণও আছে।

সন্ধ্যাবেলা গৃহে ফিরে স্নান সেরে দোতলার টেরাসে মদের গ্লাস নিয়ে বসা বিরাজের নিত্য অভ্যাস ছিল। রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত বসে বসে মদ্যপান করতেন, তারপর ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়তেন। সেদিনও তেমনি টেরাসে বসে মদ্য-পান করছেন, ভৃত্য মাধব এসে বললে, একজন মেমসাহেব দেখা করতে এসেছেন।

ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালেন বিরাজ ভৃত্যের মুখের দিকে, এসময় কি কারো সঙ্গে আমি দেখা করি যে বলতে এসেছিস ?

আজ্ঞে সাহেব বলেছিলাম কিন্তু উনি কিছুতেই যাবেন না।

যাবেন না !

না। বলছেন দেখা করে তবে যাবেন। বলছেন তাঁর নাম করলেই আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন।

Nonsense !

তাহলে কি করব সাহেব ?

বলবি যে দেখা হবে না—যা !

মাধব ফিরে যাচ্ছিল, হঠাৎ দরজার কাছ থেকে নারীকণ্ঠে ডাক ভেসে এল, বিরাজ, আমি জুনিফার !

কে ?

ভূত দেখার মতই যেন চমকে উঠেছিলেন বিরাজ।

আগন্তুক আরো দুপা এগিয়ে এল, আমি জুনিফার। চিনতে পারছ না আমায় ?

মাধব !

আজ্ঞে ?

তুই যা—

মাধব একটু যেন বিস্মিত হয়েই চলে গেল। এমনটা ইতিপূর্বে বড় একটা ঘটেনি। জুনিফার আরো কয়েক পা এগিয়ে এল। মৃদু গলায় বললে, বিরাজ, আমি জুনিফার—চিনতে পারছো না আমাকে ? যদিও it's an age—তাহলেও আমাকে যে তুমি ভুলতে পার না তা জানি।

বিরাজ তখনো চেয়ে আছেন জুনিফারের দিকে। হঠাৎ জুনিফার রেঙ্গুনে—ব্যাপারটা যেমন বিস্ময়কর তেমনি বুঝি অভাবিত ! কোথা থেকে এল সে রেঙ্গুনে

আর কেমন করেই বা এল ? সঙ্গে কি ধীরাজও আছে ? অবিশ্যি এই আট বছর, শেষবার কলকাতা ছাড়বার পর থেকে ওদের আর কোন সংবাদই রাখেননি বিরাজ। তারাও দেয়নি কোন সংবাদ।

বিরাজকে চুপ করে থাকতে দেখে জুনিফার আবার প্রশ্ন করে, Hallo ! Can't you recognise me ? সত্যি-সত্যিই কি তুমি আমাকে চিনতে পারছ না বিরাজ ?

চিনতে পারব না কেন ? এতক্ষণে কথা বললেন বিরাজ, কিন্তু তুমি এখানে ?

খুব আশ্চর্য লাগছে বোধ হয় !

তা লাগবারই কথা।

Well—Well—তা আশ্চর্য হবে বইকি—বলতে বলতে বিরাজের মুখোমুখি খালি যে বেতের চেয়ারটা পড়েছিল এগিয়ে এসে জুনিফার সেই চেয়ারটায়ই বসে পড়ে। পরনে তার গাউন, মাথার চুল বব করা, ঠোঁটে গালে উগ্র প্রসাধনের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

May I have a drink, বিরাজ ? মৃদু হেসে কথাটা বলে জুনিফার বিরাজের দিকে সতৃষ্ণনয়নে তাকালো, feeling so awfully thirsty !

বিরাজ কোন কথা না বলে মাধবকে ডাকলেন, মাধব ?

মাধব যায়নি। দরজার গোড়াতেই আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। প্রভুর ডাকে সাড়া দিল, সাহেব !

একটা গ্লাস দিয়ে যা।

একটু পরে মাধব একটা গ্লাস এনে টেবিলটার উপর নামিয়ে রেখে চলে গেল। বিরাজ ওর দিকে তাকিয়ে বললে, Soda or water ?

কিছু না—এমনিই দাও।

বিরাজ আবার বিস্মিত হন। জুনিফার ড্রিংক করে কি না জানতেন না, জানবার সুযোগ হয়নি প্রথম পরিচয়ে—তথাপি তিনি আর কোন কথা না বলে গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে এগিয়ে দিলেন।

জুনিফার গ্লাসটা তুলে, cheers বলে লম্বা একটা চুমুক দিল। আঃ, really it is delicious ! তুমি খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছ সত্যিই বিরাজ হঠাৎ এভাবে আমাকে তোমার বাড়িতে আসতে দেখে বুঝতে পারছি। মালয় থেকে আজই সকালে এখানে এসে পেঁাচেছি—এখানকার Convent-এর হাসপাতালে চাকরিটা পেয়ে যাব মনে হচ্ছে।

চাকরি ?

হ্যাঁ, চাকরি—মেট্রনের পোস্ট। তা তোমার তো এখানে নিশ্চয়ই খুব influence আছে—তুমি যদি একটু চেষ্টা কর—

I am sorry, জুনিফার। বিরাজ শান্ত গলায় কথাটা বললেন।

বলবে না ?

না। জীবনে কখনো ঐ কাজটা আজ পর্যন্ত নিজের জন্যে বা পরের জন্যে

করিনি।

আমার জন্যেও পারবে না ?

না। তা হঠাৎ তোমার চাকরিরই বা কি এমন প্রয়োজন হল ?

জুনিফার ইতিমধ্যে এক পেগ নীট্ হুইস্কি শেষ করে নিজেই দ্বিতীয় পেগ ঢেলে বার দুই চুমুক দিয়েছিল, বিলোল কটাক্ষে জুনিফার তাকালো বিরাজের দিকে, না হলে চলবে কি করে ?

কেন, ধীরাজ কি practice করে কিছুই পায় না ?

Ah ! Don't talk about ধীরাজ—that brute—

জুনিফারের কথায় হঠাৎ যেন অন্ধকারে একটা আলোর ঝলক দেখা দেয়। তবে কি ধীরাজের সঙ্গে জুনিফারের সেপারেশন বা ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে ! তবু কেন যেন কেমন সংকোচ বোধ করেন বিরাজ—কথাটা স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞাসা করতে পারেন না। কতকটা ঘুরিয়েই প্রশ্ন করেন, ধীরাজও কি তোমার সঙ্গে এখানে এসেছে ?

ধীরাজ ! Why—সে কেন আসতে যাবে ? আমি আর আমার মেয়ে লুসি এসেছি।

তাহলে ধীরাজ কোথায় ?

In the hell—

দ্বিতীয় পেগও ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল, জুনিফার তৃতীয় পেগ নীট্ হুইস্কি ঢেলে নিল গ্লাসে।

You are drinking too much, জুনিফার ! বিরাজ বললেন।

Don't worry—I won't be flat ! জুনিফার চুমুক দিল আবার গ্লাসে।

মনে হচ্ছে ধীরাজের সঙ্গে তোমার বোধ হয় কোন গোলমাল হয়েছে ! মৃদু গলায় বিরাজ বললেন।

গোলমাল ! গোলমাল আবার কি ? আমাদের অনেকদিন সেপারেশন হয়ে গিয়েছে।

ডিভোর্স ?

না, ডিভোর্স হল না—সেপারেশন। যাক গে, মরুক গে—after all I got rid of him !

॥ পাঁচ ॥

কিছুক্ষণ অতঃপর কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে রইলেন বিরাজ, তারপর অত্যন্ত শান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন, কবে হল ?

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর জুনিফার জবাব দিল একটা সিপ নিয়ে, তা সাড়ে ছ বছর হল।

মানে বিয়ের বছর দেড়েক পরেই ?

হ্যাঁ। তখন কি জানতাম ও একটা ব্রুট—uncultured—হৃদয়হীন পশু! কোন ভদ্র মেয়েই ওর সঙ্গে একসঙ্গে ঘর করতে পারে না।

ধীরাজ এখন কোথায় জান ?

কে জানে!

কোথায় তোমাদের ছাড়াছাড়ি হল ?

ও তখন ধবলগিরিতে—সেই সময়। বিয়ের পরই আমরা মহীশূর স্টেটে চলে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে যাবার পর এক মাসও গেল না—একটু একটু করে ওর মুখোশ খুলে যেতে লাগল—ওর আসল সত্যিকারের চেহারাটা প্রকাশ পেতে লাগল। তখন—তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম তোমাকে বাদ দিয়ে ওকে বেছে নিয়ে কি ভুলই আমি করেছি—what a blunder I did বলতে বলতে জুনিফার চেয়ারটার উপর যেন দেহটাকে তার এলিয়ে দিল। অসহায়ভাবে তার মাথাটা এদিক ওদিক করে।

বিরাজ! ভেজা-ভেজা গলায় ডাকে জুনিফার।

কি ?

ওকে ছেড়ে এক নেভাল অফিসারের সঙ্গে চলে গেলাম সিলোন—মিঃ কুলকারণী—a nice Chap—at least প্রথমে তাই মনে হয়েছিল, কিন্তু বছর না ঘুরতেই বুঝলাম কুলকারণীও এক worthless creature!

So—তাকেও ছাড়লে, তাই না ?

Well it was inevitable—what else could I do!

হুঁ। তারপর ?

চলে এলাম মালয়ে, সেখানে এক রাবার প্ল্যাণ্টারের সঙ্গে পরিচয় হল—মিঃ গিবসন—a nice gentleman! যদিও বয়স তখন তার পঞ্চাশোর্ধ্বে—a widower—সে সত্যিই আমাকে রানীর মত রেখেছিল তিনটে বছর, কিন্তু সে মরে গেল। How cruel of him—মরে গেল! জানো মরে গেল—বলতে বলতে হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে জুনিফার।

বিরাজ বুঝতে পারেন বেশ নেশা হয়েছে জুনিফারের।

বিরাজ নিঃশব্দে ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন। বুঝতে পারেন প্রচণ্ড নেশার ঘোরে ও বেসামাল হয়ে পড়েছে।

জুনিফার!

বল darling—

রাত অনেক হল, যাবে না ?

যাব! কোথায় যাব ?

তোমার ঘরে—বাড়িতে।

ঘরবাড়ি আমার কি কিছু আছে darling! তাই তো তোমার কাছে চলে এলাম।

আমার কাছে ?

হ্যাঁ, আমার জীবনের সব চাইতে বড় ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে। সত্যি তোমার ঘরে পেঁাছে গিয়েছি, আজ আমি নিশ্চিন্ত। আঃ—বলতে বলতে চোখ বুজল জুনিফার আবার শোফার উপরে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে।

কোথায় উঠেছ ? আবার প্রশ্ন করেন বিরাজ।

কোথায় আর উঠব, হোটেলে—

চল, ওঠ—গাড়িতে করে আমার ড্রাইভারকে বলছি তোমায় পেঁাছে দিতে—চল—

No no—you won't be so cruel !

ওঠো জুনিফার—অনেক রাত হয়েছে। বলতে বলতে চেয়ারটা থেকে উঠে এগিয়ে গিয়ে বেলটা বাজান বিরাজ !

মাধব জেগেই ছিল। সাহেব এখনো ডিনার খাননি।

মাধব তাড়াতাড়ি দরজার সামনে ছুটে এল, আমাকে ডাকছেন সাহেব ?

মংপুকে বল গাড়ি বের করতে।

আপনি এখন বেরুবেন ?

না। ঐ মেমসাহেবকে হোটেলে পেঁাছে দেবে।

গাড়ি বের করতে বলে বাবুর্চিকে বলব টেবিলে আপনার ডিনার দিতে ?

না, এখন থাক।

তাড়াতাড়ি ঐ সময় জুনিফার বলে ওঠে জড়িত গলায়, বল না darling ডিনার দিতে—am feeling so hungry—যাও টেবিলে ডিনার দিতে বল। কথাটা শেষ করলো জুনিফার মাধবের দিকে তাকিয়ে।

মাধব কি করবে বুঝে উঠতে পারে না। সাহেবের মুখের দিকে তাকায়। বেচারী যেন কেমন থতমত খেয়ে গিয়েছে।

ঠিক আছে, তুই ওর খাবার দিতে বল্ বাবুর্চিকে টেবিলে। বিরাজ বলেন।

আপনার ?

না। ওর খাওয়া হয়ে গেলে ওকে যেন মংপু হোটেলে পেঁাছে দেয় গাড়ি করে।

মাধব চলে গেল। বিরাজও আর দাঁড়ালেন না—ঘর থেকে বেরুবার জন্য দরজার দিকে এগিয়ে যান।

তুমি খাবে না বিরাজ ? জুনিফার জিজ্ঞাসা করে।

না।

তবে আমিও খাব না।

তুমি যে বলেছিলে ক্ষিধে পেয়েছে তোমার !

তা হোক। কিন্তু সত্যিই কি তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ—জুনিকে তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ ?

তাড়িয়ে দিচ্ছি না। তবে—

কি তবে ?

এখানে তোমার থাকা হতে পারে না।

কেন ?

সে কথার জবাব না দিয়ে বিরাজ বলেন, কথাটা নাই বা শুনলে।

না, আমি শুনব—তুমি বল।

তুমি আজ সব ভুলে গেলেও আমি ভুলতে পারি না যে একদিন তুমি ধীরাজের স্ত্রী ছিলে। ধীরাজ আমারই ভাই—

কিন্তু সে তো কবেই আমাদের সেপারেশন হয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে আমার আজ কোন সম্বন্ধই নেই।

তোমার তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আজ আর না থাকতে পারে, কিন্তু আমার সম্পর্ক আছে তার সঙ্গে আজও।

ওঃ I see ! তা বেশ তো—থাকলেই বা—

আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে জুনিফার, আমি যাই। আবার যাবার জন্য পা বাড়ান বিরাজ।

দাঁড়াও বিরাজ। তাহলে কি আমি বুঝব সেদিন আমার প্রতি তোমার যে ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছিল সব মিথ্যে ?

ওসব কথা থাক জুনিফার।

না, কথাটা আমি জানতে চাই। জানতে চাই—

কি জানতে চাও ? বিরাজ তাকালেন জুনিফারের মুখের দিকে।

তুমি কি সত্যিই আমাকে চাও না ?

তুমি আমার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী—

Hang your ছোট ভাইয়ের স্ত্রী ! Don't talk that nonsense any more !

মাধব দরজার বাইরে থেকে ঐ সময় জানাল, টেবিলে মেমসাহেবের খানা দেওয়া হয়েছে।

যাও তোমার dinner দিয়েছে। শোন জুনিফার, তোমার যদি টাকাপয়সার দরকার থাকে তো বল। মনে হচ্ছে টাকাপয়সা তোমার বিশেষ নেই—

থাকবে কোথা থেকে—হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল জুনিফার, কে আর আজ আমার আছে যে আমাকে সাহায্য করবে ! তাছাড়া আমার মেয়ে ঐ লুসি—তখনই ভুল হয়েছিল আমার তাকে জোর করে তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে—I was a fool !

লুসি ধীরাজের মেয়ে ?

তবে আর কার ?

ঠিক আছে—তার যাবতীয় expense এবার থেকে আমিই বহন করব। তবে একটা শর্ত আছে—

শর্ত !

হ্যাঁ, প্রথমতঃ কোন দিন তাকে আমার কথা বলতে পারবে না। আর এখানে

মানে রেঙ্গুনে তুমি থাকতে পারবে না।

তবে কোথায় যাব ?

যেখানে তোমার খুশি যেতে পার। Why not go back to Calcutta !

কোথায় যাব বললে ? কোলকাতায় ?

হ্যাঁ। সেখানে তুমি একটা nursing-এর কাজও পেতে পারবে আর লুসিকেও কোন একটা ভাল স্কুলে ভর্তি করে দিতে পারবে। তার খরচ প্রতি মাসে ব্যাঙ্ক মারফত যাতে যায় তার পাকাপাকি ব্যবস্থা আমি একটা করে দেব কালই আমার সলিসিটরকে দিয়ে।

বেশ। তাই যদি তোমার ইচ্ছা হয় তো তাই হবে—

যাও তুমি খেয়ে নাও গিয়ে। আমি আজ তোমাকে কিছু টাকা দিচ্ছি—কাল যেমন করে পার রেঙ্গুন শহর ছেড়ে তুমি চলে যাবে। ধীরাজের মেয়ের ব্যবস্থা আমি করব।

আর দাঁড়ালেন না বিরাজ, ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

মাধব এগিয়ে এল, খানা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে মেমসাব !

হ্যাঁ, চল।

মিনিট পনের পরে হাতে একগোছা নোট নিয়ে বিরাজ টাকাটা জুনিফারকে দেবার জন্য যখন ডাইনিং-রুমে এসে ঢুকলেন, দেখলেন জুনিফার একটা রাক্ষসীর মত যেন খেয়ে চলেছে। সামনের প্লেটে স্তূপাকার বীরিয়ানি—এক বাটি মাংস শেষ করেছে, আর এক বাটি নিয়েছে। একটা হাড় চিবোচ্ছে। চারপাশে মাংসের হাড় ও ভাত ছিটানো। মুখময় মাংসের ঝোল লেগে আছে।

বিরাজকে ঘরে ঢুকতে দেখে জুনিফার মুখ তুলে তাকালো, সত্যি, তোমার বাবুর্চিটা খুব চমৎকার রাঁধে—delicious !

জুনিফারের মুখের চেহারা ও খাবার ভঙ্গি দেখে বিরাজের সারাটা শরীর যেন কেমন ঘিনঘিন করে ওঠে। ওর খাওয়া দেখে বিরাজের মনে হয় যেন ও কতকাল খায়নি পেট ভরে। মাধবও অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিল। দরজার ওপাশে বাবুর্চিও দেখছিল খাওয়া।

মাধবের দিকে তাকিয়ে জুনিফার বললে, কেয়া নাম তোমারা ?

মাধব।

আউর থোড়া মাংস লাও !

দ্বিতীয় বাটিটাও জুনিফার তখন প্রায় শেষ করে এনেছে। মাধব নিঃশব্দে চলে গেল।

এই টাকাটা রাখ জুনিফার—এতে হাজার দুই আছে। কলকাতা পেঁছে সংবাদ দিলে ধীরাজের মেয়ের নামে মাসে মাসে টাকা যাবে—তার জন্যে তোমাকে আর ভাবতে হবে না। বলতে বলতে নোটের গোছাটা সামনের টেবিলের উপরে নামিয়ে রাখলেন বিরাজ।

যেন এক প্রকার ছোঁ মেরেই নোটগুলো তুলে নিল জুনিফার। এবং নোট-

গুলো হ্যান্ডব্যাগে ভরে আবার মাংস চিবুতে চিবুতে বললে, থ্যাংক উ—থ্যাংক উ—really you are sweet বিরাজ !

জুনিফারের সমস্ত মুখময় মাংসের ঝোল লেগে আছে—অত্যধিক নেশায় মুখটা লাল থমথমে—মাথার চুল এলোমেলো। সন্ধ্যার সেই সযত্ন প্রসাধনের কিছুমাত্র যেন আর অবশিষ্ট নেই কোথায়ও।

আবার যেন বিরজের সারাটা দেহ ঘিনঘিন করে ওঠে।

বিরাজ ডাইনিং রুম থেকে বের হয়ে যান।

সোজা নিজের ঘরে এসে ঢোকেন। একটা চেয়ার ছিল একপাশে, সেটার উপরে বসে পড়েন।

আধ ঘণ্টা পরে মাধব তাঁর ঘরের দরজার ওপাশ থেকে ডাকল, সাহেব !

কি রে মাধব ? চলে গেছে মেমসাহেব ?

মেমসাহেব তো বাথরুমে মুখ ধুতে গিয়ে বমি করে কেমন হয়ে গিয়েছেন।

কি হল আবার ?

বাথরুমের মেঝের উপরই পড়ে আছেন বমির মধ্যে—যেতে পারবেন বলে তো মনে হচ্ছে না !

বিরাজ ততক্ষণে চেয়ার থেকে উঠে দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন।

অজ্ঞানটজ্ঞান হয়ে যায়নি তো ?

হয়ত তাই সাহেব—

চল দেখি !

দোতলার বাথরুমের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন বিরাজ। মাধব মিথ্যা বলেনি—বাথরুমের ঝকঝকে ইটালিয়ান টাইল্‌স্‌য়ের মেঝের উপর বমি করে ভাসিয়ে তার উপরেই কাত হয়ে পড়ে আছে জুনিফার। অজীর্ণ খাদ্যবস্তু ও অ্যালকহলের গন্ধে নাক জ্বালা করে ওঠে বিরাজের। মরে যায়নি তো—মনে মনে ভাবলেন। তারপর ঝুঁকে পড়ে নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখেন, না—নিশ্বাস পড়ছে।

মাধবের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, পা দুটো তুই ধর দেখি, আমি মাথাটা ধরছি—পাশের ঘরে নিয়ে চল্‌।

পাশের ঘর মানেই গেস্ট রুম।

কোন গেস্ট কদাচিৎ কখনো এলে বিরাজ তার ব্যবস্থা ঐ ঘরেই করতেন। দুজনে ধরাধরি করে এনে পাশের ঘরে শয্যার উপর শুইয়ে দিলেন। মাধবকে এক জাগ ঠাণ্ডা জল আনতে বললেন। মাধব চলে গেল।

জামার বোতামগুলো খুলে দিলেন বিরাজ, ঘরের ফ্যানটা ফুল স্পিডে চালিয়ে দিলেন। অসহ্য দুর্গন্ধে নাক জ্বালা করে বিরাজের। সেই সঙ্গে ঘৃণা জুনিফারের প্রতি তাঁর মনটাকে যেন ভারি করে তোলে।

মাধব জল নিয়ে এল। সেই জল চোখেমুখে দিতে কিছুক্ষণ পরে জুনিফার চোখ মেলল, আমি কোথায় ?

এখনও তুমি আমার বাড়িতেই আছ। এখন একটু ভাল বোধ করছ কি ?

হ্যাঁ।

যেতে পারবে ?

কোথায় ?

তোমার হোটেলে ?

পারব বোধ হয়। বলতে বলতে জুনিফার উঠে বসবার চেষ্টা করে, কিন্তু তার মাথাটা তখনো যেন ঘুরছে—কেমন টলে পড়ে।

ধরব ?

না না—আমি ঠিক আছি—

জুনিফার গায়ের জামা ঠিক করে উঠে বসে—তারপর উঠে দাঁড়াল।

মাধব এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে প্রশ্ন করেন বিরাজ, মংপু গাড়ি বের করেছে ?

হ্যাঁ।

যাও—নীচে গাড়ি আছে। বিরাজ বললেন।

জুনিফার ঘর থেকে বের হয়ে গেল শিথিল পায়ে। বিরাজ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন।

জুনিফার যে কোন্ হোটেলে উঠেছে বিরাজ জানতেন না—জানবার চেষ্টাও করেন নি। মাসখানেক পরে কলকাতার একটা ঠিকানা পেলেন—জুনিফার কলকাতায় রয়েছে। সেই থেকেই লুসি সান্যালের নামে টাকা গিয়েছে মাসে মাসে তিনশত করে।

অনেকগুলো বছর তারপর পার হয়ে গিয়েছিল। বিরাজ টাকা পাঠানো বন্ধ করেন নি—নিয়মিত মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে গিয়েছেন। তারপর একদিন কলকাতায় ফিরে পঙ্গু অবস্থায় হঠাৎ কি খেয়াল হল মাধবকে লুসির কলকাতার ঠিকানায় তার খোঁজ নিতে পাঠালেন। কিন্তু মাধব সন্ধ্যায় ফিরে এসে যা বলল তাতে তিনি রীতিমত বিস্মিতই হলেন।

॥ ছয় ॥

লুসি বা জুনিফার নামে নাকি ঐ ঠিকানায় কেউ নেই—কেউ থাকে না।

সে কি রে! ভাল করে খোঁজ নিয়েছিলি তো ?

আজ্ঞে। ফিরিঙ্গী পাড়া—একটা মস্ত বড় পুরনো ফ্ল্যাট-বাড়ি যে ঠিকানা দিয়েছিলেন সেটা—ঐ নামের খোঁজ করতে এক বুড়ী মেমসাহেব বের হয়ে এল, সে বললে, তারা নাকি অনেকদিন আগেই ও বাসা ছেড়ে চলে গিয়েছে।

চলে গিয়েছে ?

হ্যাঁ। বছর চারেক আগে মেয়ে চলে যায়, তারপর তার মা বছর দুই হল চলে গিয়েছে। তবে প্রত্যেক মাসে ঐ মা এসে নাকি ঐ বুড়ীর কাছ থেকে চেকটা

নিয়ে যায়।

তা সে বুড়ী জানে না তাদের এখনকার ঠিকানা ?

না, বুড়ী বলতে পারল না।

হুঁ, ঠিক আছে—তুই যা।

মাধব চলে গেল। পরের দিনই ব্যাঙ্কে একটা চিঠি দিয়ে বিরাজ ইনস্ট্রাকশন দিলেন যে ঠিকানায় মাসে মাসে চেক যেত সেখানে আর চেক পাঠাতে হবে না।

বিরাজ ভেবেছিলেন চেক পাঠানো বন্ধ হলে হয়ত জুনিফার বা লুসি শেষ পর্যন্ত তাঁর কলকাতার ঝাউতলার বাড়িতে এসে খোঁজ করবে, কিন্তু দু মাস চলে গেল কেউ এল না।

তারপরই হঠাৎ একদিন ধীরাজের আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদটা পেলেন বিরাজ-মোহন। বাসবীকে গিয়ে নিয়ে এলেন।

লুসির বা জুনিফারের এই এতগুলো বছরে আর কোন খবরই পাননি।

ক্রমশ তাদের কথা বুঝি ভুলেই গিয়েছিলেন। তারপর একদিন ঐ বাসবীর মৃত্যু। বাসবীর মৃত্যুর দিন চারেক পরে।

সন্ধ্যার দিকে নিজের ঘরে পেগ নিয়ে বসেছেন বিরাজ, মাধব এসে ঘরে ঢুকল, সাহেব !

কি ?

এক বোরখা-পরা মুসলমান মহিলা এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

বোরখা-পরা মুসলমান মহিলা ?

হ্যাঁ, সাহেব !

বিস্মিত হয়ে ভাবেন বিরাজ, কে আবার তার সঙ্গে বোরখা-পরা মুসলমান মহিলা এল দেখা করতে !

এমন কাউকে জানেন বলেও তো মনে পড়ছে না !

মাধব আবার প্রশ্ন করে, কি বলব সাহেব ?

যা, পাঠিয়ে দে।

এই ঘরে ?

হ্যাঁ।

একটু পরেই মাধবের পিছনে পিছনে কালো রেশমী বোরখায় আবৃত এক নারী তাঁর ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল।

কোথা থেকে আসছেন আপনি ? আমার সঙ্গে আপনার কি দরকার বলুন তো ? বিরাজ প্রশ্ন করেন।

আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আপনার চাকরকে ঘর থেকে যেতে বলুন।

মাধবের দিকে তাকালেন বিরাজ। মাধব ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বলুন ?

নারীমূর্তি এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল।

দরজা বন্ধ করলেন কেন ?

আমাদের কথার মাঝে কেউ এসে পড়ে আমি চাই না, বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে সামনের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল সে এবং বসেই সে মুখ থেকে বোরখাটা তুলে দিল।

বোরখা তোলার সঙ্গে সঙ্গেই যেন বিরাজ ভূত দেখবার মত চমকে ওঠেন। এ কি—কে—কাকে তিনি দেখছেন! বিরাজ কি জেগে আছেন না ঘুমিয়ে আছেন ? বিরাজ একেবারে অভিভূত, বোবা। তাঁর অজ্ঞাতেই যেন কণ্ঠ হতে অর্ধস্ফুটভাবে উচ্চারিত হল, বাসবী!

মেয়েটি তখন বললে, আমি জানি ভুল আপনি করবেন। আপনার বাড়ির আর সকলেও হয়ত ভুল করবে তাই বোরখায় ঢেকে এসেছি নিজেকে। আমি বাসবী নই—

আশ্চর্য! অবিকল তুমি যেন বাসবী! বিরাজ এবারে বললেন।

হ্যাঁ, একই রকম দেখতে আমরা। আমি নিজেও মাসকয়েক আগে মার্কেটে দূর থেকে বাসবীকে দেখে আপনার মত আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পারলাম ব্যাপারটা।

কে তুমি ?

আমি লুসি।

লুসি!

হ্যাঁ, বাসবীর যমজ বোন আমি।

বাসবীর যমজ বোন ?

হ্যাঁ।

কিন্তু সে তো কখনও আমাকে বলেনি যে তার কোন যমজ বোন ছিল! তাছাড়া এখানে আসবার পর আমাকে ধীরাজ যে চিঠি লিখেছিল, তার মধ্যেও তো সেরকম কোন কথা সে লেখেনি ?

লেখেননি!

না। অবিশ্যি সে চিঠিতে তার মেয়ে বাসবীর কথাও কিছু লেখেনি। তোমার কথা অবিশ্যি জানতাম আমি—ভেবেছিলাম তোমরা দুই বোন—

কিন্তু আমাদের মা—তিনিও আপনাকে কিছু জানাননি ?

না। তারপর একটু থেমে বিরাজ বললেন, আশ্চর্য রকমের মিল তোমাদের মধ্যে। বাসবী যদি কয়েকদিন আগে না মারা যেত, হয়ত বাসবী বলেই তোমাকে আমি মনে করতাম। কিন্তু—

আমরা দুই যমজ বোনই জন্মেছিলাম। রুসি আর লুসি মা আমাদের নাম রেখেছিলেন, বাবা ডাকতেন অবিশ্যি আমাদের ছোটবেলায় দুই বোনকে অন্য নামে—বাসবী ও মানসী। তারপর একটু থেমে লুসি বললে, মা যখন বাবাকে ছেড়ে চলে যান তখন আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান, আর বাসবী বাবার কাছে থাকে—

কিন্তু তার কোন প্রমাণ আছে ?

প্রমাণ !

হ্যাঁ, তুমি যে বাসবীরই যমজ বোন—

আছে।

আছে ? কি প্রমাণ ?

লুসি তখন জামার ভেতর থেকে একটা খাম টেনে বার করল। খামের ভিতর থেকে বের করল একটা অনেকদিন আগেকার লালচে-হয়ে-যাওয়া ফটো। ফটোটা বিরাজের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে লুসি বললে, এই ফটোটা দেখুন। এটা ছাড়া আর কোন প্রমাণ আপাততঃ আমার কাছে নেই। প্রমাণ দেবার মতও আর কিছু আমার নেই। ফটোটা মার অ্যালবাম থেকে একদিন আমি খুলে নিয়েছিলাম—মা জানত না।

ফটোটা হাতে নিলেন বিরাজ।

ফটোর মধ্যে জুনিফারকে চিনতে কষ্ট হয় না বিরাজের। জুনিফারের কোলে বসে দুটি ডলের মত মেয়ে।

খুব শিশু বয়সের ফটো।

বছরখানেক হবে হয়ত তখন ওদের বয়স। সেই এক বছরের ফটো দেখে আজকের তরুণী বাসবী বা লুসিকে চেনা বেশ অসম্ভব বলাও চলে একপ্রকার, তবে জুনিফারকে চেনা যাচ্ছে ঠিকই। অনেকক্ষণ ধরে তবু দেখলেন ফটোটা বিরাজ। তার পর ফটোটা নিঃশব্দে লুসির হাতে ফিরিয়ে দিলেন একসময়।

লুসি ফটোটা আবার খামের মধ্যে ভরে জামার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল।

বিশ্বাস হয়েছে এখন আপনার জেঠামণি যে আমরা যমজ বোন ছিলাম ? লুসি প্রশ্ন করে।

লুসির প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন বিরাজমোহন। মৃদু গলায় প্রশ্ন করলেন এবারে, তোমার মা জুনিফার কোথায় ?

লুসি কোন জবাব দেয় না, মাথাটা নীচু করে থাকে।

জান না ?

সে বেঁচে আছে কিনা তাও জানতাম না দু'দিন আগে পর্যন্ত, কারণ দীর্ঘ এগারো বছর তার সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎও হয়নি। সে কোথায় কি ভাবে আছে—বেঁচে কি মরে, তাও জানতাম না।

তুমি তাহলে এতদিন কোথায় ছিলে ?

বেলঘরিয়ায় আমি ছিলাম কিছুদিন আগে পর্যন্তও—

বেলঘরিয়ায় ?

হ্যাঁ। সেখানে সেণ্ট মেরিস নামে যে কনভেণ্টটা আছে সেখানেই মানুষ হয়েছি আমি—আপনারই দয়ায়, অনুগ্রহের অর্থে। পাস করে সেখানেই আমি চাকরি পাই টিচারের।

বিরাজ আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। অতঃপর কি বলবেন, কি বলা উচিত যেন কিছুই বুঝতে পারেন না। লুসিও কোন কথা বলে না, চুপ করে

বসে থাকে।

কেন এসেছ তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে? বাসবী মরে গিয়েছে তাই কি আমার সম্পত্তির লোভে এসেছ?

লুসি হাসল, না।

তবে?

লুসি বললে, আপনার সম্পত্তির উপরে আমার কোন লোভ নেই জেঠামণি। এখানে আজ আসতেও পারতাম না, যদি না সেদিন হঠাৎ অবিকল ঠিক আমারই মত দেখতে বাসবীকে মার্কেটে দেখে চমকে উঠে তার খোঁজ করতে গিয়ে আপনার এই বর্তমান ঠিকানা জানতে পারতাম। আপনার দয়া না পেলে আমি বাঁচতাম না—আপনার দয়ায় বেঁচেছি। যা পাই টিচারী করে আমার তাতে স্বচ্ছন্দেই কেটে যায়—

তবে কেন এসেছ?

বলব বলেই তো এসেছি সে কথাটা—

বাসবীর মৃত্যু সংবাদ তুমি কবে পেয়েছ?

সংবাদপত্রে পরের দিনই।

হুঁ। তা কেন এসেছ বল তো?

দীর্ঘ এগারো বছর পরে গতকাল সন্ধ্যায় মার সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়েছে—

তোমার মা জুনিফার আজও বেঁচে আছে তাহলে?

হ্যাঁ, বেঁচে আছে বটে—তবে তাকে বাঁচা না বলাই ভাল।

কেন?

মার কথা—সন্তান আমি, বলতে লজ্জা হচ্ছে, বলতে বলতে একটু চুপ করে থেকে লুসি পুনরায় বলতে থাকে, মা বরাবরই জ্ঞান হওয়া অবধি দেখেছি যেমন উচ্ছৃঙ্খল তেমনি লোভী, তেমনি জঘন্য চরিত্রের। তার গর্ভে জন্মেছি ভাবতেও কথাটা আমার লজ্জা হয়। জানি না আমাদের বাবা কেমন ছিলেন—

তোমাদের বাবা ছিল আদর্শ পুরুষ।

সেটা পরবর্তীকালে বয়স হবার পর, বুঝতে শিখবার পর আমি অনুমানই করেছিলাম—আর তাইতেই হয়ত মনে হয়েছিল আমাদের মা ও বাবার মধ্যে সেপারেশন হয়ে গিয়েছিল বোধ হয় মার চরিত্রের জন্যই! কোন স্বামীর পক্ষেই অমন স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করা সম্ভবপর নয়।

লুসি থামল। বিরাজ চুপ করে থাকেন কিছুক্ষণ, তারপর একসময় আবার প্রশ্ন করেন, তোমার মা এখন কোথায়?

কলকাতাতেই আছে। আপনি তাকে কতটুকু জানেন জানি না—মেয়েমানুষ যে অত মদ খেতে পারে মাকে না দেখলে কোনদিনই আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না। আপনার প্রেরিত অর্থ সব আপনার নির্দেশ অনুযায়ী আমার কনভেণ্টের প্রিন্সিপ্যালের হাতেই যেত। মা তার থেকে কোনদিন একটা

কপর্দকও পায়নি। প্রিন্সিপ্যাল দিতেন না। ব্যাঙ্কের সেই নির্দেশই ছিল। আমার জন্য যা ব্যয় হত তা বাদে বাকিটা প্রিন্সিপ্যাল আমার নামে ডাকঘরে একটা সেভিংস অ্যাকাউণ্ট খুলে প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবে জমা দিয়ে দিতেন। অথচ মার একদিনও মদ্যপান না করলে চলত না—তাই উপার্জনের সহজ পথটাই সে বেছে নিয়েছিল।

বিরাজ চেয়ে থাকেন লুসির মুখের দিকে।

লুসি বলতে থাকে, দেহ বেচে মা অর্থ উপার্জন করত। কি পেত তা জানি না তবে যা পেত তার সবটাই বোধ হয় মদে খরচ হয়ে যেত বলতে গেলে। অভাব-অনটন ক্রমশ বাড়ছিল সংসারে। বাড়িতে প্রতি রাত্রে মানুষ আসত হৈ-হল্লা মদ্যপান চলত—তখন বয়েস আমার তের-চোদ্দ হবে। ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠল সে বাড়িতে থাকা। তখন একদিন প্রিন্সিপ্যালকে গিয়ে বলি আমাকে হস্টেলে স্থান দেবার জন্য। প্রিন্সিপ্যাল প্রথমটায় রাজী হননি—পরে আমার সব কথা শুনে আমাকে হস্টেলে নিয়ে নিলেন। বাসায় আর আমি ফিরে গেলাম না একদিন স্কুল থেকে।

জুনিফার—তোমার মা আপত্তি করেননি ?

করেছিল বই কি ! কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল মাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেননি কখনও। দিনের পর দিন কনভেন্টে গিয়ে তাকে শুনেছি ফিরে আসতে হয়েছে।

তোমার মায়ের উচ্ছৃঙ্খল ও মদ্যপানের ব্যাপারটাই কি তাকে ছেড়ে যাওয়ার তোমার একমাত্র কারণ ?

না, আরো কারণ ছিল। আপনার কাছে আজ আর কিছুই গোপন করব না। আমি যেদিন জানতে পেরেছিলাম—, লুসি বলতে বলতে থেমে গেল হঠাৎ।

কি—জানতে পেরেছিলে ?

লুসি মাথা নীচু করে বললে, দীর্ঘদিন ধরে শরীরের উপর অত্যাচার করে করে, সারারাত মদ্যপান—তার ফলে ঠিক যা হবার তাই হয়েছিল। শরীরে তার ভাঙন ধরেছিল অনেকদিন থেকেই। কোন পুরুষকে আকর্ষণ করবার মত তার দেহে আর কিছুই প্রায় অবশিষ্ট ছিল না। তাছাড়া নানা ব্যাধি দেখা দিয়েছিল তার শরীরে। উপার্জনটা ক্রমশই কমে আসছিল দিন দিন যখন—তখনই সে মনে মনে স্থির করে আমাকে দিয়ে—

বল কি ? তোমাকে দিয়ে ?

হ্যাঁ, আপনিই বলুন তারপর কোন্ ভরসায় কোন্ সাহসে সেখানে আর আমি থাকতে পারি ? নিজের মা-ই যখন লোভের আগুনে তার নিজের সন্তানকে ইন্ধন দেবার মতলব করছে—

বিরাজ চুপ করে রইলেন।

লুসি আবার বলতে লাগল, তখনো কিন্তু আমি জানি না আমার পড়াশুনার সকল কিছু খরচ কিভাবে চলছে। তাই প্রিন্সিপ্যাল দয়া করে আমাকে কনভেন্টে বোর্ডিংয়ে স্থান দিলেও ভয় ছিল মনে—প্রিন্সিপ্যাল কতদিন আর আমার ভার

বহন করবেন। হয়ত স্কুল-ফাইন্যালটা পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে কনভেণ্ট বোর্ডিং ছাড়তে হবে। তবু যে কদিন আশ্রয় পাই—সেই ভেবে প্রাণপণে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম। পরীক্ষাও দিলাম। পরীক্ষার পর আমার দিবারাত্রি এক চিন্তা হল এইবার কি করব? কোথায় যাব? শেষ পর্যন্ত কি তাহলে আবার মার খপ্পরে গিয়েই পড়তে হবে আমাকে? তাই যদি হয় তো আমাকে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যাই করতে হত—কথা বলতে বলতে থেমে গেল লুসি। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর আবার শুরু করল বলতে, তারপর পরীক্ষার ফল বেরুল যেদিন তার পরের দিন প্রিনসিপ্যাল তাঁর ঘরে আমাকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এবার আমি কি পড়তে চাই? বললাম, কেমন করে পড়ব – কে আমাকে পড়াবে? প্রিনসিপ্যাল বললেন, সেজন্য তোমায় ভাবতে হবে না। যাঁর খরচে তুমি এতদিন পড়ে এসেছ তিনিই পড়াবেন।

বললাম, আপনার কথা তো ঠিক আমি বুঝতে পারছি না মাদার! আমার খরচ কি আমার মা-ই দিতেন না?

প্রিনসিপ্যাল বললেন, না। কলকাতার একটা বড় ব্যাংক থেকে প্রতি মাসে তোমার খরচা আসে।

ব্যাংক থেকে?

হ্যাঁ। একজন তোমার সব খরচ চালান।

জিজ্ঞাসা করলাম, কে তিনি?

প্রিনসিপ্যাল বললেন, জানি না। ব্যাংকও জানায় না।

লুসি একটু থেমে আবার বলতে লাগল, তখন কি জানি যে সে আপনিই? আপনারই দয়ায় আমি মানুষ হচ্ছি—আপনারই দয়ায় আমি পথে ভেসে যাইনি—চরম লজ্জা ও দুর্ভাগ্যের মধ্যে আমাকে তলিয়ে যেতে হয়নি।

কবে তুমি জানলে, শুধালেন বিরাজ, যে আমিই টাকা পাঠাতাম?

আপনি ব্যাংককে টাকা পাঠানো বন্ধ করবার নির্দেশ দেবার পর। তখন আমি বি. এ. পাস করেছি, কিন্তু চাকরি হয়নি—এম. এ. টা পড়বো ভাবছি মনে মনে, ঐ সময় হঠাৎ একদিন ব্যাংক জানালো আর টাকা পাঠানো হবে না। নিজেই গেলাম সেদিন ব্যাংকে। ব্যাংকের ম্যানেজারের কাছেই শুনলাম আপনার নাম। কিন্তু তখনও জানি না আপনি কলকাতায় এসেছেন—তাছাড়া ব্যাংক আপনার নামই বলেছিল, আপনার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক, কোথায় থাকেন কিছু জানায় নি।

আমার সঙ্গে তোমার যে কোন সম্পর্ক আছে তুমি জানলে কি করে?

গতকাল মার মুখেই প্রথম—

জুনিফার বললে তোমাকে?

হ্যাঁ।

কি বললে?

বললে, বাসবীর মৃত্যুর পর আমি বর্তমানে আপনার সব সম্পত্তির একমাত্র

উত্তরাধিকারিণী। এবং সব যাতে আমি পাই সে ব্যবস্থা নাকি মা-ই করবে, নচেৎ আপনি নাকি আমাকে কিছু নাও দিতে পারেন।

বিরাজ শুধালেন ঐ সময়, আমি রাজী না হলে তার কথায় কি করবে সে কিছু বলেছিল?

না। জানি না কি মতলব সে করেছে মনে মনে—তবে তার কথাবার্তা শুনে মনে হল কোন একটা মতলব তার মাথায় এসেছে—আর তাই আপনার কাছে আসতে আমি বাধ্য হয়েছি।

কি রকম?

আমি তো আমার মাকে জানি। স্বার্থের জন্যে নিজের সে সবকিছু করতে পারে—সব রকম জঘন্য কাজই সে করতে পারে। কোথায় কত নীচে যে সে নামতে পারে তা আমি জানি। তাই আপনাকে আমি সাবধান করে দিতে এসেছি।

তাতে তোমার লাভ কি?

॥ সাত ॥

লুসি তাকালো বিরাজমোহনের মুখের দিকে। তারপর বললে, লাভ!

হ্যাঁ, তোমার কি লাভ তাতে? বরং তোমার তো ক্ষতিই?

আপনার সব পরিচয় পাবার পর আপনার কোন ক্ষতি কেউ করে আমি চাই না। হতে দেবো না তা আমি। তাছাড়া কারও কোন সম্পত্তির উপরও আমার কোন লোভ নেই—আমার প্রয়োজনও নেই।

চাও না তুমি কিছু?

না।

কেন?

আমাকে তো আপনি মানুষ করেই দিয়েছেন। লেখাপড়া শিখেছি—চাকরিও একটা করছি, আমার আর কোন প্রয়োজন নেই তো। তাছাড়া,—বলতে গিয়েও যেন বলতে পারে না লুসি, ইতস্ততঃ করে থেমে যায়।

থামলে কেন, বল কি বলতে চাইছিলে?

যাকে আপনি জীবনে কখনো দেখেনওনি, একমাত্র জন্মসূত্রে আপনার সঙ্গে একটা পরিচয় মাত্র—তার দাবি তো কিছু থাকতে পারে না। বলতে বলতে কথাগুলো শেষের দিকে লুসি মুখটা ফিরিয়ে নিল, কেননা বিরাজ তীক্ষ্ন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে যেন ওর দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

ঢং ঢং করে ঐ সময় ঘড়িতে রাত দশটা বাজল।

ঘড়ির শব্দে যেন চমকে ওঠেন বিরাজ। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে, সাধারণতঃ ঐ সময়ের মধ্যে তিনি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েন।

অনেক রাত হল,—বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল লুসি, আমি যাই—কথাটা বলে

এগিয়ে এসে পায়ের ধুলো নিল লুসি বিরাজের।

এখন তুমি সেই তোমাদের কনভেণ্টের বোর্ডিংয়েই আছ তো, তাই না? বিরাজ শুধালেন।

না। কয়েক মাস আগে বোর্ডিং থেকে আমি চলে এসেছি।

কনভেণ্টের বোর্ডিংয়ে থাক না কেন?

সেখানকার চাকরি আমি ছেড়ে দিয়েছি।

কোথায় তাহলে এখন চাকরি কর?

ঐ ওদেরই আর একটা স্কুলে—বেলেঘাটায় স্কুলটা।

মানে কলকাতায়?

হ্যাঁ। এখানকার স্কুলে টিচারদের থাকবার কোন ব্যবস্থা নেই, তাই অন্যত্র বাসা নিয়ে আমি থাকি।

কোথায়?

ভবানীপুরে কালীঘাট অঞ্চলে আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে। সেও ঐ স্কুলেরই টিচার—তার সঙ্গেই থাকি।

তোমার মা সেখানেই গিয়েছিল?

হ্যাঁ। কনভেণ্টে থাকলে দেখা করতে পারত না।

তোমার কালীঘাটের বাসার ঠিকানা সে জানল কি করে? বোধ হয় তোমাদের কনভেণ্টের মাদারের কাছে সন্ধান নিয়ে?

মনে হয় না, কারণ মাদারকে আমি বলে এসেছিলাম—কাউকে আমার ঠিকানা না দিতে। মাদার নিশ্চয়ই দেননি। তবে আমার মনে হয়—

কি?

বর্তমানে যে লোকটার আশ্রয়ে মা আছে, সে-ই হয়ত আমার বর্তমান ঠিকানা খোঁজ করে বের করেছে।

কে সে? কি তার নাম?

জাতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, কি নাম তার জানি না।

তার বয়স কত হবে?

তা প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি।

তুমি তাকে দেখেছ?

হ্যাঁ। মা আর সেই লোকটাই তো কাল আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। বান্ধবীটি কিছুদিন অসুস্থ, হাসপাতালে আছে—আমি একা ছিলাম। আমি তাহলে এবারে যাই—লুসি বোধ করি অতঃপর ঘর ছেড়ে যাবার জন্যই দরজার দিকে এগিয়ে যায়। হঠাৎ বিরাজ ডাকলেন, শোন!

লুসি ফিরে দাঁড়াল।

ইচ্ছে করলে তুমি আমার এখানে এসে থাকতে পার। থাকবে?

লুসির সঙ্গে কথা বলতে বলতে কেমন যেন নিজের অজ্ঞাতেই একটা মমতা বোধ করছিলেন বিরাজ। মনে হচ্ছিল—মেয়েটা সত্যিই বড় দুর্ভাগিনী, অসহায়।

ছোটবেলায় বাপের কাছ থেকে ওকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে—যে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল যদিও সে ওর মা, তা হলেও কোনদিন তার এতটুকু স্নেহ ও পায়নি।

লুসি মৃদু গলায় বললে, না।

থাকতে চাও না এখানে?

না।

কেন?

আপনি তো আমাকে চেনেন না, জানেন না। আমার স্বভাব-চরিত্র কিছুই আপনার জানা নেই। তাছাড়া আপনাকে তো আমি বলেছি—আমার কোন অভাব-অভিযোগ নেই। আমি যাই—সাবধানে থাকবেন।

বিরাজ আর কোন কথা বললেন না।

লুসি বোরখাটা মুখের উপর টেনে দিয়ে দরজা খুলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। বিরাজ যেমন বসেছিলেন তেমনি বসে রইলেন।

একটু পরে মাধব এসে ঘরে ঢুকল, সাহেব!

কি রে?

আপনার খাবার অনেক দেরি হয়ে গেল। খানা টেবিলে বাবুর্চিকে দিতে বলব?

হ্যাঁ, বল্ দিতে।

মাধব চলে গেল। সামনে টেবিলের ওপরে রক্ষিত মদের গ্লাসটার দিকে তাকালেন বিরাজ। বার দুই গ্লাসে চুমুক দিয়েছিলেন মাত্র—গ্লাসটা ভরতিই রয়েছে এখনো, কেন যেন গ্লাস আর ছুঁতে ইচ্ছা করে না বিরাজের। উঠে দাঁড়ালেন পাশ থেকে ক্রাচটা টেনে নিয়ে দু'হাতে। সামান্য কিছু খেলেন সেরাত্রে বিরাজ।

সেরাত্রে বিনিদ্র শয্যায় শুয়ে শুয়ে মনে হচ্ছিল বিরাজের, বহু বছর আগে এক রাত্রে তিনি হঠাৎ মদ্যপান শুরু করেছিলেন, তারপর এতগুলো বছর এমন একটা দিন যায়নি তিনি মদ্যপান করেননি— আজ সেই মদ যেন তাঁর আর ছুঁতেও ইচ্ছা করল না।

ঘুম কিন্তু এল না।

জুনিফারের কথাই বার বার বিরাজের মনে পড়ছিল। শুধু ক্ষণিক মোহ বা চোখের আকর্ষণ নয়—সত্যিই জুনিফারকে দু'দিনের সামান্য পরিচয়েই ভালবেসেছিলেন বুঝি, নচেৎ জীবনে তাকে কোনদিনই ভুলতে পারলেন না কেন?

একটা দিনের জন্যেও কি তিনি জুনিফারকে ভুলতে পেরেছেন? না—পারেননি। যেভাবে জুনিফার শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্রতারণা করেছিল, তাতে করে জুনিফারের প্রতি চরম ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা আসাই তো উচিত—তবু কেন তা এল না? বরং কোথায় মনের এক তন্ত্রীতে সেই অবধি আজও কি এক বিচিত্র অনুভূতি প্রিয় একটা সুরের মত গুনগুনিয়ে চলেছে। লুসিকে মানুষ করবার দায়িত্ব যে তিনি নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন সে লুসির প্রতি কোন মমত্ব-বোধ নয় বা কোন কর্তব্যের তাগিদেও নয়—সেও ঐ জুনিফারকে ঘিরে তাঁর মনের মধ্যে যে কোমল স্থানটি ছিল তারই তাগিদে, তারই প্রেরণায়।

সারাটা রাত প্রায় বিনিদ্র কাটিয়ে রাত চারটে নাগাদ শয্যা থেকে উঠে পড়লেন বিরাজ। হাত মুখ ধুয়ে বসবার ঘরে এসে বসতেই মাধব কফির কাপ নিয়ে এসে সামনে রাখল।

মাধব কাপটা পাশে নামিয়ে রেখে চলে যাচ্ছিল, বিরাজ ডাকলেন, মাধব!

সাহেব—

চুরোটের বাক্স থেকে একটা চুরোট আর ম্যাচটা দিয়ে যা তো।

মাধব চলে গেল ও একটু পরে চুরোট ও ম্যাচটা নামিয়ে রেখে গেল টেবিলের ওপরে সামনে। বিরাজ সাধারণতঃ ধূমপান করেন না। কদাচিৎ কখনও মাধব দেখেছে তাঁকে ধূমপান করতে। আর তখুনি মনে হয়েছে মাধবের, সাহেব যেন কেমন চিন্তিত, অন্যমনস্ক। কাল সন্ধ্যায় বোরখায় ঢাকা কে একজন মেয়েমানুষ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এল, তারপর প্রায় দু'ঘণ্টারও বেশী সময় তারা ঘরের দরজা এঁটে কি সব কথাবার্তা বলল, মেয়েটি চলে গেল—সেই থেকেই সাহেবকে যেন কেমন অন্যমনস্ক, চিন্তিত দেখছে মাধব। মদ্যপান করলেন না—রাত্রে ভাল করে খেলেন না। কে জানে কে মেয়েটি? কি জন্য কোথা থেকেই বা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কে জানে?

মাধব ঘর থেকে চলে যাবার পরও বিরাজ অনেকক্ষণ সামনের বাগানের অন্ধকারের দিকে চেয়ে বসে রইলেন।

কফির কাপ ঠাণ্ডা হয়ে গেল—স্পর্শও করলেন না। হাতের চুরোট হাতেই নিঃশেষে পুড়তে লাগল।

জুনিফার—

লুসি বলে গেল তার নাকি আজ চরম দুর্দিন। আর তাই হয়তো কোন মতলব এঁটেছে মনে মনে লুসির সাহায্যে তার সম্পত্তিটা বাগিয়ে নিয়ে ভোগ করবার। আশ্চর্য! ঘুণাক্ষরেও কোনদিন জানতে পারেননি বাসবীরা যমজ বোন জন্মেছিল। ধীরাজ যে শেষ চিঠিটা তিনি কলকাতায় আসার মাস কয়েক বাদে লিখেছিল, সে চিঠির মধ্যেও কোন সেরকম ইঙ্গিত পর্যন্ত ছিল না।

চিঠিটা অবিশ্যি সংক্ষিপ্তই ছিল। চিঠিটা আজও আছে—নষ্ট করে ফেলেননি। ক্লাচের উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের আলোটা জ্বালালেন বিরাজ, তারপর পাশের লাইব্রেরি ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

সে ঘরের আলো জ্বালালেন। অনেকগুলো আলমারি ঘরে—বইয়ে একেবারে ঠাসা। একটা আলমারির সামনে এসে আলমারি থেকে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলীটা টেনে বের করলেন—তৃতীয় ভাগ। সেটার মাঝামাঝি পাতা ওলটাতেই একটা খাম দেখা গেল। খামের ভিতর থেকে চিঠি একটা বের করলেন। ধীরাজের শেষ চিঠি।

দাদা,

বঙ্কিমের মুখে শুনলাম তুমি ওদেশ থেকে permanently চলে এসে কলকাতায় ঝাউতলায় বর্তমান ঠিকানায় একটা বাড়ি কিনে বাস করছ। কত বছর তোমাকে দেখিনি। মনে আছে আজ, আমার মা যখন হঠাৎ মারা গেলেন

আমি তখন ছোট, আট বছরের বালক! তুমি আমাকে সর্বদা সঙ্গে করে ফিরতে। রাত্রে একেবারে বুকের কাছে নিয়ে শুতে। কাঁদলে চোখের জল মুছিয়ে দিতে, বলতে, মা নেই তো কি হয়েছে রে—আমি তো আছি। সেই তুমি হঠাৎ একদিন কোথায় চলে গেলে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কত কেঁদেছি তোমার জন্য। তারপর কত বছর পরে দেখা হল। আর কি দুর্ভাগ্য, সেই সময় তোমার আমার মধ্যে জুনিফার এসে দাঁড়াল। তুমি জানতে না আমি জুনিফারকে কত ভালবাসতাম—তাই আমি যখন জানতে পারলাম জুনিফারকে তুমি বিয়ে করবে বলে স্থির করেছ, ইচ্ছা হয়েছিল তোমাকে খুন করি। আতংকে রাতারাতি সব স্থির করে জুনিফারকে বিয়ে করলাম। উঃ, তখন কি জানি সে কখনও কাউকে ভালবাসতে পারে না! একান্ত স্বার্থপর লোভী চরিত্রহীন এক নারী। দাদা, আমি বুঝতে পারছি দিন আমার শেষ হয়ে এসেছে। তাই যাবার আগে ক্ষমা চেয়ে রাখলাম। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আর পার তো, আমার মৃত্যুসংবাদ পেলে—যদি পাও, তাহলে আমার মৃতদেহের পাশে এসে একটিবার ডেকো সেই ছোট বেলার মত 'ধীরা' বলে—আমি ঠিক শুনতে পাব। ইতি

ধীরাজ

বার বার তিনবার চিঠিটা পড়লেন বিরাজ। তারপর চিঠিটা ভাঁজ করে খামে ভরে আবার বইটার মধ্যে রেখে আলমারিতে ঢুকিয়ে দিলেন।

চিঠিটা পাওয়ার পর কতবার ভেবেছেন বনগাঁয় একবার যাবেন কিন্তু যাননি। যাব যাব করেও যাননি। তাছাড়া বিরাজ জানলেনও না ধীরাজের সংগে তার মেয়ে বাসবী রয়েছে। ধীরাজও তার চিঠিতে লেখেনি সে কথা। কিন্তু লোক মারফৎ বাসবীর কাছ থেকে তার বাপের মৃত্যুসংবাদটা পাওয়ার পর হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেলেন বিরাজ। সন্ধ্যার দিকে খবরটা পেয়েছিলেন—সারাটা রাত তারপর ঘুমাতে পারেননি, পরের দিন ভোরে উঠে মাধবকে বাসবীর থাকবার ব্যাপারে সব নির্দেশ দিয়ে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে পড়েছিলেন বহু বৎসর পরে দেশের পথে।

বাসবীকে গিয়ে দেখলেন সেখানে ঐ প্রথম। স্বভাবতই বিরাজ অতঃপর ভেবেছিলেন ধীরাজ ও জুনিফারের হয়তো দুটি মেয়ে হয়েছিল। তাদের একজনকে জুনিফার নিয়ে যায় চলে যাবার সময় সঙ্গে করে, অন্যজন ছিল ধীরাজের কাছে। বাসবীই সেই মেয়ে। কিন্তু বাসবী ও লুসি যে যমজ বোন হতে পারে কথাটা কিন্তু একবারও তাঁর মনে উদয় হয়নি। হওয়ারও কোন কারণ ছিল না। আজ তাই লুসি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে মুখের উপর থেকে বোরখা তুলতে হঠাৎ চমকে উঠেছিলেন তার দিকে তাকিয়ে।

অবিকল বাসবী! বাসবী কোথা থেকে এল? মাত্র ক'টা দিন আগে যার দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে—সে আবার কেমন করে সামনে এসে দাঁড়াতে পারে? স্বপ্ন দেখছেন না তো?

কিন্তু ব্যাপারটা যে স্বপ্ন নয় আদৌ বুঝতে দেরি হল না। নিষ্ঠুর সত্য বিহ্বলতার অবসান ঘটাল।

ঘড়ির কাঁটাটা ঘুরে যেতে থাকে সময়ের চিহ্নিত অক্ষরগুলোর উপর দিয়ে একে

একে। শোবার সময় বিরাজের কখন পার হয়ে গিয়েছে। কখনো নিয়মের যাঁর এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটে না—সেই মানুষটা আজ যেন সব নিয়মের বাইরে চলে গিয়েছেন।

চুপচাপ বসে থাকেন বসবার ঘরে পুনরায় ফিরে এসে পূর্বের চেয়ারটার উপরে বিরাজমোহন। মেয়েটি—ঐ লুসির কথাই ভাবছিলেন বিরাজ। মেয়েটা যা বলে গেল তা যদি সত্যিই ওর মনের কথা হয় তো তার মায়ের মত হয়নি। মেয়েটার পিছনে তাঁর অর্থব্যয় করা সার্থক হয়েছে। কিন্তু তা যদি না হয় তো মেয়েটা সত্যিই অভিনয় করতে পারে। কিন্তু কেন, অভিনয়ই বা সে করে গেল কেন? ও যা বলে গেল সত্যিই কি তাই? নানাভাবে নিজেকেই নিজে যেন প্রশ্ন করতে থাকেন বিরাজ।

বাসবীর মৃত্যুর খবরটাও সংবাদপত্রেই দেখেছে ও বলে গেল। সত্যিই কি ও কিছুই আগে জানতে পারেনি? কিন্তু একটা কথা ও বলে গেল বাসবীকে অনুসরণ করে একদিন ও এই বাড়িটা দেখে গিয়েছিল। কেন অনুসরণ করেছিল ও বাসবীকে? কেবলমাত্র অবিকল তার মত দেখতে বলেই কি কৌতূহলের বশে তাকে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করে এই বাড়ি পর্যন্ত এসেছিল?

কিন্তু তারপর?

তারপরও কি ও চুপ করে ছিল, না বাসবী সম্পর্কে আরো খোঁজখবর নিয়েছিল? যমজ ছাড়াও তো অনেক সময় কত নিঃসম্পর্কীয় পুরুষ ও নারী অবিকল একই রকম দেখতে হয়—যাদের দেখলে হঠাৎ চমক লাগে! ব্যাপারটা তাও তো হতে পারে। লুসি হয়ত কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই একটা বানানো গল্প তাঁকে শুনিয়ে গেল ভালমানুষটি সেজে, বাসবীর যমজ বোন বলে পরিচয় দিয়ে নিজের!

কিন্তু তখুনি আবার মনে হয়, জুনিফারের ফটোটা ও পেল কোথায়? ফটোটা তো আর কিছু মিথ্যা নয়। ফটোটা তো জুনিফারেরই। আচ্ছা এমনও তো হতে পারে, সবটাই জুনিফারের একটা চক্রান্ত!

জুনিফারই লুসিকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিল!

জুনিফার! জীবনে জুনিফারকে যতখানি ভালবেসেছিলেন তিনি ঠিক ততখানিই বোধ হয় ঘৃণা করেছেন। বুকের মধ্যে তাঁর আজো জুনিফারের প্রতি যত দুর্বলতাই থাক, ওর মুখদর্শনও আর তিনি করতে চান না।

লোভী, নিষ্ঠুর, নীচ—সেদিন হয়তো জুনিফারকে হাতের কাছে পেলে হত্যাও করতে দ্বিধা করতেন না। কিন্তু লুসি যেন কি বলে গেল? আজ অশেষ দুর্গতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে জুনিফার, রূপ যৌবন সব গিয়েছে—ব্যাধিতে জর্জর দেহ—দু'বেলা হয়ত পেটভরে খেতেও পায় না—অন্ধকার একটা ঘরের মধ্যে কোনমতে মাথা গুঁজে পড়ে আছে।

কেমন যেন একটা অস্থিরতা বোধ করেন বিরাজমোহন। চেয়ারটা থেকে উঠে পড়ে ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকেন। আশ্চর্য! যে মেয়েমানুষটি তাঁর সমস্ত জীবনটাকে একেবারে লক্ষ্যহীন শূন্য করে দিয়ে গেল তার চরম বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা, আজও তাকে তিনি ভুলতে পারলেন না!

কিন্তু কেন ?

ক'টা দিনেরই বা পরিচয় তাঁর জুনিফারের সঙ্গে ? কি পেয়েছেন তিনি তার কাছ থেকে ? যে তাঁর এত বড় ভালবাসাকে অমন করে সেদিন প্রতারণা করে গেল, চরম লজ্জা ও অপমানের মধ্যে তাঁকে ঠেলে দিয়ে গেল—কেনই বা আজ তাকে ভুলতে পারেন না, কেনই বা আজ তার জন্যই এই দুর্বলতা ?

রাত্রি ক্রমশঃ শেষ হয়ে আসছে।

খোলা জানালাপথে দেখা যাচ্ছে অন্ধকার কেমন ফিকে হয়ে আসছে—অন্ধকারের মধ্যে ফুটে উঠছে আলো একটু একটু করে।

ভুল হয়ে গেল—জুনিফারের বর্তমান ঠিকানাটা জেনে নেওয়া হল না লুসির কাছ থেকে। লুসির বর্তমান ঠিকানাটাও তো জানলেন না। ভবানীপুর কালীঘাট অঞ্চলে একটা বাসা নিয়ে সে থাকে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে।

লুসিকে যে খুঁজে বের করবেন তারও পথ নেই। অথচ লুসিকে আজ তাঁর মনে হচ্ছে কেন যেন বিশেষ প্রয়োজন। লুসির প্রতি তাঁর একটা কর্তব্য আছে।

লুসি অবিকল একেবারে যেন বাসবীরই প্রতিচ্ছবি।

।। আট ।।

সুনীল মনে মনে স্থির করেছিল সে তার ছুটি কিছুদিন বাড়িয়ে নেবে, সেই মত সে একটা অ্যাপলিকেশন লিখে আরো মাসখানেকের ছুটি চেয়ে তার বোম্বাই অফিসে লিখে দিয়েছিল। ছুটি তার স্যাংশন হয়ে যাবে সে জানে। বাসবীর হত্যাকারীকে খুঁজে তাকে বের করতেই হবে। একটা কথা সে সুহাস অভিজিৎ ব্রজেশ ও রঞ্জনকে বলেনি। রঞ্জনের চিঠিতে আকস্মিকভাবে বাসবীর হত্যার কথা জানাবার দিন পনের আগে সে বাসবীর একটা চিঠি পেয়েছিল।

বাসবীর চিঠির মধ্যে একটা কথা ছিল যেটার তার কাছে সেদিন কোন অর্থ আছে বলে মনে না হলেও এবং তাতে সেদিন সে কোন গুরুত্ব না দিলেও গত কয়েক দিন থেকে কেন যেন সেই কথাটা বারবারই তার মনে হচ্ছে।

বন্ধুদের আর কাউকে ঘুণাক্ষরে না জানালেও বাসবী সুনীলকে কিন্তু একদিন বলেছিল, ব্রজেশকে সে ভালবাসে এবং ব্রজেশকেই সে বিয়ে করবে।

সুনীল চিরদিনই একটু চাপা ও ভাবুক প্রকৃতির। দলের মধ্যে চিরদিনই সে-ই কম কথা বলেছে। সকলের কথা শুনেছে আর মৃদু হেসেছে। বাসবী তার মনে রঙ ধরিয়েছিল। এবং ক্রমশঃ সেই রঙ তার নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি গাঢ় হয়ে উঠেছিল কিন্তু দলের প্রত্যেকেই জানত ও ধরেই নিয়েছিল একপ্রকার বাসবী ভালবাসে রঞ্জনকেই। তাই তার নিজের মনের কথা কাউকে কোনদিন জানতে দেয়নি।

বম্বেতে চাকরি পেয়ে যাবার আগে হঠাৎ একদিন এক দুর্বল মুহূর্তে কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মেয়ে বাসবী কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই

গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সুনীল স্পষ্টাস্পষ্টি একটা জবাব পাওয়ার জন্য বলেছিল, যদিও আমি জানি বাসবী, রঞ্জনকেই আমাদের মধ্যে তুমি পছন্দ কর—ভালবাস—

না—মৃদুকণ্ঠে জবাব দিয়েছিল বাসবী।

কি, না?

তোমাদের ধারণা ভুল।

ভুল!

হ্যাঁ। রঞ্জনকে সে চোখে আমিও কখনও দেখিনি।

কিন্তু রঞ্জন—

জানি।

তবে?

কি, তবে?

রঞ্জনের ভুলটা তুমি আজও ভেঙে দাওনি কেন?

হয়ত প্রয়োজন বোধ করিনি বলেই।

প্রয়োজন বোধ করনি?

না, সত্য তো চিরদিন গোপন থাকে না, থাকতেও পারে না। তারও ভুল ভেঙে যাবে।

অতঃপর সুনীল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, তাহলে আমার প্রস্তাবে সম্মত হতেই বা তোমার দ্বিধা কোথায় বাসবী?

সুনীল, তা সম্ভব নয়।

সম্ভব নয়?

না।

কেন যদি বল—

একজনের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা সব ঠিক হয়ে আছে। আমরা পরস্পর বাকদত্ত—

কে সে?

কি হবে জেনে?

বল না।

একদিন সব তো জানতে পারবেই।

সুনীল অতঃপর আর কোন অনুরোধ করেনি। এবং তার দিন দুই পরেই সুনীল চলে গেল বোম্বাই।

মাসখানেক পরে বাসবীই প্রথমে তাকে চিঠি দিয়েছিল।

সুনীলও সে চিঠির জবাব দিয়েছিল। তারপর মধ্যে মধ্যে ওরা পরস্পর পরস্পরকে চিঠি দিত।

শেষ চিঠিতে বাসবী লিখেছিল:

"আচ্ছা সুনীল, কেন বল তো আজকাল যেন সর্বদাই আমার মনে হয় কে

যেন সর্বক্ষণই ছায়ার মত আমাকে অনুসরণ করছে। মনে হয় যেন কেউ আমাকে হত্যা করতে চায়। চিঠিটা পড়তে পড়তে হয়তো তুমি হাসছ, কিন্তু বিশ্বাস কর, সত্যিই তাই আমার মনে হয়। তাই বলছি হঠাৎ যদি আমার মৃত্যুসংবাদ পাও বিস্মিত হয়ো না। হ্যাঁ ভাল কথা, তুমি সেই নামটি জানতে চেয়েছিলে না? শীঘ্রই হয়ত সে নামটি তোমাকে জানাতে পারব। আমার বিয়ের সময় আসবে তো? আজ এইখানেই ইতি টানলাম।—তোমাদের বাসবী।"

আশ্চর্য, গত কদিন ধরে কেবলই সুনীলের সেই চিঠির কথাটা মনে পড়ছে! আর মনে হচ্ছে, তবে কি বাসবী তার দুর্ঘটনার ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরেছিল? অনুমান তো এমনি আসে না—তার পশ্চাতে কোন কারণ থাকে, ক্ষীণ হলেও কোন যুক্তি থাকে।

কি সে কারণ? কি সে যুক্তি?

বন্ধুদের চিঠির কথাটা ঘুণাক্ষরেও জানায়নি সুনীল। আর একটা কথা ঐ সঙ্গে মনে হয় সুনীলের, একমাত্র কি সুনীলকেই কথাটা জানিয়েছিল বাসবী, না আর সকলকেও জানিয়েছিল! তা যদি জানাত, কেউ সে কথাটা নিয়ে সেদিন কোনরকম উচ্চবাচ্য করল না কেন? কিংবা হয়তো জানে সবাই, কিন্তু বাসবীর মৃত্যুর পর ওসব কথা আর কারো আলোচনার ইচ্ছা নেই।

দিন দুই পরে।

সেদিনটা ছিল রবিবার। রঞ্জনের বাসায় গিয়ে বেলা দশটা নাগাদ হাজির হল সুনীল। রঞ্জনের মা এখনো কাশী থেকে ফেরেননি, সে একাই আছে। দোতলার তিন কামরাওয়ালা একটা ফ্ল্যাট নিয়ে রঞ্জন থাকে। সুনীল সোজা গিয়ে রঞ্জনের ঘরে প্রবেশ করল, ভৃত্যের মুখে রঞ্জন বাসায়ই আছে জেনে। রঞ্জন তার ঘরের মধ্যে বসে সেতারটা বাজাচ্ছিল। নীচ থেকেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সেতারের সুরও কানে এসেছিল।

সুনীলকে ঘরে ঢুকতে দেখে রঞ্জন সেতারটা নামিয়ে রাখল একপাশে। মৃদু হেসে বললে, আয়, কাল থেকে তোর কথাই ভাবছিলাম!

সুনীল একটা সোফার উপরে বসতে বসতে বললে, কেন?

কি জানি কেন জানি না। তারপরই একটু থেমে বললে, ব্রজেশের সঙ্গে ইতিমধ্যে তোর আর দেখা হয়েছিল?

হ্যাঁ, দু'দিন হয়েছে—তাছাড়া আজ তো ওর সঙ্গে রাত্রের শোতে রোমিও জুলিয়েট দেখবার কথা আছে, সুহাসও হয়তো যাবে।

রঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে সুনীলের মুখের দিকে তাকায় কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলে, ওঃ, তা তুই বোম্বাই ফিরে যাচ্ছিস কবে?

দেখি—

ক'দিনের ছুটি?

ভাবছি ছুটিটা extension করিয়ে নেব।

কেন?

অনেকদিন পরে কলকাতায় এলাম বেশ লাগছে—যেতে ইচ্ছে করছে না।

বম্বেতে ভেবেছিলাম তোর ওখানেই গিয়ে উঠব!

বেশ, তাই উঠিস—বেশ হবে। আচ্ছা রঞ্জন—

কি?

বাসবীকে কে হত্যা করতে পারে, বল্ তো?

জানতে পারলে তো পুলিসকেই সে কথাটা জানিয়ে দিতাম।

না, না—আমি ঠিক তা বলিনি। মানে কাউকে তুই সন্দেহ করিস কিনা—

সন্দেহ?

হ্যাঁ।

না।

আচ্ছা রঞ্জন, তুই জানিস নিহত হবার কিছুদিন আগে থাকতেই বাসবীর মনের মধ্যে কেমন একটা ভয় ঢুকেছিল?

ভয়? কিসের ভয়?

জানি না ঠিক, তবে তার মনে হত যেন কেউ তাকে সর্বদা ছায়ার মত অনুসরণ করছে সর্বত্র!

কি করে জানলি?

বাসবী আমাকে চিঠিতে জানিয়েছিল।

বাসবী তোকে বুঝি চিঠি দিত?

হ্যাঁ, আমিও দিতাম—সেও দিত।

আর কি লিখেছিল বাসবী তোকে? আমার কথা কিছু লিখেছিল?

হ্যাঁ।

কি লিখেছিল?

সে আমার ঠিক মনে নেই।

মনে নেই, না বলবি না? বলতে চাস না—

বাঃ, বলব না কেন?

হুঁ, তা তোর কাউকে সন্দেহ হয় নাকি বাসবীর হত্যার ব্যাপারে?

কাকে সন্দেহ করব—

কেন, আমাকে?

তোকে? কি বলছিস পাগলের মত?

কেন, পারি না! হতাশ প্রেমের জ্বালায় কত প্রেমিক তো তাদের প্রেমিকাকে খুন করেছে! তেমনি আমিও তো প্রত্যাখ্যাত হয়ে তাকে হত্যা করতে পারি! কথাগুলো খুব শান্ত গলায় উচ্চারণ করে গেল বটে রঞ্জন, কিন্তু তার দু'চোখের দৃষ্টির মধ্যে যেন একটা তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা স্পষ্ট দেখতে পায় সুনীল।

সুনীল প্রত্যুত্তরে ঠিক কি বলবে বুঝে উঠতে পারে না। কেমন একটু যেন থতমত খেয়েই চুপ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ সুনীল হেসে ফেলে, হাসতে হাসতেই বলে, যেতে দে ওসব কথা। Past

is past—বাসবী মরেছে, সে আর ফিরে আসবে না কখনও—তাকে ভুলে যাওয়াই ভাল।

তারপরেই বলে, সত্যিই কি তুই ভুলতে পেরেছিস রঞ্জন বাসবীকে?

কেন পারব না? একদম ভুলে গিয়েছি। মৃত্যুকে জিইয়ে রাখার কোন মানে হয়? বোস তুই, দেখি ভোলাটা কোথায় গেল—চা করতে বলি। বলতে বলতে রঞ্জন উঠে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সুনীল বুঝতে পারে, রঞ্জন বাসবীর ব্যাপারটা আদৌ আর আলোচনা করতে চায় না। যে আলোচনাটা করতে এসেছিল সে আলোচনাটা করা হল না! কিন্তু সুনীলের মনে হয়, রঞ্জন মুখে যাই বলুক বাসবীকে সত্যিই সে ভালবেসেছিল—তাই হয়তো তার মৃত্যুটা তাকে খুব বেশী আঘাত দিয়েছিল। হঠাৎ সুনীলের নজরে পড়ে সেতারটার পাশে মেঝেতে কার্পেটের উপর একটা অ্যালবাম পড়ে আছে। উঠে গিয়ে সুনীল মেঝে থেকে অ্যালবামটা তুলে নিয়ে এল। সোফার উপরে বসে অ্যালবামটার পাতা ওলটাতে থাকে। সব বাসবীর ফটো। নানা ভঙ্গীতে নানা অবস্থায় তোলা ফটো বাসবীর। এবং নীচে সব তারিখ রয়েছে। শেষ তারিখটা মাত্র দিন কুড়ি আগের। আরো একটা জিনিস নজরে পড়ে সুনীলের, প্রত্যেকটা ফটোর নীচে দু-চার লাইন করে কবিতা লেখা। রঞ্জন কবিতা লেখে সুনীল জানত—আর ফটো তোলার শখও আছে রঞ্জনের।

প্রথম দিককার কবিতাগুলোতে কেবলই বাসবীর প্রশস্তি। পাতা উল্টে যায় সুনীল অ্যালবামের। হঠাৎ শেষাশেষি এসে সুনীলের নজরে পড়ে, কবিতার সুর যেন কেমন পালটে যাচ্ছে। প্রশস্তি নয় আর—রাগ, বিদ্বেষ, ঘৃণা।

শেষের দুটো পৃষ্ঠায় কোন ফটো নেই—খালি। কিন্তু সেখানেও কবিতা রয়েছে। গোটাচারেক কবিতা। তার একটায় লেখা:

আমি জানি তোমার মৃত্যু মৃত্যু নয় আরো কাছে পাওয়া
জীবনের নিবিড় মিলনের শুধু ছবি এঁকে যাওয়া।

তারপর শেষ পৃষ্ঠায় একটি কবিতা:

আমি জানি তুমি মোরে ক্ষমা করিয়াছো—
যে বেদনা দিয়েছি তোমায়, জেনো তার শতগুণ মোর বেদনা –
সয়েছি যে আমি—সহিতে হবে আরো জীবনের বাকী কটা দিন
আমি জানি তুমি জানিয়াছো॥

ঘরের বাইরে বারান্দায় রঞ্জনের জুতোর শব্দ পাওয়া গেল।

সুনীল অ্যালবামটা মেঝের উপর নামিয়ে রাখল। রঞ্জন দু হাতে দু কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল, ভোলা হারামজাদা মা বাড়িতে নেই সাপের পাঁচ পা দেখেছে! নে—চা নে।

তুই করলি নাকি? চায়ের কাপটা হাতে নিতে নিতে সুনীল বলে।

হ্যাঁ, দেখ্ খেয়ে—খেতে পারবি কিনা জানি না। চিনি বোধ হয় কম হয়েছে। হারামজাদা চিনির পটটা যে কোথায় রেখেছে খুঁজেই পেলাম না।

রঞ্জন!

কি রে?

শেষ তোর সঙ্গে বাসবীর কবে দেখা হয়েছিল রে?

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল রঞ্জন সুনীলের দিকে, কেন?

না, তাই জিজ্ঞাসা করছি—

কেন, সে তো তোকে চিঠিতেই জানিয়েছিলাম। সে ব্যাপারের পর আর কখনো দেখা হয়নি।

হ্যাঁ, সেই রকমই তুই লিখেছিলি বটে মনে পড়ছে। তাহলে এক বছরের মধ্যে আর তোদের সত্যিই দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি?

না।

ওরা তোকে বিয়ের নেমন্তন্ন করতে আসেনি?

না।

আসেনি?

না—মানে ব্রজেশ ফোনে বলেছিল বটে, তবে বাসবী ফোনও করেনি।

আশ্চর্য!

চিঠি ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল, তবু আমি যাবো ঠিক করেছিলাম—

তারপর যেন আর কথা জমে না। দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে, তারপর হঠাৎ একসময় সুনীল উঠে দাঁড়ায়, চললাম রে!

চললি?

হ্যাঁ, অনেক বেলা হয়ে গেল।

সুনীল বের হয়ে এল।

একটা কথা কিছুতেই সুনীল ভেবে পাচ্ছিল না, রঞ্জন মিথ্যা বলল কেন? গত রাত্রেই ব্রজেশের সঙ্গে কথা হচ্ছিল সুনীলের, ব্রজেশ বলেছিল, বাসবী নিজে নাকি গিয়ে রঞ্জনকে তাদের বিয়ের নেমন্তন্ন করে এসেছিল। অবিশ্যি ব্রজেশ যায়নি—তাও বাসবীর ইচ্ছাতেই। বাসবীই বলেছিল সে একা যাবে—ব্রজেশের না যাওয়াই ভাল। ব্রজেশও আপত্তি করেনি।

তবে কি বাসবী শেষ পর্যন্ত যায়নি? ব্রজেশকে এড়াবার জন্যই কি সে ব্রজেশকে নিজে একা যাবে বলেছিল? আচ্ছা ব্রজেশ কি জানে, সে ও রঞ্জন কোন এক সময় বাসবীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল? বাসবী কি আর বলেনি! নিশ্চয়ই বলেছে। ব্রজেশ হয়ত সমস্ত ব্যাপারটাই জানে, কিন্তু সে কোন উচ্চবাচ্য করেনি সে ব্যাপারে!

হাউসে এসেই রঞ্জনের সুহাসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সুহাসও এসেছিল রোমিও জুলিয়েট দেখতে।

রাত্রে শো ভাঙল যখন রাত সোয়া এগারটা। প্রচণ্ড ভিড় হয়েছিল, শো ভাঙবার পরে কাতারে কাতারে দর্শকরা মেয়েপুরুষ প্যাসেজ দিয়ে বের হচ্ছে। আগে আগে ব্রজেশ ও ঠিক তার পশ্চাতে ছিল সুনীল।

হঠাৎ যেন পিঠে তীক্ষ্ণ ছুঁচের মত একটা কি ফুটল। উঃ! একটা অস্ফুট যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে ওঠে সুনীল।

ব্রজেশ সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, কি হল?

কি যেন একটা ছুঁচের নত বিঁধল পিঠে! বলতে বলতে সুনীল কোনমতে ভিড় ঠেলে সামনের লবিতে এসে পড়ে।

বলে, বড্ড জ্বালা করছে রে ব্রজেশ—দেখ্ তো!

ব্রজেশ সুনীলের গায়ের সাদা ধবধবে আদ্দির পাঞ্জাবির উপরে বাঁ পাঁজরের কাছে ছোট একটু রক্তবিন্দু দেখতে পায়।

ওরা দুজনের কেউ লক্ষ্য করেনি ওদের পশ্চাতেই যে দীর্ঘকায় ব্যক্তিটি দাঁড়িয়েছিল, মাথার চুল কাঁচা-পাকা, পরনে ধুতিপাঞ্জাবি, মুখে একটা চুরোট—সেই ভদ্রলোকই এবারে এগিয়ে এসে বললে, আপনাদের সঙ্গে গাড়ি আছে?

ব্রজেশ বলে, না।

চলুন আমার গাড়ি আছে—তাড়াতাড়ি কোন ডাক্তারের কাছে চলুন!

ডাক্তার?

হ্যাঁ, কারণ আমার মনে হচ্ছে কোন কিছু বিষাক্ত জিনিস আপনার দেহে প্রবেশ করানো হয়েছে!

কি বলছেন আপনি? ব্রজেশ বলে।

তর্ক করবেন না—তর্ক করবার সময় পাবেন, তাড়াতাড়ি চলুন, দেরি করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

আপনি—

এমন সময় পাশ থেকে আর এক ব্যক্তি বলে ওঠে, কিরীটী, তুই!

কে, সুব্রত? হ্যাঁ—

কি ব্যাপার?

ব্যাপারটা এখনো বুঝতে পারছি না, তবে আমি ঠিক ওঁদের পিছনেই ছিলাম—হঠাৎ দেখলাম ভিড়ের মধ্যে কালো সুট পরিহিত এক ব্যক্তি ঐ ভদ্রলোকের পিঠে হাত রেখে ওঁকে যেন একটু ঠেলে দিয়ে চট্ করে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। তখন বুঝতে পারিনি—এখন বুঝতে পারছি, কোন কিছু ওঁর শরীরে ফুটিয়ে দিয়েছে সেই সুট পরিহিত লোকটি। কিন্তু দেরি করছেন কেন, চলুন!

॥ নয় ॥

সুনীলের সত্যিই শরীরটার মধ্যে যেন কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। হাত-পা কেমন যেন দুর্বল অসাড় হয়ে আসছিল।

কিরীটীর কথায় সে আর প্রতিবাদ করে না।

কিরীটীর সঙ্গে সঙ্গেই ওরা এগিয়ে যায় গেটের দিকে। গেট বরাবর আসতেই

হঠাৎ একটি মেয়ের ওপরে নজর পড়তেই যেন সুহাস ভূত দেখার মতই চমকে ওঠে।

সুহাস লুসিকে দেখতে পেয়েছিল।

সুহাস বলে ওঠে যেন নিজের অজ্ঞাতেই, কে—কে?

ব্রজেশ শুধায়, কে—কার কথা বলছিস?

ঐ দেখ্! ঠিক যেন—ঐ যে মেয়েটি—

কে? কার কথা বলছিস? ব্রজেশ প্রশ্ন করে পার্শ্ববর্তী সুহাসকে।

হ্যাঁ, ঐ যে, দেখ্ রাস্তা ক্রস করছে—

ব্রজেশও দেখল। কিন্তু ভাল করে দেখতে পেল না কারণ ততক্ষণে লুসি রাস্তা ক্রস করে ওদিককার ভিড়ে মিশে গিয়েছে। আর সুনীলের দেহের ক্লান্তি ততক্ষণে আরো যেন তাকে কেমন নিস্তেজ করে দিয়েছিল। সুনীল যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। বেশ অসুস্থ বোধ করছিল। সুহাস সুব্রত ও ব্রজেশের সাহায্যেই কোনমতে কিরীটী সুনীলকে ধরে এনে গাড়িতে তার তুলল।

ব্রজেশ ঐ সময় বলে, মেডিকেল কলেজে গেলে হত না?

কিরীটী জবাব দেয়, তা হত তবে সেখানে কোন বড় ডাক্তারকে এখুনি হাতের কাছে পাওয়া যাবে না। তার চাইতে চলুন কাছেই রডন স্ট্রীটে আমার এক জানা বড় ডাক্তার আছেন—ডঃ শেঠ, বলে কিরীটী নিজেই স্টিয়ারিংয়ে বসে গাড়ি ছেড়ে দিল।

ডাঃ বিকাশ শেঠকে ভাগ্যক্রমে নীচের পারলারেই পাওয়া গেল। তিনি সেই-মাত্র একটা জরুরী অপারেশন করে ফিরে গাড়ি থেকে নেমে পারলারেই পা দিয়েছেন। কিরীটীকে অত রাত্রে দেখে তো অবাক ডাঃ শেঠ! বললেন, কি ব্যাপার, কিরীটী?

বুঝতে পারছি না ঠিক, হঠাৎ এক ভদ্রলোক সিনেমা থেকে বেরুবার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। হঠাৎ তোর কথা মনে পড়ল—সোজা এখানেই নিয়ে এলাম।

কই সে ভদ্রলোক?

গাড়িতে।

সুনীল তখন রীতিমত নেতিয়ে পড়েছে গাড়ির সীটের উপরে। ডেকে সাড়া পাওয়া গেল না। সুব্রত ব্রজেশ ও সুহাস কোনমতে ধরাধরি করে সুনীলকে এনে ডাঃ শেঠের একজামিনেশন রুমে টেবিলের উপর শুইয়ে দিল। ডাঃ শেঠ পরীক্ষা করে বললেন, এ তো মনে হচ্ছে কোন মরফিন গ্রুপ অব ড্রাগ হাই ডোজে ও'র শরীরে প্রবেশ করানো হয়েছে—পিউপিল কনট্রাকটেড—কাশি—সোয়েটিং হচ্ছে—

আর কোন প্রশ্ন না করে ডাঃ শেঠ সুনীলের চিকিৎসা শুরু করে দিলেন। প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরিশ্রম করে ডাঃ শেঠ সুনীলকে বাঁচিয়ে তুললেন।

আরো দিন চারেক পরে।

সুনীল সুস্থ হয়ে উঠেছে। তার শোবার ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। এখনো সে বেশ দুর্বল।

রঞ্জন পরের দিন সুনীলের গৃহে এসেই সংবাদটা পেয়েছিল।

কিরীটী বলছিল, এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কেউ সুনীলবাবুকে ঐ সিনেমার ভিড়ের মধ্যে হাই ডোজে মরফিন ইনজেক্ট করে সরে পড়েছিল। এবং মনে হচ্ছে, সুনীলবাবুকে হত্যা করবার মতলবেই যেই হোক ঐ কাজ করেছিল।

রঞ্জন বলে, কিন্তু ব্যাপারটা যেন কেমন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, মিঃ রায়! সুনীলকে কেউ মরফিন ইনজেক্ট করে হত্যা করতে যাবেই বা কেন?

কেন যাবে তা জানি না! কিরীটী বলে, তবে যা সেরাত্রে ঘটেছিল তা থেকে ঐটাই আমার মনে হচ্ছে। হয়তো ও'র কোন শত্রু—

শত্রু! ব্রজেশ কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

স্বভাবতঃ তাই তো মনে হচ্ছে ব্রজেশবাবু—

কিন্তু ওর কে আবার শত্রু থাকতে যাবে—যে ওকে অমন করে কৌশলে হত্যা করতে চেয়েছিল!

শত্রু কি থাকতে পারে না, ব্রজেশবাবু? এই মুহূর্তে কি আপনিই বলতে পারেন আপনার কোন শত্রু নেই? সব সময়ই কি আমরা সঠিকভাবে জানতে পারি—সর্বক্ষণ যাদের সঙ্গে আমরা মিশছি কথা বলছি তাদের মধ্যে কেউ আমাদের শত্রু নয়? মনে মনে সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে শত্রুতাসাধনের মতলব আঁটছে না?

কথাটা আপনি হয়তো একেবারে মিথ্যা বলেননি, মিঃ রায়! নচেৎ আমরাই কি কেউ কল্পনাও করতে পেরেছিলাম কটা দিন আগেও, বাসবীর কেউ শত্রু আছে—তাকে হত্যা করবার সুযোগ খুঁজছে!

বাসবী?

হ্যাঁ, তার মৃত্যুটা সত্যিই আশ্চর্য! রীতিমত একটা রহস্য হয়ে আছে এখনো আমাদের সকলের কাছেই।

কেন?

কিছুদিন আগে আমাদের সকলেরই পরিচিত বান্ধবী বাসবী সান্যালকে তার শয়নঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। পুলিস বলছে তাকে নাকি কেউ শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে!

কোথায়?

এই কলকাতা শহরেই। তার জ্যাঠার ঝাউতলার বাড়িতে।

মানে আপনি ঝাউতলার বিরাজমোহন সান্যালের ভাইঝির কথা বলছেন?

হ্যাঁ, আমাদের সকলেরই পরিচিত ছিল সে। আপনি তার কথা জানেন নাকি?

সংবাদপত্রে পড়েছিলাম।

সুহাস ঐ সময় বলে ওঠে, গত উনিশ তারিখে ঐ ব্রজেশের সঙ্গে বাসবীর বিয়ে হবার দিন স্থির ছিল।

কিরীটী ব্রজেশের মুখের দিকে তাকাল। ব্রজেশ মাথাটা নীচু করে।

আপনাদের বান্ধবী ছিলেন তিনি বলছিলেন—আপনারা এই কজন বুঝি—

হ্যাঁ—সুনীল বলে, আমি সুহাস রঞ্জন ব্রজেশ আর অভিজিৎ। আমাদের পাঁচ জনের সঙ্গে কলেজ-লাইফ থেকেই বাসবীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

কিরীটী নিঃশব্দে একবার ঘরের মধ্যে ঐ সময় উপস্থিত সুনীল, ব্রজেশ, রঞ্জন ও সুহাসের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে দৃষ্টিটা তার বুলিয়ে নিল। তার মনের মধ্যে কথাটা শুনেই কেমন যেন একটা কৌতূহল জাগ্রত হয়। পাঁচ বন্ধুর এক বান্ধবী! তারপর মৃদুকণ্ঠে বলে, পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার পরিণতি হিসাবেই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত বিয়ে হচ্ছিল ওঁদের?

সুহাস বললে, হ্যাঁ, অথচ আমরা বিয়ে ওদের স্থির হবার আগে পর্যন্ত ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি কেউ বন্ধুরা।

বলেন কি!

সুহাস বললে, তাই। বরং আমরাও ভেবে রেখেছিলাম—

কি? কিরীটী তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে সুহাসের মুখের দিকে তাকাল।

বরাবর দেখেছি ঐ রঞ্জনের সঙ্গেই ওর বেশী ঘনিষ্ঠতা, তাই—

রঞ্জন ঐ সময় বাধা দেয়, আঃ সুহাস, তুই থাম্ তো! পুরনো অতীতকে নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি কেন?

সুহাস বলে ওঠে, তা হোক না। আমরা এবং পুলিসও ব্যাপারটার কোন হদিসই করতে পারেনি আজ পর্যন্ত। কিরীটীবাবু যদি কোন একটা মীমাংসা করে দিতে পারেন, তারপরই কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বললে, জানেন কিরীটীবাবু, পুলিসের নাকি ধারণা সেরাত্রে তার কোন বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিই তার ঘরে ঢুকে তাকে হত্যা করেছে।

তাই বুঝি!

হ্যাঁ। কিন্তু পরিচিত সেরকম বলতে গেলে বাড়ির লোক যারা সেরাত্রে ঐ গৃহে ছিল তারা ছাড়া তো আমরাই পাঁচ বন্ধু, কিন্তু আমরা তাকে হত্যা করতে যাব কেন বলুন তো?

তা তো ঠিকই।

বলুন আপনি—তবে আর কে হতে পারে তার এমন পরিচিত জন?

আপনারা পাঁচজন ছাড়াও যে আর কেউ ছিল না, আপনারা স্থিরনিশ্চিত হলেন কি করে সুহাসবাবু? কিরীটী বললে।

জানি। ছোটবেলার সে মাকে হারায়—

মা মারা যান বুঝি?

না।

তবে?

সুনীল ঐ সময় বললে, বাসবীর মা তার বাবাকে ছেড়ে চলে যায় বিয়ের ক'বছর পরেই।

ডিভোর্স?

তা জানি না।

বাসবী দেবীর মা বেঁচে নেই?

তাও জানি না।

হুঁ। তা বিরাজমোহন তো বাসবী দেবীর জ্যাঠা ছিলেন। ওঁর বাবা—

বাসবীর পনের বছর বয়সের সময় তিনি মারা যান। তারপর থেকে ঐ জ্যাঠার কাছেই সে ছিল।

বাসবী দেবী তাঁর মার কথা কখনো বলেননি আপনাদের?

না। ব্রজেশ বললে. মার সম্পর্কে সব কিছু বরাবরই কেমন যেন সে সর্বদা এড়িয়েই চলত। কেবল একবার আমাকে বলেছিল একটা কথা—

কি কথা? প্রশ্নটা করে কিরীটী ব্রজেশের মুখের দিকে তাকাল।

অত্যন্ত নোংরা, নীচ প্রকৃতির স্ত্রীলোক নাকি ছিল তার মা।

বাসবী দেবীর মা-বাবার মধ্যে যখন সেপারেশন হয়ে যায়, তখন তাঁর বয়স কত ছিল? এবারে কিরীটী প্রশ্ন করে।

শুনেছি ওর বয়স তখন দেড়-দু বছর হবে। ব্রজেশ জবাব দেয়।

তারপর আর নিশ্চয়ই তাঁর মায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি? কিরীটী বললে।

না।

তবে তিনি জানলেন কি করে যে তাঁর মা নোংরা, নীচ প্রকৃতির একজন স্ত্রীলোক ছিলেন? না তাঁর মার সঙ্গে তাঁর বাবার সেপারেশন হয়ে গিয়েছিল বলেই বাসবী দেবীর তাঁর মার সম্পর্কে ঐরকম একটা ধারণা হয়েছিল? কিরীটী প্রশ্নটা করে আবার তাকাল ব্রজেশের মুখের দিকে।

বলতে পারি না ঠিক। হয়ত তাই। ব্রজেশ যেন একটু ইতস্ততঃ করে জবাব দেয়।

কিরীটী এবারে বললে, দেখুন আপনাদের বান্ধবী বাসবী দেবীর মৃত্যুর ব্যাপারটা আমি সব এখনো জানি না, তাহলেও একটা কথা মনে হচ্ছে যেটা আপনাদের সকলকেই আমার বলা কর্তব্য বলে মনে করছি—

কি বলুন তো কিরীটীবাবু? সুনীলই এবারে প্রশ্নটা করল।

সেদিন সিনেমা হলে যা ঘটেছে তাতে করে আমার মনে হচ্ছে, যে কারণেই হোক সেরাত্রে আপনাদের জীবনের উপরে একটা attempt নেওয়া হয়েছিল।

আমাদের মানে? ব্রজেশই প্রশ্নটা করল।

মানে আপনার ও সুনীলবাবুর জীবনের উপরে। কিংবা এমন হতে পারে, আততায়ীর লক্ষ্য ছিল আপনার উপরেই—accidentally সুনীলবাবুর উপরে injectionটা পড়ে—

Injection?

তাই। ইনজেকশন করেই সুনীলবাবুর দেহে কোন মরফিন-জাতীয় বিষ প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল আততায়ী তাঁকে হত্যা করবার জন্যই. গোড়া থেকে সুনীলবাবুকে হত্যা করবার পরিকল্পনায়। কিন্তু একটা কথা—

কি? সুনীল জিজ্ঞাসা করে।

সেরাত্রে যে আপনারা রাত্রের শোতে সিনেমায় যাবেন সে কথাটা কি আর কেউ জানতেন ব্রজেশবাবু? কিরীটী শুধাল।

আর কে জানবে আমরা ছাড়া? জানবার কথাও নয়।

কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন, হত্যাকারী জানত। তাতেই যে কথাটা আমার মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে, হত্যাকারী এমন কেউ যার সঙ্গে সুনিশ্চিত আপনাদের ঘনিষ্ঠতা একটা আছে।

আপনি বলতে চান মিঃ রায়, সুনীল ঐ সময় বাধা দিল, সেরাত্রে কেউ আমাকে হত্যাই করতে চেয়েছিল?

আমার ধারণা তাই।

কিন্তু কেন—আমাকে কেউ হত্যা করতে যাবেই বা কেন? কেউ আমার এমন শত্রু আছে বলে তো এখনও আমি ভাবতে পারছি না।

যদি বলি—

কি?

আপনাদের বান্ধবীর হত্যার ব্যাপারের সঙ্গে সেদিন রাত্রে সিনেমা-লবিতে আপনাকে হত্যার প্রচেষ্টার একটা অদৃশ্য যোগাযোগ আছে। আর তাই তো আমি বলছিলাম, অতঃপর আপনি একটু সাবধান হয়ে চলবেন, কারণ হত্যাকারী ব্যর্থ হয়েছে যখন আবার সে attempt নেবেই—

না না, এ আপনি কি বলছেন মিঃ রায়! আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা আগাগোড়াই একটা accident!

না। দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল কিরীটী।

কিরীটীর কণ্ঠের দৃঢ়তায় ওরা সবাই যেন চমকে ওর মুখের দিকে সঙ্গে সঙ্গে তাকাল।

সুনীল আর ব্রজেশ কোন কথা বলে না। কথা বললে সুহাস, আপনার কথাই যদি সত্যি হয় কিরীটীবাবু—তাহলে তো সত্যিই চিন্তার কথা!

হ্যাঁ, এখন আমার কেন যেন মনে হচ্ছে দুর্ঘটনার যবনিকাপাত বাসবী দেবীর হত্যার সঙ্গে সঙ্গেই হয়নি। হত্যার রক্ত আরো অনেক দূর গড়াবে—

কিরীটীবাবু!

বলুন।

একটা অনুরোধ করব, যদি রাখেন! সুহাস বলে।

কি, বলুন?

এখন বুঝতে পারছি সেরাত্রে সিনেমা-হলে আপনার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগটা একান্ত আকস্মিক হলেও বিধাতার কোন অদৃশ্য ইঙ্গিত রয়েছে তার মধ্যে। বাসবীর মৃত্যুতে আমরা সব বন্ধুরাই একান্ত মর্মাহত, কিন্তু সে মর্মান্তিক ব্যাপারের আর না পুনরাবৃত্তি ঘটে এটাই আমাদের ইচ্ছা। কিন্তু আমরা সবাই সত্যি কথা বলতে কি, কেমন যেন বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে পড়েছি। তাই বলছিলাম—

বলুন, থামলেন কেন?

আপনি যদি আমাদের সাহায্য করেন!

সুব্রত মৃদু হেসে ঐ সময় বলে ওঠে, আপনারা না বললেও ও সাহায্য করত। রহস্যের গন্ধ না পেলে সামান্য সৌজন্যরক্ষার জন্য আজ এখানে আসবার পর

আপনাদের সঙ্গে ও এত আলোচনা করত না—এতক্ষণ এখানে বসেও থাকত না। এক কাজ করুন, আজ বেলা হয়ে গিয়েছে—কাল-পরশু ওর টালীগঞ্জের বাড়িতে আসুন, সেখানেই কথা হবে।

কিরীটী ঐ সময় বললে, সুব্রত যখন বলছে তাই হবে। সবাই মানে পাঁচ বন্ধুই আপনারা আসবেন—আপনাদের চায়ের আমন্ত্রণ রইল পরশু সন্ধ্যায় আমার গৃহে। পরশু রবিবারও আছে!

ব্রজেশ, সুহাস; সুনীল, রঞ্জন ও অভিজিৎ সবাই রবিবার বিকেলে গিয়ে কিরীটী-ভবনে হাজির হয়। সুব্রতও উপস্থিত ছিল।

সকলে যে যতটুকু জানত—চা-পান করতে করতে কিরীটী পাঁচজনের মুখ থেকেই বাসবীর কাহিনী শুনল।

কিন্তু বিশেষ কোন আলোচনা করল না। কেবল বললে, দিনচারেক আমাকে আপনারা সময় দিন, তারপর আবার আমরা সবাই meet করব।

সেদিনকার মত সবাই বিদায় নিল।

ওরা চলে যাবার পরও কিরীটী চুপচাপ সোফাটার উপর বসে নিঃশব্দে পাইপ টানছিল। সুব্রত বুঝতে পেরেছিল, কিরীটী সমগ্র ব্যাপারটা আগাগোড়া তলিয়ে দেখছে মনে মনে। তাই সে কোন কথা না বলে একপাশে বসে একটা সায়ান্স জার্নালের পাতা ওলটাচ্ছিল।

সুব্রত!

কিরীটীর ডাকে হঠাৎ সুব্রতর চমক ভাঙে।

কি রে?

কাল একবার ভাবছি অকুস্থানটা ঘুরে আসব।

মানে ঝাউতলায়?

হ্যাঁ, বিরাজমোহনের গৃহে। তুই এক কাজ কর্—

কি?

পার্ক সার্কাস থানার ও. সি. এখন রথীন সিকদার না আমাদের—

হ্যাঁ, that honest officer – যার আজ পর্যন্ত কোন উন্নতি হল না চাকরিতে!

সৎ লোকের পরিণাম ঐ হয়—

তার মানে তুই বলতে চাস—

হ্যাঁ, এ যুগে সাধুতা সত্যবাদিতা ন্যায়পরায়ণতা কর্মনিষ্ঠার কোন দাম নেই। অসাধুতা মিথ্যাচরণ দুষ্কৃতি ও সেই সঙ্গে চাটুকারের মত তোষামোদ যারা করতে পারে তাদেরই জয়জয়কার। ধাপে ধাপে তারাই উঠে যায়। যাক্ গে, রথীনের তো বেশী ঝামেলা নেই—একটি মাত্র ছেলে, ফরেনে সেট্‌ল্ হয়ে গিয়েছে—ফিরবে বলে মনে হয় না। বুড়ো-বুড়ীর বাকি জীবনটা যা পেনসন পাবে তাতেই কেটে যাবে। রথীনকে একটা ফোন করে দেখ্ তো থানায় আছে কিনা। সে সঙ্গে থাকলে বিরাজমোহনের গৃহে প্রবেশের ব্যাপারটা সহজ হবে।

।। দশ ।।

রথীন সিকদার সুব্রতর ফোন পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটীর গৃহে চলে এল। সে ঐ সময় থানায়ই ছিল।

সুব্রত ফোনে বলেছিল কেবল, কিরীটী তাকে একটিবার দেখা করতে বলেছে কাল সকালে। কিন্তু রথীনের যেন তর সইল না, সে চলে এল ফোন পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে।

রাত তখন প্রায় নটা হবে।

কি ব্যাপার কিরীটী, হঠাৎ এ অধীনকে স্মরণ কেন? ঘরে ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে রথীন কিরীটীর দিকে প্রশ্নটা যেন ছুঁড়ে দেয়।

বেচারী চাকরিতে প্রমোশন না পেলে কি হবে, জ্বর একটি ভুঁড়ি বাগিয়ে ও সেই সঙ্গে সারা মাথাটাকে সম্পূর্ণভাবেই প্রায় বিরলকেশ করে ফেলেছিল। মাথা-জোড়া চকচকে একটি টাক। চাকরির ব্যাপারে কখনো কোন ত্রুটি করে না রথীন। একমাত্র শয়নের সময়টুকু ছাড়া সর্বদাই দেহে তার ইউনিফর্ম। বিরাট প্রায় দুই-মণী দেহটা নিয়ে সামনের সোফাটার উপর ধপাস্ করে বসে মাথার টুপিটা খুলে পাশে রাখল রথীন।

কিরীটী ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললে, রথীন, আরো একসট্রা কত কেজি অ্যাড হল দেহে!

আর বলিস না কিরীটী। রথীন হাসতে হাসতে জবাব দেয়, চক্রবৃদ্ধিহারে সুদের মত বেড়েই চলেছে চর্বির লেয়ার দেহের ভাঁজে ভাঁজে।

আর সুগার?

রথীনের ডায়বেটিস আছে। রথীন হাসতে হাসতে জবাব দেয়, ওসব আর ভাবি না। দু'বেলা দুটো ইনসুলিন ইনজেকশন নিয়েই চলেছি—

আর রসগোল্লা সন্দেশ?

চলছে—চলবে—চলতিকা নাম গাড্ডি!

মরবি—তোর ঐ লোভই একদিন—

খতম করবে আমাকে জানি। ও ভি হাম্ সোচতা নেহী! মরদকা বাত হাতীকা দাঁত—যো যো হোনা সো সো হোগা!

কিরীটী হো হো করে হেসে উঠে বলে, That's like a soldier—real soldier!

যেতে দে ওসব কথা, এখন কি ব্যাপার বল্ তো?

বলছি, আগে একটু জিরিয়ে নে। হাঁপাচ্ছিস তো!

একটুও না। যা দেখছিস ও সামান্য একটু dilated heart—রথীন বলে, কিন্তু তোর গিন্নী গৃহে নেই?

আছে। আর এতক্ষণে তোর আগমনবার্তা সুনিশ্চিত তার কর্ণকুহরে প্রবেশ

করেছে। তোর এক মগ কফি এল বলে!

রথীন যখনই কিরীটীর গৃহে আসে কৃষ্ণা তার জন্য নির্দিষ্ট একটি মগে এক মগ কফি করে আনে।

কিরীটীর বাড়ির কফির কাপগুলোতে নাকি রথীনের মতে দুই চামচের বেশী কফি ধরে না—কাজেই সেটা পান করাও যা, না পান করাও তাই।

অতএব ঐ বিশেষ ব্যবস্থা।

সত্যিই একটু পরে কৃষ্ণা হাসতে হাসতে কফির মগটা হাতে কক্ষে এসে প্রবেশ করল, সিকদার সাহেব, এই নিন আপনার কফি!

কফির মগটা হাতে নিয়ে দীর্ঘ একটা চুমুক দিয়ে রথীন বলে, আঃ, বাঁচালেন মিসেস রায়। বিলিতী কায়দায় থ্যাংক্‌উ আর দেবো না, বহুৎ বহুৎ সুক্রিয়া—

সুব্রত হেসে বলে, সিকদার সাহেবের প্রমোশন এবারে বোধ হয় আর ঠেকানো যাবে না। যেভাবে ওর রাষ্ট্রভাষার প্রতি দরদ উছলে উঠছে দিল্লীওয়ালারা কোন-ক্রমে একবার জানতে পারলে প্রমোশন তো নিশ্চয়, সেই সঙ্গে একটা পদ্মশ্রীও ফাউ মিলে যেতে পারে।

ওসবে আর 'আকিঙ্কে' নেই সুব্রতবাবু। কফির মগে চুমুক দিতে দিতে রথীন সিকদার ব্যক্ত করে।

সিকদার সাহেব বরাবর 'আকাঙ্ক্ষা'কে 'আকিঙ্কে' বলে।

কিন্তু ব্যাপারটা কি কিরীটী? অধমের কথা যখন স্মরণপথে উদয় হয়েছে, মনে হচ্ছে কোথাও একটা খুনখারাপির সংবাদ উহ্য হয়ে আছে!

কিরীটী হাসে।

ও হাসি তোমার ভাই আরো অর্থবহ—সিকদার বলে।

তাই বুঝি?

হুঁ। কোন চিন্তা যখন তোমার ঐ মস্তিষ্কে ঘুরপাক খায় তখুনি দেখি কিনা—হয় খুব গম্ভীর নচেৎ নিঃশব্দে মধ্যে মধ্যে মৃদু হাসির ঝলক। এখন কহ বাবা, অধীনকে কেন করেছ স্মরণ!

রথীন, কয়েক দিন আগে তোর এলাকায় ঝাউতলার এক বাড়িতে একটি তরুণীকে হত্যা করা হয়েছে না? কিরীটী এবারে বলে।

তাই বল্, ঝাউতলা-সংবাদ! তা কি ব্যাপার—why you are interested?

কিরীটী তখন সংক্ষেপে ক'রাত্রি আগে সিনেমার লবিতে যা ঘটেছিল, তারপর পাঁচ বন্ধুর মুখ থেকে মৃতা বাসবী সম্পর্কে যে সংবাদটুকু সংগ্রহ করেছিল বলে সিকদারের দিকে তাকাল।

রথীন বলে, আমিও বাসবী মেয়েটির হত্যার ব্যাপারটার এখনও কোন হদিস করতে পারিনি, তবে মনে হয়—

কি?

ঐ পঙ্গু প্রৌঢ় আর বলব না, বৃদ্ধই বলব—ঐ বিরাজমোহন হয়তো কিছু জানে, কিন্তু পুলিসকে জানাতে চায় না—একটি বাস্তুঘুঘু মনে হয়—

কিন্তু যত বড়ই বাস্তুঘুঘু হোক, সে নিশ্চয়ই তার একমাত্র ভাইঝিকে ভালবাসত। সুব্রত বলে।

তা হয়ত বাসত, সিকদার জবাব দেয়, তবে ইদানীং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাসবী তার নিজের বিয়ের ব্যাপারটা স্থির করায় বুড়ো বেশ চটেছিল।

কি করে তুই বুঝলি রথীন? কিরীটী প্রশ্ন করে।

কেন, ব্রজেশবাবুই বলেছে।

কবে বলল? তুই দেখা করেছিলি নাকি তার সঙ্গে?

আমি দেখা করিনি, সে নিজেই এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে।

আর কি বলেছিল তোকে ব্রজেশবাবু? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

তার তো ধারণা বাইরের কেউ নয়—ঐ বাড়ির মধ্যেই কেউ সেরাত্রে বাসবীকে হত্যা করেছে। আর তার মধ্যে নিশ্চয়ই ঐ পঙ্গু বিরাজমোহনের হাত আছে।

কেবলমাত্র তার মতের বিরুদ্ধে বাসবী ব্রজেশকে বিয়ে করছিল বলেই তাকে হত্যা করবে?

করতে পারে না কি? তাছাড়া আর একটা কথা আছে—

কি?

বিরাজের একটা অতীত ইতিহাস আছে—

কি রকম?

এবং সে অতীত ইতিহাস ঐ বাসবীর মাকে নিয়েই জড়িত!

তাই নাকি? কিরীটী যেন একটু কৌতূহলই বোধ করে সিকদারের শেষের কথায়।

বাসবীই বলেছিল একদিন কথাটা ব্রজেশকে। সে তার জেঠার ডাইরী থেকে ঘটনাচক্রে পড়েছিল, বিরাজমোহন ও তার ছোট ভাই ধীরাজমোহন একই মেয়েকে ভালবাসত—একটি ইউরেশিয়ান নার্স, ঐ বাসবীর মা—

তারপর?

সেই মেয়েটি অর্থাৎ বাসবীর মা জুনিফার বিরাজমোহনকে না বিয়ে করে শেষ পর্যন্ত ধীরাজকেই বিয়ে করে, যদিও ধীরাজের সঙ্গে জুনিফারের সেপারেশন হয়ে যায় বিয়ের কয়েক বছর পরেই। বাসবী তখন দু'তিন বছরের মেয়ে—

সে মা এখনো বেঁচে আছে বাসবীর? সুব্রত প্রশ্ন করে।

জানি না।

বিরাজমোহনের কাছ থেকে কিছু জানতে পারিসনি?

না, কোনরকমেই মুখ খুলল না।

তা বাসবী তার জেঠার ডাইরী পড়ল কি করে? কিরীটী প্রশ্ন করে।

ঐ বিয়ের ব্যাপারে তার জেঠার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হওয়ায় জ্যাঠা নাকি ওকে বলেছিল, তুমি যে এমন কিছু একটা করবে শেষ পর্যন্ত আমি জানতাম। জুনিফারের রক্তই তো তোমার দেহে!

রথীন?

বল্—

কাল একবার ঐ ঝাউতলার বাড়িতে গিয়ে বিরাজমোহনের সঙ্গে দেখা করতে চাই। বুঝতেই পারছিস জটিল ঐ হত্যারহস্য আমার অনুসন্ধিৎসাকে বেশ একটু ভালভাবেই নাড়া দিয়েছে!

খুব ভাল কথা। তোর মনকে যখন নাড়া দিয়েছে, হয়ত এবারে রহস্যের যবনিকা উত্তোলিত হবে।

কিরীটী হাসল।

কাল কখন যাবি বল্?

তোর যে আর তর সইছে না!

তা যা বলিস। কাল যাবি?

যো হুকুম স্যার, সকালে আটটা নাগাদ আসব।

পরের দিন যথাসময়েই সকালে কিরীটী ও সুব্রত রথীন সিকদারের সঙ্গে বিরাজমোহনের ঝাউতলার বাড়িতে গিয়ে হাজির হল।

ভৃত্য মাধব ওদের বাইরের ঘরে বসতে বলে লাইব্রেরিতে বিরাজমোহনকে সংবাদ দিতে গেল। এবং একটু পরেই বিরাজের লাইব্রেরি ঘরে ওদের যাবার জন্য এসে বলল মাধব। ঘরের মধ্যে ঢুকে চকিতে কিরীটী ঘরের সর্বত্র একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। চারিদিকে আলমারি আর প্রতিটি আলমারি বইয়ে ঠাসা। গায়ে একটা চায়নীজ কিমোনো, মুখে চুরোট, আরাম-চেয়ারটার উপর বসেছিলেন পঙ্গু বিরাজমোহন। ওদের ঘরে ঢুকতে দেখে বিরাজ সকলের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকালেন। কোলের উপর একটা মোটা বই খোলা ছিল, সেটা মুড়ে পাশের ছোট টেবিলটার উপর নামিয়ে রেখে রথীনের দিকে তাকিয়ে তাকেই লক্ষ্য করে বললেন, বসুন মিঃ সিকদার!

সকলে উপবেশন করে।

বিরাজমোহন একটু থেমে যেন বললেন, মনে হচ্ছে বাসবীর মৃত্যুর তদন্তের ব্যাপারেই এসেছেন। কিন্তু এঁদের তো চিনতে পারলাম না—

ইনি কিরীটী রায়—যাঁর কথা গতকাল রাত্রে ফোনে আপনাকে আমি বলেছিলাম, আর উনি সুব্রতবাবু—

হুঁ। তা কিছু হদিস পাওয়া গেল?

না, এখনো তেমন কিছু পাইনি। আরো সেই কারণেই আপনার কাছে কিছু জানব বলে এলাম।

আমি যতটুকু যা জানতাম সবই তো সেদিন বলেছি আপনাকে, আর কি জানাব আপনাকে?

ঐ সময় কিরীটী বলে, যদি কিছু মনে না করেন মিঃ সান্যাল, আমার কয়েকটা প্রশ্ন ছিল—

বিরাজমোহন কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন। কয়েকটা মুহূর্ত স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, কি প্রশ্ন?

বাসবীর মা জুনিফারের কোন সংবাদ আপনি জানেন ?

হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন বিরাজমোহন, তারপর মৃদুকণ্ঠে বললেন, জুনিফারের কথা কার কাছে শুনলেন আপনি ?

শুনেছি। আর এও জানি—

কি জানেন—কি জেনেছেন ?

আপনার ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ের কিছুকাল পরেই তাঁর সেপারেশন হয়ে গিয়েছিল—

ঠিকই শুনেছেন। তবে আমি কি করে জানব বলুন, সে এখনো বেঁচে আছে কি না—আর থাকলেও কোথায় আছে !

আপনি দেখেননি তাঁকে কখনও ? প্রশ্নটা করে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকাল কিরীটী বিরাজমোহনের দিকে।

দেখেছি—

জানতেনও তাঁকে, তাই না ?

জানতাম।

শুধু কি জানাই ?

আর কি !

আমরা জেনেছি—

কি জেনেছেন মিঃ রায় ?

ঐ মহিলাটিকে আপনিও একদিন ভালবেসেছিলেন।

Nonsense !

না—

কি বললেন ?

আপনার ডাইরীটা অন্ততঃ তাই বলে !

আমার ডাইরী ?

হ্যাঁ।

কোথায় দেখলেন সে ডাইরী ?

দেখেছি।

কিরীটীর হঠাৎ যেন মনে হল, সোজাসুজি ঐভাবে প্রশ্ন করায় বিরাজমোহন যেন কেমন একটু আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছেন। কেমন যেন একটু বিব্রত বিমূঢ়।

কি মিঃ সান্যাল, আমি কি মিথ্যা বলেছি ?

না। কিন্তু জানতে পারি কি, কি করে আমার ডাইরী দেখলেন ?

সে কথাটা বলতে পারব না।

বলবেন না ?

তাই মনে করুন—

হুঁ।

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে কেমন যেন ঝিম দিয়ে বসে রইলেন বিরাজমোহন। ওরাও তিনজনে চুপ করেই বসে রইল। তারপর একসময় মুখ তুলে মৃদু গলায় বললেন বিরাজমোহন, জেনেছেনই যখন তখন আর নতুন করে কি জানতে চান!

তবু আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই—

কিন্তু আমার সেই অতীত কাহিনীর সঙ্গে আপনাদের হত্যারহস্যের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

থাকতে পারে বলেই জিজ্ঞাসা করছি মিঃ সান্যাল, নচেৎ করতাম না। কিরীটী জবাব দেয়।

আমার তো মনে হচ্ছে আপনারা সম্পূর্ণ ভুলপথে চলেছেন।

ভুল পথে! কিরীটী বলে।

হ্যাঁ। ভাল করে আপনারা বাসবীর বর্তমান জীবনটারই অনুসন্ধান নিন, হয়ত সেখানেই হত্যারহস্যের কারণ খুঁজে পাবেন। জানেন কিনা আপনারা জানি না, বাসবীর পাঁচটি পুরুষ বন্ধু ছিল—

জানি। কিরীটী পূর্ববৎ মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়, আপনার কি ধারণা বাসবীর মৃত্যুর ব্যাপারে ওরাই জড়িত?

দেখুন মিঃ রায়, প্রেমের খেলা বড় মারাত্মক, সাংঘাতিক খেলা। যাহোক আপনি যখন জানতে চাইছেন আমার অতীত, সবই আপনাকে বলছি।

সংক্ষেপে অতঃপর বিরাজমোহন সব বলে গেলেন। তাঁর জীবনের আদ্যোপান্ত কাহিনী। কেবল ধীরাজের যমজ মেয়ে ও লুসির কথাটা বললেন না।

জুনিফার আজও বেঁচে আছেন কিনা জানেন?

সম্ভবতঃ বেঁচেই আছে।

দেখা হয়েছিল আপনার সঙ্গে তাঁর ঐ রেঙ্গুনের ঘটনার পর?

না।

তবে জানলেন কি করে যে আজো বেঁচে আছেন?

যেভাবেই হোক জানতে পেরেছি।

অতঃপর কিরীটী রথীনের দিকে তাকিয়ে বললে, চল রথীন, দোতলায় বাসবীর ঘরটা একবার দেখব।

চল।

বিরাজমোহন মাধবকে ডেকে ওদের উপরতলায় নিয়ে যেতে বললেন বাসবীর ঘরে।

বাসবীর ঘরে তিনজনে এসে প্রবেশ করল। ঘরে তালা দেওয়া ছিল।

ঘরের মধ্যে সব কিছু ঠিক তেমনই আছে, কেউ কিছু স্পর্শ করেনি। এই ঘরটার মধ্যেই কয়েকদিন আগে বাসবীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। তাকে মৃত অবস্থায় এই ঘরের মেঝের উপরে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল, সেরাত্রে তার শয্যা কেউ স্পর্শও নাকি করেনি।

কিরীটী ঘরের দক্ষিণদিকে তাকাল। দামী একটি সিঙ্গল খাট। তার উপরে

এখনও শয্যা বিস্তৃত। আকাশ-নীল রঙের একটা বেডকভার দিয়ে শয্যাটি ঢাকা।

তার পাশেই শিয়রের দিকে একটি লেখবার টেবিল, সঙ্গে লাগোয়া একটা বুক-শেল্‌ফ। অন্যদিকে একটা কাঠের আলমারি।

একটা চেয়ার টেবিলের পাশেই রাখা। ছোট একটা ত্রিপয়ের মত, কালো কাচের টপ বসানো।

টেবিলের উপরে একটা বই তখনো পড়ে আছে। তার পাশে একটা রাইটিং প্যাড ও ঝরনা কলম—নীল রঙের পার্কার।

জানলার পর্দাগুলোও নীল রঙের। মনে হয় সব কিছুতেই যেন নীল রঙের একটা ম্যাচিং।

কিরীটীর দিকে তাকিয়ে সিকদার বললে, এই ঘরে ঐখানে মৃতদেহ পড়েছিল। বলে সিকদার ঘরের প্রায় মাঝামাঝি একটা জায়গা দেখিয়ে দিল।

কিরীটী সেদিকে তাকালও না। এগিয়ে গেল টেবিলটার সামনে। বইটা তুলে নিল আলগোছে যেন। মমের 'অফ হিউম্যান বনড্‌জ'। বইটার পাতাগুলো উলটে-পালটে দেখে কিরীটী বললে, সেদিনও এই বইটাই এখানে ছিল?

হ্যাঁ। সিকদার বললে।

বইটা রেখে এবারে কিরীটী রাইটিং প্যাডটা তুলে নিল। প্রথম দিকের খান-কয়েক পৃষ্ঠা ছাড়া সব পৃষ্ঠাগুলোই আছে। একটা ব্যাপার কিরীটীর কৌতূহলী দৃষ্টি প্যাডের প্রথম পৃষ্ঠাটায় আকর্ষণ করে, বেশ চেপে লিখলে যেমন লিখিত পৃষ্ঠার নীচের পৃষ্ঠায় একটা দাগ পড়ে তেমনি দাগ রয়েছে সাদা প্রথম পৃষ্ঠায়। এবং সে অক্ষরের দাগ নজরে পড়ে পৃষ্ঠার গোড়ার দিকেই। কিছুক্ষণ দেখল কিরীটী সাদা পৃষ্ঠাটার দিকে তাকিয়ে, তারপর সে পৃষ্ঠাটা প্যাড থেকে ছিঁড়ে সযত্নে ভাঁজ করে নিজের জামার পকেটে রেখে দিয়ে কলমটা তুলে তার নিবটা পরীক্ষা করতে লাগল।

হার্ড—ফাইন নিব!

কলমটাও পকেটে রেখে দিল কিরীটী। তারপর ঘরটা কিছুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

সিকদার, তোরা তো এই বাথরুমের বাইরে যাবার দরজাটাও বন্ধ দেখেছিলি?

হ্যাঁ। তাই তো মনে হয়, হত্যাকারী বাড়ির মধ্যেরই কোন্ লোক ছিল।

॥ এগারো ॥

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বললে সিকদারের কথার জবাবে, ঐ একটিমাত্র যুক্তি ছাড়া তোর আর কোন যুক্তি আছে তোর থিওরির সাপোর্টে?

কেন, তোর কি তা মনে হচ্ছে না? সিকদার প্রশ্নটা করে কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

না। শুধু তাই নয়, তাছাড়া আরো একটা কথা ঐ সঙ্গে এখন মনে হচ্ছে—

কি?

যতই determination নিয়ে সেরাত্রে হত্যাকারী বাসবী দেবীকে হত্যা করতে এসে থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত হত্যা সংঘটিত হবার পর বাসবীকে মৃত দেখে তার নার্ভ ব্রেক করেছিল। সুনিশ্চিত—

মানে?

মানে হত্যার সংকল্প করা কাউকে, মনের কোন গোপন বাসনা—ঈর্ষা বা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ এক জিনিস, আর হত্যার পরে নিহতর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আর এক জিনিস। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখেছি, খুনী তখন এমন বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে যায় হঠাৎ—যার ফলে সে তার আসার চিহ্ন নিজের অজ্ঞাতেই অকুস্থলে রেখে যায়।

বাসবীর ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছিল। অবিশ্যি কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, হত্যাকারী অসাধারণ নার্ভের পরিচয় দিয়েছে—ধীরেসুস্থে এসেছে, তারপর সব কাজ শেষ করে হত্যার সমস্ত চিহ্ন মুছে দিয়ে নিঃশব্দে অকুস্থল থেকে সরে পড়েছে। তবে সেটা খুবই রেয়ার। বাসবীর হত্যাকারী প্রথম পর্যায়ের ছিল, যার ফলে তার বিরুদ্ধে একটা মস্ত বড় প্রমাণ সে ঘরের মধ্যে ফেলে রেখে গিয়েছে তার অজ্ঞাতেই—

কি প্রমাণ?

তার উপরে যার দ্বারা সহজেই সন্দেহ পড়তে পারে সেই প্রমাণটা।

কিন্তু কি সে প্রমাণ?

বাসবীর রাইটিং প্যাডের অলিখিত সাদা একটি কাগজ ও তার ঝরনা কলমটা।

কী ঠিক বলতে চাস তুই কিরীটী? সিকদার প্রশ্ন করে।

আপাততঃ যেটুকু এইমাত্র বললাম তার বেশী কিছুই নয়। তার পরেই সহসা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায় কিরীটী। বলে, আচ্ছা রথীন—

কি?

বাসবীর ঝি শ্যামা এখনো এই বাড়িতে আছে না?

আছে।

তাকে একবার ডাকতে পারিস এই ঘরে?

মাধব এতক্ষণ ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়েছিল রথীনের নির্দেশে, তাকে ডেকে রথীন শ্যামাকে ডেকে আনতে বললে।

মাধব নীচে চলে গেল এবং একটু পরেই শ্যামাকে নিয়ে মাধব এসে ঘরে ঢুকল।

মাধব তুমি বাইরে দাঁড়াও, প্রয়োজন হলে আবার ডাকব। কিরীটী বললে।

মাধব চলে গেল ঘর ছেড়ে।

শ্যামার দিকে তাকাল কিরীটী এবারে।

বয়স শ্যামার ত্রিশ-বত্রিশের বেশী হবে না। পাতলা দোহারা চেহারা। যৌবনটা যেন একটু বেশীই উগ্র—তাকালেই চোখে পড়ে শ্যামার কিছুটা হয়ত বা ইচ্ছা-

কতই অগোছালো বেশভূষার ফাঁকে।

গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামার। মুখটা একটু লম্বাটে ধরনের। চোখ দুটো ছোট, কিন্তু কাজল টানায় বড় বড় মনে হয়। নাকটা একটু চাপা। কপালের উপর একটা উল্কি।

পরনে সরু কালোপাড় একটা তাঁতের শাড়ি। হাতে একগাছি করে সরু সোনার বালা। রাঙা ঠোঁট দেখে বোঝা যায় একটু আগে পান চিবুচ্ছিল।

তোমার নাম শ্যামা? কিরীটীই প্রশ্ন করে।

আজ্ঞে।

এ বাড়িতে তুমি দিদিমণির কাজ কত দিন হল করছ?

বছর তিনেক হবে বাবু।

কেবল দিদিমণির কাজ করতে, না অন্য কোন কাজও তোমাকে করতে হত?

না, একমাত্র দিদিমণিরই কাজ করতাম আমি। তার জন্যই তো আমাকে রাখা।

তাহলে বল দিদিমণিরই খাস দাসী ছিলে তুমি?

আজ্ঞে।

এখন কি কর?

কি আর করব, বলতে গেলে বসেই আছি।

বুড়ো বাবু তোমাকে তাহলে ছাড়িয়ে দেননি?

না। কর্তা বললেন কোথায় আর যাবে—এখানেই থাকতে, তবে বসে থাকতে কি ভাল লাগে—তাই এটা-ওটা করি যা মাধবদা করতে বলে।

বুড়ো বাবুর কাজ কর না? কিরীটী প্রশ্নটা করে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে শ্যামার মুখের দিকে তাকাল।

না। এক মাধবদা ছাড়া বুড়ো বাবুর ঘরে ঢুকবার কারো অর্ডার নেই।

তুমি তো এই ঘরের পাশের ঘরেই থাক, তাই না শ্যামা?

আজ্ঞে।

শ্যামা?

আজ্ঞে বলুন।

সেরাত্রে মানে তোমার দিদিমণিকে যেদিন হত্যা করে—তুমি তো ঐ পাশের ঘরেই ছিলে?

ছিলাম তো—

অথচ তোমার দিদিমণিকে একজন এসে গলা টিপে খুন করে রেখে গেল, তুমি কিছুই জানতে পারলে না?

আজ্ঞে সেরাত্রে আমার বড্ড মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল বলে দিদিমণির কাছ থেকে দুটো স্যারিডন বড়ি চেয়ে নিয়ে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

তখন কত রাত হবে?

তা রাত নটা হবে—

তাহলে তুমি কিছুই জান না? যা পুলিসকে বলেছ তার বেশী কিছুই না?

না, আজ্ঞে। কেমন যেন একটু ইতস্তত—একটু দ্বিধার সুর শ্যামার গলার স্বরে।

কিন্তু আমি যদি বলি, তুমি অনেক কিছুই জান কিন্তু পুলিসকে জানাওনি সব কথা!

না, না—আমি কিচ্ছু জানি না বাবু, মা কালীর দিব্যি বিশ্বাস করুন—

দিদিমণির ঘরে সেরাত্রে কেউ একজন এসেছিল—ধর এই দশটা সোয়া দশটা নাগাদ, তুমি জানতে পারনি বলতে চাও?

আজ্ঞে কি বলছেন আপনি! কে আসবে অত রাত্রে দিদিমণির ঘরে আর কেমন করেই বা আসবে? রাত নটায় তো গেট বন্ধ করে দেয় রোজ দরোয়ান—

কেন, বাড়ির পিছনের পাঁচিল টপকে বাগান দিয়ে যদি কেউ আসে?

পাঁচিল টপকে!

হ্যাঁ, তারপর দিদিমণির এই ঘরের ঐ বাথরুমে মেথরদের যাতায়াতের জন্য যে লোহার ঘোরানো সিঁড়িটা আছে পিছনে—সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে বাথরুম দিয়ে এই ঘরে এসে ঢুকতে পারে!

কিন্তু পরের দিন তো বাথরুমের পিছনের দরজা বন্ধ ছিল সবাই দেখেছেন।

সেটা তো পরেও বন্ধ করে দেওয়া যায়, মানে কেউ বন্ধ করে দিতে পারে!

কিন্তু সে দরজাটা তো কখনও খোলা থাকে না।

কেউ যদি আগে থাকতে খুলে রেখে দেয়!

কে খুলে রাখবে?

কেন, তোমার দিদিমণি—কিংবা মাধব বা তুমিও তো রাখতে পার!

আ—আমি—

হ্যাঁ।

না, না—আমি কেন খুলে রাখতে যাব! বিশ্বাস করুন বাবু, এসব আমি কিছু করিনি।

কত করে এখানে মাইনে পাও তুমি শ্যামা?

খাওয়া-পরা পঞ্চাশ টাকা।

বাড়িতে মানে দেশে তোমার কে কে আছে?

কেউ নেই। আমি বিধবা।

কত বছর বয়সে বিধবা হয়েছ?

চোদ্দ বছর বয়েসে।

কলকাতা শহরে কতদিন আছ?

এ বাড়িতে চাকরি নিয়েই প্রথম আসি, তার আগে দেশেই ছিলাম।

কি করে এখানে চাকরি হল তোমার?

এ বাড়িতে যে রাঁধে, শিবুকাকা—আমার দূরসম্পর্কের কাকা হয়, সে-ই এখানে এনে আমাকে চাকরি করে দেয়।

দেশ কোথায় তোমার?

ঘাটাল—মেদিনীপুর জেলা।

তোমার দিদিমণির বিয়ের সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল, জানতে তুমি ?

জানতাম।

কার কাছে শুনলে ?

দিদিমণিই বলেছিল।

কার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছিল জান ? শুনেছিলে কিছু ?

হ্যাঁ, ব্রজেশবাবুর সঙ্গে।

তোমার বুড়ো বাবুর ঐ বিয়েতে মত ছিল না জানতে ?

শুনেছিলাম।

কার কাছে শুনেছিলে ?

মাধবদার কাছে।

শ্যামা ?

আজ্ঞে—

তুমি পুলিসের কাছে বলেছ, সেরাত্রে সাড়ে নটা নাগাদ তুমি দিদিমণির এই ঘরে ঢুকে এসে তাকে খাবার কথা বলেছিলে, তাই তো ?

আজ্ঞে।

তাহলে একটু আগে তুমি যে বললে, রাত নটা নাগাদ সেরাত্রে মাথা ধরার জন্য তুমি তোমার দিদিমণির কাছ থেকে দুটো স্যারিডন চেয়ে নিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়েছিলে, সেটা ঠিক নয় ! ট্যাবলেট খেয়েই তুমি শুয়ে পড়োনি, ঘুমোওনি—আরো অনেকক্ষণ জেগে ছিলে !

আজ্ঞে সময়টা ঠিক মনে নেই, ঐরকমই হবে—নটা সাড়ে নটা রাতই হবে। দিদিমণি খাবেন না জেনে ফিরে এসে ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। তার পরই ঘুমিয়ে পড়েছি।

না। আমি বলছি রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত তুমি জেগেছিলে সেরাত্রে—তুমি মিথ্যা বলছ, তাই ঠিক না ?

আজ্ঞে, হয়ত তাই হতে পারে আপনি যা বলছেন !

তাই হয়েছিল। আর তুমি জান কে সেরাত্রে দিদিমণির ঘরে এসেছিল—বল কে এসেছিল ?

আমি কাউকেই সেরাত্রে দিদিমণির ঘরে আসতে দেখিনি বাবু, বিশ্বাস করুন।

হঠাৎ কিরীটীর কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে ওঠে, সে বলে, মিথ্যে কথা ! তুমি জান—বল সে কে ? নচেৎ বুঝতেই পারছ তোমাকে দারোগাবাবু এখনই গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরে দেবেন, তারপর হয়ত খুনের দায়ে তোমার ফাঁসিও হয়ে যেতে পারে।

না, না বাবু—দোহাই আপনার, আমি কিছুই জানি না। আমি কিছু দেখিনি—কিছু শুনিনি, বিশ্বাস করুন। শ্যামা কান্নায় ভেঙে পড়ে।

কেঁদে কোন ফল হবে না শ্যামা। বাঁচতে চাও তো সত্যি কথা বল।

আজ্ঞে আমি—

বল—থামলে কেন, বল! বল কে এসেছিল সেরাত্রে দিদিমণির ঘরে ?

আজ্ঞে সত্যি বলছি, আমি কাউকে ঢুকতে দেখিনি। তবে—

তবে কি ?

পাশের ঘরে একটা গোঁ গোঁ শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি দিদিমণির ঘরে ছুটে যাই, কিন্তু ঘর অন্ধকার ছিল তখন—

তারপর ?

আলো জ্বালতে প্রথমটায় সাহস হয়নি। ভয়ে হাত-পা তখন আমার ঠকঠক করে কাঁপছিল। একটু পরে আলো জ্বালিয়ে দেখি, দিদিমণি ঐখানে মেঝের উপর পড়ে আছে। বাথরুমের দরজাটা খোলা—সেটাও অন্ধকার। বাথরুমের আলো জ্বালিয়ে দেখি, মেথরদের যাবার দরজাটাও বাথরুমের হা-হা করছে খোলা। সেই সময়ই বাথরুমের জানালাপথে চোখে পড়ল আমার অল্প অল্প চাঁদের আলোয়, কে যেন একজন বাগানের পাঁচিল টপকে ওদিকে চলে গেল।

তারপর তুমি কি করলে ?

ঘরে ফিরে এলাম। দিদিমণি তখনো পড়ে আছে মেঝেতে। তাকে নাড়া-চাড়া করতেই বুঝলাম দিদিমণি বেঁচে নেই, মারা গিয়েছে। কষ বেয়ে রক্ত পড়ছে। ভয়ে হাত পা তখন আমার ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। দিদিমণির ঘরের দরজা টেনে আলো নিভিয়ে নিজের ঘরে এসে খিল তুলে দিই। সারাটা রাত ঘুমোতে পারিনি, জেগেই কাটিয়েছি। তারপর—

তখুনি বাড়ির সবাইকে ডেকে ব্যাপারটা জানালে না কেন ?

ভয়ে বাবু।

হুঁ। তারপর পরের দিন তো তুমিই সকালে মাধবকে ডেকে তোমার দিদি-মণির মৃত্যুর খবরটা জানাও ?

আজ্ঞে।

পুলিসকে সব কথা জানাওনি কেন ?

ভয়ে বাবু। যদি আমাকে সন্দেহ করে পুলিস—

আচ্ছা সেরাত্রে তো বেশ চাঁদের আলো ছিল, তাই না ?

আজ্ঞে—অল্প অল্প।

তবে পাঁচিল টপকে যে পালাচ্ছিল, তাকে দেখে চিনতে পারোনি বলছ কেন ?

আজ্ঞে না, সত্যিই চিনতে পারিনি। বিশ্বাস করুন, চিনতে পারলে বলব না কেন ?

আচ্ছা শ্যামা, তোমার দিদিমণির বন্ধুদের নিশ্চয় সকলকে তুমি দেখেছ, চেনোও—

আজ্ঞে—

সবাই আসত দিদিমণির ঘরে তোমার ?

সবাই না—

কে কে আসত তবে ?

ব্রজেশবাবু ও রঞ্জনবাবু। তবে ইদানীং কয়েক মাস রঞ্জনবাবুকে আসতে দেখিনি—ব্রজেশবাবুই আসতেন।

আর কেউ কখনও আসেনি ?

আজ্ঞে সুনীলবাবু বার দুই এসেছেন, আর—

আর কে ? সুহাসবাবু, অভিজিৎবাবু ?

আজ্ঞে না, ওঁদের কখনও আসতে দেখিনি। তবে ঐ ঘটনার দিন কুড়ি আগে হবে, একজন সাহেব ওর সঙ্গে রাত্রে দেখা করতে এসেছিল, দিদিমণি তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে কথা বলেছিল অনেকক্ষণ।

কে সে ?

আজ্ঞে চিনি না। দেখিনি আগে কখনও তাকে। ঐ একবারই সে এসেছে—আর কখনো আসেওনি।

কি রকম দেখতে তাকে ?

ভাল করে দেখিনি—তবে লম্বা রোগা, পরনে পুরানো কোট-প্যাণ্ট ছিল, মাথায় একটা টুপি।

সে সাহেব কি করে জানলে ? টকটকে ফরসা রঙ ছিল ?

বলতে পারি না, তবে মাধব বলেছিল সাহেব—

হুঁ। আচ্ছা তোমার বুড়ো বাবু কখনও উপরে দিদিমণির ঘরে আসতেন না ?

বার দুই আসতে দেখেছি এখানে আসবার পর তাঁকে এই ঘরে—

শেষ কবে দেখেছ ?

যেদিন দিদিমণি মারা যায়, তার আগের দিন সন্ধ্যার সময়।

তুমি তখন কোথায় ছিলে ?

দিদিমণির ঘরেই ছিলাম। বুড়ো বাবু ঘরে ঢুকে আমাকে বের হয়ে যেতে বলেন। আমি বের হয়ে এসেছিলাম।

তাঁদের মধ্যে কি কথা হয়েছিল জান না ?

না। তবে সুহাসবাবুর নাম একবার শুনেছিলাম।

হুঁ, আচ্ছা যাও। মাধবকে একবার ঘরে পাঠিয়ে দাও।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামা ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ কিরীটী তাকে সম্বোধন করে বললে, একটা কথা মনে রেখো শ্যামা, পুলিসকে না জানিয়ে, পুলিসের অনুমতি না নিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে যাবার চেষ্টা করো না। তাহলেই পুলিস তোমাকে গ্রেপ্তার করবে, বুঝেছ ?

আজ্ঞে।

যাও।

শ্যামা চলে গেল। একটু পরে মাধব এসে ঘরে ঢুকল।

মাধব !

বলুন ?

তোমার দিদিমণি যে রাত্রে খুন হয়, তার দিন কুড়ি আগে শ্যামা বললে কে

একজন সাহেব নাকি এসেছিল তোমার দিদিমণির সঙ্গে দেখা করতে সন্ধ্যায়—কে সে জান ?

আজ্ঞে জানি সেকথা, কিন্তু জানি না সে কে এসেছিল—

লোকটা বাঙালী ?

না। ট্যাঁস ফিরিঙ্গী সাহেব বলে মনে হয়।

কি নাম বলেছিল ?

কোন নাম বলেনি, কেবল একটা চিঠি দিয়ে বলেছিল দিদিমণিকে দিয়ে তার জবাব এনে দিতে।

তারপর ?

দিদিমণি তাকে তার ঘরে ডেকে পাঠায় !

তোমার কত্তাবাবু—মানে সাহেব জানেন সে কথা ?

না।

তুমি বলোনি ?

না।

।। বারো ।।

কেন বলোনি ? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

দিদিমণি বলতে মানা করেছিল তাই।

ব্রজেশবাবুর সঙ্গে তোমার দিদিমণির বিয়েতে তোমার সাহেবের মত নেই, তুমি জানতে মাধব ?

জানতাম।

সাহেবই কি বলেছিলেন তোমাকে কথাটা ?

না। দিদিমণি আর সাহেবের মধ্যে যখন কথা হয়, আমি দরজার বাইরেই ছিলাম—সব শুনতে পাই।

শ্যামাকে তুমি সেকথা বলেছিলে ?

আজ্ঞে না।

বলোনি ?

না বাবু।

কিন্তু সে যে বললে, তুমিই তাকে বলেছ কথাটা ?

ওর কথা বিশ্বাস করবেন না বাবু, ও একটা নষ্টচরিত্রের মেয়ে—মিথ্যা বলেছে।

হুঁ। আচ্ছা মাধব, তোমার দিদিমণির বন্ধুদের তো তুমি সকলকেই জানতে ?

জানতাম।

সকলকেই চেনো ?

চিনি।

কে কে এখানে আসত ?

আগে আগে রঞ্জনবাবু, ব্রজেশবাবু, সুনীলবাবু ও সুহাসবাবু সকলেই আসতেন, তবে ইদানীং রঞ্জনবাবু ও ব্রজেশবাবু ছাড়া কাউকে আসতে দেখিনি বড় একটা। তাও ইদানীং রঞ্জনবাবুও কয়েক মাস আসতেন না—

রঞ্জনবাবু শেষ কবে এসেছেন বলতে পার ?

দিদিমণি খুন হবার দিন সাতেক আগেই তো এসেছিলেন এক রবিবারে—

কখন ? কোন্ সময় ?

দুপুরে।

শ্যামা তো সেকথা বলল না !

হয়ত ও জানে না—

কেন, সে তো শুনলাম সব সময়ই বাড়িতে থাকত ?

হ্যাঁ থাকত, তবে—

তবে কি ?

মাধব মাথাটা নীচু করে।

কি, চুপ করে গেলে কেন ? কি বলছিলে বল ?

বললাম তো বাবু, ওর স্বভাবচরিত্র ভাল না। ওর কে এক ভাই প্রায় দুপুর-বেলা আসত, তাকে নিয়ে নীচের ঘরে কি সব কথাবার্তা বলত—

তোমাদের ঠাকুরই তো শ্যামাকে এ বাড়িতে এনে কাজে দেয় ?

আজ্ঞে।

ঠাকুর জানে না ? তাকে চেনে না ?

পতিতকে কখনও আমি জিজ্ঞাসা করিনি।

কেন জিজ্ঞাসা করনি ?

কি দরকার বাবু অন্যের ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে !

তোমার সাহেব কথাটা জানেন ?

না, বলিনি।

কেন ?

সাহেব তাহলে দূর করে দেবেন ওকে তখুনি, তাই—

হুঁ। আচ্ছা তুমি যেতে পার।

আরো কিছুক্ষণ পরে ওরা বের হয়ে এল বিরাজমোহনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঝাউতলার বাড়ি থেকে। পথে গাড়িতে রথীন বলে, শ্যামাকে ভাবছি অ্যারেস্ট করব।

তাড়াহুড়া করিস না রথীন। কিরীটী বলে।

কিন্তু ও যদি পালায় ?

পালাবে না।

কি করে বুঝলি ?

অবৈধ যৌন সম্পর্কের নিগড় বড় কঠিন নিগড়, অত সহজে ছেঁড়ে না।

অবৈধ যৌন সম্পর্কের নিগড়!

হ্যাঁ। তার সত্যি নাগরটি যে কে এখনও বুঝতে পারিনি—

মানে?

মানে পরে প্রকাশ্য।

রথীনকে থানায় নামিয়ে দিয়ে কিরীটী যখন তার গৃহে এসে পেঁছিল, বেলা তখন পৌনে একটা।

ড্রয়িংরুমে ঢুকে দেখে সুহাস বসে আছে একটা সোফায়।

আরে সুহাসবাবু যে! কতক্ষণ?

তা প্রায় ঘণ্টাতিনেক হবে। সুহাস বললে।

মনে হচ্ছে খুব জরুরী ব্যাপার কিছু! কিরীটী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে।

আজ্ঞে একটা ব্যাপার ঘটেছে, যার মাথামুণ্ডু কিছুই এখনও বুঝে উঠতে পারছি না। সুহাস বললে।

কিরীটী সোফার উপর বসল। সুব্রতও পাশে বসল।

কি ব্যাপার বলুন তো?

অবিকল ঠিক বাসবীর মতনই দেখতে একজনকে গতকাল সন্ধ্যায় মার্কেটে আমি দেখেছি। প্রথমটায় তো দেখে চমকে উঠেছিলাম, এমন অদ্ভুত resemblance—যেন ঠিক বাসবীই, বাসবী মৃত না হলে মনে করতাম সেই বুঝি—

তা অনেক সময় ওরকম resemblance কি দেখা যায় না সুহাসবাবু? সুব্রত বলে।

তা নয় সুব্রতবাবু, resemblance থাকে কিন্তু ওরকম হুবহু ঠিক একই রকম দেখতে একমাত্র যমজ ছাড়া হতে পারে বলে আমার মনে হয় না।

সুব্রত জবাব দেয়, বাসবী দেবীরও তো কোন যমজ বোন থাকতে পারে!

তা থাকলে কি আমরা জানতে পারতাম না? বাসবী তার মা-বাপের একমাত্র সন্তান। সুহাস বললে।

কিরীটী ঐ সময় প্রশ্ন করে, চেহারাটা তো একই রকম বললেন—বেশভূষা কি ছিল মেয়েটির?

সাধারণ বেশভূষা। যেমন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের হয়ে থাকে। তাছাড়া আরো একটা ব্যাপার আছে—

কি বলুন তো? কিরীটী প্রশ্ন করে সুহাসের মুখের দিকে তাকাল।

হঠাৎ মেয়েটির সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিল। তারপরই মনে হল মেয়েটি যেন আমার দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। তারপর একটু থেমে সুহাস বললে, সেরাত্রে সিনেমার কথা হয়ত আপনার মনে আছে মিঃ রায়, সেরাত্রে সুনীলের জীবনের উপরে attempt হয়েছিল—

মনে আছে বইকি।

অবিকল বাসবীর মতই একজনকে সেরাত্রে সিনেমার সামনের রাস্তাটা ক্রস করতে দেখেই আমি চমকে উঠেছিলাম।

কিরীটী বললে, হ্যাঁ, মনে পড়ছে—

আর একটা ব্যাপারও আজ মনে হয়, আপনাকে আমার জানানো উচিত মিঃ রায়। সুহাস বললে।

কি সুহাসবাবু?

মাস দুয়েক আগেও ঠিক অমনি একটা ব্যাপার ঘটেছিল। অবিশ্যি ব্যাপারটা একজন ছাড়া কেউ জানে না।

কি ব্যাপার বলুন তো?

মাস দুই আগে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার দিকে শিয়ালদহ স্টেশনে, সুহাস বললে, বাসবীর মতই একজনকে দেখেছিলাম আমি। তাকে বাসবী বলে ডেকে এগিয়ে যাই, কিন্তু কোন সাড়া দেয় না আমার ডাকে, সে চলে যায়। পরে আমি বাসবীকে একদিন কথাটা বলায়—বাসবী আমার ডাকে কেন সাড়া দিলে না, আমাকে কি চিনতে পারনি, তাতে বাসবী হাসতে হাসতে বলেছিল, মাথা খারাপ নাকি সুহাস! আমাকে ডেকেছ, অথচ আমি সাড়া দিইনি? তাছাড়া ঐদিন শিয়ালদহ স্টেশনেই আমি যাইনি, দেখবে কোথা থেকে আমাকে! আমি তখন বলি, আমার ভুল হতে পারে না, হয়ওনি বাসবী, তোমাকেই আমি দেখেছি। বাসবী অতঃপর হাসতে হাসতে বলেছিল, কি ব্যাপার বল তো সুহাস? সর্বত্রই এখন আমাকে দেখছ নাকি প্রহ্লাদের হরিদর্শনের মত! সত্যি করে বল তো, তুমিও কি আমার প্রেমে পড়লে শেষ পর্যন্ত? কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে মিঃ রায়, সুহাস একটু থেমে বললে, আমি বোধ হয় ঐ মেয়েটিকেই দেখেছিলাম আর তাকেই আমি আবার গতকাল মার্কেটে দেখেছি।

কিরীটী চুপচাপ বসে সুহাসের কথা শুনছিল, হঠাৎ সুহাসের কথা শেষ হতেই প্রশ্ন করে, সুহাসবাবু, একটা প্রশ্ন আছে আমার—

প্রশ্ন?

হ্যাঁ। আপনিও বাসবী দেবীকে ভালবাসতেন, তাই না?

সুহাস মাথাটা নীচু করে।

বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা বাসবীদেবী কি জানতেন কথাটা?

না, জানত না। কখনও জানতে দিইনি তাকে।

কেন?

কারণ আমি জানতাম সে ব্রজেশকেই ভালবাসে।

হুঁ। তাহলে দেখা যাচ্ছে—আপনি ব্রজেশবাবু, রঞ্জনবাবু ও সুনীলবাবু বাসবী দেবীকে ভালবেসেছিলেন—চারজনেই তাঁকে চেয়েছিলেন।

চেয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু যে মুহূর্তে জানতে পেরেছিলাম বাসবী আসলে ভালবাসে ব্রজেশকেই, নিজেকে আমি গুটিয়ে নিয়েছিলাম। বললাম তো আপনাকে এইমাত্র—তাছাড়া সেকথা সে কখনও জানতেও পারেনি।

কিন্তু আপনার মন—

আমার মন!

হ্যাঁ, সে কি বাসবী দেবীকে ভুলতে পেরেছিল?

না। আর আজও ভুলতে পারিনি কিরীটীবাবু—কোন দিনই হয়ত পারব না। আচ্ছা আজ তাহলে এবারে আমি উঠি—বলতে বলতে সুহাস উঠে দাঁড়াল।

একটা কথা, যা বললেন এইমাত্র আর কাউকে সেকথা জানিয়েছেন?

না।

কাউকে তাহলে বলবেন না যা আমাদের বললেন।

বেশ। নমস্কার। সুহাস ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মৃদু স্বগতোক্তির মত বললে, বেচারী বাসবী! এখন বুঝতে পারছি শেষ পর্যন্ত প্রেমই তাকে গরল হয়ে দংশন করেছিল।

সুব্রত বললে, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে কিরীটী—

কি?

সেরাত্রে ঐ পাঁচ বন্ধুরই একজন বাসবীর শয়নঘরে প্রবেশ করেছিল।

হতে পারে আবার নাও হতে পারে, কিন্তু তার আগে আমাদের জানতে হবে দুর্ঘটনার কয়েকদিন আগে যে সাহেব বাসবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সে কে?

সে ওদেরই একজন তো হতে পারে!

তাহলে শ্যামা নিশ্চয়ই চিনতে পারত।

শ্যামা হয়ত মিথ্যা বলেছে—

অনেক কিছু গোপন করে গিয়েছে শ্যামা ঠিকই কিন্তু ঐ ব্যাপারে মনে হয় মিথ্যা বলেনি, তাছাড়া এইমাত্র সুহাসবাবু যা বলে গেলেন সেটাও ভাববার কথা।

কি, ঠিক বাসবীর মত দেখতে আর একজন?

হ্যাঁ।

তোর কি মনে হয়?

একজন কেউ আছে ঠিকই, কারণ দু-দুবার সুহাসের চোখে সে তাহলে পড়ত না। এবং সম্ভবতঃ এই শহরে তার যাতায়াত আছে। কথা হচ্ছে এখন, সে মহিলাটি accidentallyই বাসবীর মত দেখতে এবং সম্পূর্ণ এক তৃতীয় ব্যক্তি, না এ নাটকের সেও একজন আপাতত অদৃশ্য পাত্রী!

বাসবীরই কেউ সে তাহলে বলতে চাস?

জোর গলায় এই মুহূর্তে কিছু বলতে পারছি না সুব্রত, তবে—

কি তবে?

না, কিছু না।

কিরীটী হঠাৎই যেন চুপ করে গেল একেবারে। সুব্রত বুঝতে পারে, ঐ মুহূর্তে কোন একটি প্রশ্ন কিরীটীর মনের মধ্যে আবর্ত রচনা করেছে এবং তার সমস্ত চেতনা তার মধ্যেই আপাতত ডুবে আছে। বেলাও হয়ে গিয়েছিল, সুব্রত নিঃশব্দে উঠে পড়ল।

কিন্তু বিকেলের দিকেই আবার এসে কিরীটীর গৃহে হাজির হল, না এসে পারল না।

কিরীটী তার বসবার ঘরে একা একা বসে পেসেন্স খেলছিল। কৃষ্ণা পাশে বসে, একটা উলের বুনানি নিয়ে ব্যস্ত।

দুজনেই দুজনের কাজ করে চলেছে আপনমনে, কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না।

সুব্রতর পদশব্দে কিরীটী ওর দিকে তাকাল, তারপরই নিজের খেলায় মগ্ন হয়ে রইল।

ঘণ্টা-দেড়েক পরে, তখন চারিদিকে সন্ধ্যার ঘোর নেমেছে, কিরীটী হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, সুব্রত!

কি?

একটা ব্যাপার আমার জানা দরকার—

কি?

ব্রজেশ, রঞ্জন, সুহাস ও সুনীল এই চারজনের মধ্যে কে কতখানি বাসবীকে ভালবাসত!

অর্থাৎ কার ভালবাসা ওদের মধ্যে সব চাইতে বেশী উগ্র ছিল?

ঠিক তাই। কিন্তু কেমন করে জানা যায় বল্ তো?

সেটা জানা তোর পক্ষে খুব একটা কি কঠিন ব্যাপার!

না—

কিন্তু একটা কথা, তাহলে কি সত্যিসত্যিই তোর ধারণা হয়েছে ঐ প্রেমের মধ্যেই মৃত্যুগরল লুকিয়ে ছিল? সুব্রত প্রশ্ন করে।

ধারণাটা হওয়া তো খুব অন্যায় নয়। কারণ প্রেম যদি উগ্র হয় তো সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে কখনও সহ্য করতে পারে না, আর সেসময় সে ভালমন্দ হিতাহিত বিচারটুকুর সবই হারিয়ে ফেলে।

কাকে তোর সন্দেহ হয়?

কাকে নয়—প্রত্যেককেই হয়। হওয়াই তো উচিত এক্ষেত্রে।

সুব্রত বুঝতে পারে, কোথায়ও একটা দ্বন্দ্ব এখন কিরীটীর মনকে পীড়া দিচ্ছে। সে কুয়াশার মধ্যে এখনও পথ খুঁজে ফিরছে।

কিন্তু একটু কফি হলে এ সময় মন্দ হত না কৃষ্ণা! কিরীটী মৃদু হেসে প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়।

কৃষ্ণা মৃদু হেসে সেলাইটা হাতে নিয়ে উঠে পড়ল এবং ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

খুব জটিল বলে মনে হচ্ছে নাকি তোর বাসবী-হত্যা-রহস্য? সুব্রত আবার প্রশ্ন করে।

জটিল—তা একটু জটিল বইকি। অনেকগুলো interested persons চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে—ফলে analysisটা একটু জটিলই হয়ে দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা তুইই বল্ না, কে হত্যাকারী হতে পারে বাসবীর?

সন্দেহ কারও কারও উপরে পড়ছে বটে, তবে—

কি তবে ?

শক্ত মাটিতে পা রাখতে পারছি না এখনো। সুব্রত মৃদু হেসে বলে।

মোটিভটা কি হতে পারে তোর মনে হয় ?

মনে হয় প্রেম—

আর কিছু নয় ?

আর কি হতে পারে এক্ষেত্রে ?

তুই কেবল ঐ পাঁচ বন্ধুর কথাই ভাবছিস—

তবে আর কার কথা ভাবব ?

কেন, বাসবীর জেঠা বিরাজ সান্যাল, বাসবীর মা জুনিফার, সেই সাহেব ব্যক্তিটি—যার পরিচয় এখনো অজ্ঞাত !

জুনিফার বাসবীর মা, তাকে সে হত্যা করতে যাবে কেন ?

তা জানি না, তবে তাকে একেবারে eliminateও করতে পারছি না।

কিন্তু তার interest কি থাকতে পারে বাসবীর মৃত্যুতে ?

পারে বন্ধু পারে—

কৃষ্ণা ঐ সময় জংলীর হাতে কফির ট্রে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। কিরীটী কথার মোড় ঘুরিয়ে বলে ওঠে, নে, আগে গরম কফি দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নে।

ওদের কফিপান প্রায় শেষ হয়েছে, এমন সময় জংলী এসে ঘরে ঢুকল আবার, বাবু !

কি ?

কে এক সুনীলবাবু এসেছেন, দেখা করতে চান।

যা, নিয়ে আয় এই ঘরেই। কিরীটী বললে।

জংলী চলে গেল। কৃষ্ণাও বের হয়ে গেল ঘর থেকে। একটু পরে জংলীর সঙ্গে সুনীল এসে ঘরে ঢুকল।

আসুন আসুন সুনীলবাবু, একটু আগে আপনার কথাই ভাবছিলাম মনে মনে। কিরীটী বললে।

সুনীল একটা সোফায় বসল ! কেমন যেন চিন্তিত, একটু অন্যমনস্ক মনে হয় তাকে।

এক কাপ কফি চলবে নাকি সুনীলবাবু ? কিরীটী জিজ্ঞাসা করে।

না।

চা ?

না। আপনাকে কয়েকটা কথা আমি বলতে এসেছি যা সেদিন বলা হয়নি। সুনীল বললে।

কিরীটী সুনীলের মুখের দিকে তাকাল।

সুনীল একটু নড়েচড়ে বসল, যেন নিজেকে একটু গুছিয়ে নিল। কিরীটী নিঃশব্দে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি—আমিও বাসবীকে ভালবাসতাম মিঃ রায়—

জানি আমি।

জানেন ? কি করে জানলেন ? বিস্মিত সুনীল কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

সত্যিকারের ভালবাসার কথাটা চেঁচিয়ে সকলকে জানাতে হয় না সুনীলবাবু, ও আপনা থেকেই প্রকাশ হয়ে পড়ে।

কিন্তু—

বাসবী দেবীকে নিশ্চয়ই কথাটা বলেছিলেন ?

হ্যাঁ। এক দুর্বল মুহূর্তে চেপে রাখতে পারিনি মনের কথাটা, অনেকদিন লালিত মনের গোপন আকাঙ্ক্ষাটা—

বলেই বোধ হয় ভুলটা বুঝতে পারলেন।

ঠিক তাই। বাসবী জানিয়ে দিল সে ব্রজেশকেই ভালবাসে।

॥ তেরো ॥

কথাটা বলে সুনীল চুপ করে অনেকক্ষণ বসে রইল। সে যেন ঐ কথাটা বলার জন্যই কিরীটীর গৃহে ছুটে এসেছিল। কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সব কিছুর শেষ হয়ে গেল।

সুনীলবাবু !

বলুন ?

আপনি কি জানেন কেবলমাত্র আপনি, ব্রজেশবাবু ও রঞ্জনবাবুই নন, সুহাসবাবুও বাসবী দেবীকে ভালবাসতেন ?

সুহাস ! সুনীল যেন চমকে ওঠে। বলে, কি বলছেন ? কি করে বুঝলেন ?

ঠিক আপনার ব্যাপারটা যে করে বুঝেছিলাম, সুহাসবাবুর ব্যাপারটাও তেমনি করেই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

আশ্চর্য ! কখনও বুঝতেও পারিনি। অস্পষ্ট স্বরে বললে সুনীল কথাগুলো, যেন কতকটা স্বগতোক্তির মতই।

কি জানেন কিরীটীবাবু, সুনীল একটু থেমে আবার বলে, বাসবীর মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ ছিল যেটা পুরুষকে অন্ধের মতই আকর্ষণ করত—

আকর্ষণ এক জিনিস, আর আকর্ষণে পাগল হয়ে ওঠা আর এক বস্তু সুনীলবাবু !

হঠাৎ চমকে যেন সুনীল আবার কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল। তারপর একটু পরে বললে, একটা চিঠি সঙ্গে আমি এনেছি আপনাকে দেখাব বলে—

চিঠি !

হ্যাঁ, এই যে পড়ে দেখুন। সুনীল জামার বুকপকেট থেকে একটা মুখছেঁড়া খামেভরা চিঠি বের করে কিরীটীর দিকে এগিয়ে দিল।

কিরীটী চিঠিটা হাতে নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে বার-দুই পড়ে বললে, রঞ্জনবাবুর এই চিঠিটা আপনি কবে পেয়েছিলেন ?

বম্বে থেকে আসবার আগের দিন দুপুরে। সুনীল বললে।

চিঠিটা লেখা হয়েছে দেখছি বাসবী নিহত হবার ঠিক দুদিন পরেই—

হ্যাঁ। কিন্তু আমার মনে হয়—

কি মনে হয় ?

রঞ্জনের ঐ চিঠির সব কথা সত্য নয়।

সত্য নয় ?

না।

কি করে বুঝলেন ?

ঐ যে চিঠিতে লিখেছে, রঞ্জনের এক বছরের মধ্যে তার বাসবীর সঙ্গে দেখাই হয়নি—ওটা মিথ্যে। কারণ—

বলুন, থামলেন কেন ?

কয়েকদিন আগে—মানে সিনেমার সেই ঘটনার দিনই আমি রঞ্জনের ওখানে গিয়েছিলাম। সে সেতার বাজাচ্ছিল—সুনীল বললে।

কিরীটী বললে, তারপর ?

আমাকে দেখে ও আমাদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হবার পর সে চা আনতে উঠে যায়, তখন হঠাৎ মেঝেতে পড়ে থাকা একটা অ্যালবামের উপরে আমার দৃষ্টি পড়ে, অ্যালবামটা তুলে নিয়ে আমি ওলটাতে থাকি।

সুনীল বলে গেল, সেদিনকার অ্যালবামের মধ্যে সে কি আবিষ্কার করেছিল সেই কথাটা।

শেষ ফটোটার নীচে, বাসবীর মৃত্যুর দিন কুড়ি আগেকার তারিখ ছিল বলছেন ?

হ্যাঁ। আর অ্যালবামের শেষ দু-পৃষ্ঠায় যে কবিতা দুটো লেখা ছিল সেটা এখনও আমার মনে আছে—

কি কবিতা ?

সুনীল আবৃত্তি করে গেল পর পর কবিতা দুটো।

এখন বুঝতে পারছি, কিরীটী বললে, আপনাদের চারজনের মধ্যে অন্তত তাঁর প্রেমটা বাসবীর প্রতি সত্যিই উগ্র ছিল।

সুনীল বললে, কিন্তু আমার মনে যেটা সব চাইতে বেশী খটকা লেগেছে সেটা হচ্ছে রঞ্জন আমাকে মিথ্যা লিখেছিল কেন ?

সুনীলবাবু, আপনার বন্ধু রঞ্জনবাবু যে মিথ্যা বলেছেন, সে কথাটা আজও সকালে একবার প্রমাণিত হয়েছে।

কি রকম !

আজ সকালে আমরা বিরাজবাবুর গৃহে গিয়েছিলাম—

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, অনেক কিছু জানতে পারা গেল যা পুলিসও আজ পর্যন্ত জানত না।

আচ্ছা বাসবী দেবীর সঙ্গে কোন ফিরিঙ্গীর জানাশোনা ছিল কি না বলতে পারেন ?

না, সেরকম কখনও কিছু শুনিনি তো।

তার মা জুনিফারের কথা জানেন ?

কিছু কিছু জানি।

কতটুকু কি জানেন ?

ব্রজেশ আপনাকে সেদিন যতটুকু বলেছিল তার চাইতে বেশী কিছু জানি না। তা আপনি তো বিরাজবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তিনিও কিছু বলতে পারলেন না ? সুনীল কিরীটীকে পালটা প্রশ্ন করল।

বিশেষ কিছু নতুন বলেননি—

আমার মনে হয় অনেক কিছুই জানেন তিনি, বলতে চান না বলেই বলেননি।

হতে পারে।

আচ্ছা আপনার কি মনে হয় কিরীটীবাবু, বাসবীর মৃত্যুর ব্যাপারে ওর মা জুনিফার কোনভাবে জড়িত আছে ?

জানি না। তবে পৃথিবীতে কিছুই আশ্চর্য নয়। এক এক সময় এমন অনেক কিছু ঘটে পৃথিবীতে যার কার্যকারণ ভাবতে গেলে আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

ঐ সময় ঘরের কোণে টেলিফোনটা বেজে উঠল। কিরীটী সোফার উপর থেকে উঠে গিয়ে ফোনটা তুলে নিল, হ্যালো ! কে, রথীন ? হ্যাঁ, কিরীটী বলছি। সর্বক্ষণের জন্য ওয়াচ রেখেছিস তো ? ঠিক আছে—না, আপাতত আর কিছু করবার নেই—

কিরীটী ফোনটা নামিয়ে রেখে ফিরে এল।

মিঃ রায়।

বলুন।

আপনি যে সেদিন বলছিলেন, আমাদের যে কারও জীবনের উপর attempt হতে পারে, সাবধান থাকার জন্য—

ঠিকই বলেছি।

কিন্তু—

আমার মনে হয় সুনীলবাবু, বাসবীর মৃত্যুই শেষ নয়—নচেৎ সেদিন আপনার lifeয়ের উপরে attempt হত না !

সুনীল আর কোন কথা বলে না, চুপ করে থাকে। কিরীটীর মনে হল সে যেন কি ভাবছে। হঠাৎ একসময় সে বললে, আমি তাহলে আজ উঠি—

আসুন।

সুনীল ধীরে ধীরে উঠে ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পর কিরীটী মৃদু হাসল !

কি রে, হাসছিস যে ? সুব্রত প্রশ্ন করে।

বেচারী সুনীল ! এখনও মনের দোমনা ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

মানে ?

নচেৎ যা বলবার জন্য সত্যিসত্যিই এসেছিল আমার কাছে, শেষ পর্যন্ত সে কথাটা বলতে পারল না কেন?

কি বলতে এসেছিল?

কি করে জানব বল!

তবে ও কথা বললি কেন?

মনে হল যেন কিছু বলতে চাইছে, অথচ বলতে পারছে না, তাই বললাম।

কিরীটী কথাটা বলে পাশের টেবিলের উপর থেকে একটা চুরোট নিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করে।

কিরীটী!

কি?

আচ্ছা সেরাত্রে বাসবীর শয়নঘরে কে গিয়েছিল, তুই মনে মনে একটা অনুমান করতে পেরেছিস, তাই না?

অনুমানের উপর নির্ভর করে তো কেবল কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পেঁছানো যায় না সুব্রত, তুই তো জানিস!

তা যায় না, তবে আমার কিন্তু—যত ভাবছি ব্যাপারটা ততই মনে হচ্ছে সে-রাত্রে ঐ পাঁচজনেরই কেউ একজন বাসবীর শয়নঘরে ঢুকেছিল।

কিরীটী মৃদু হাসল।

নয় বলতে চাস?

ওটা পরে ভাবলেও চলবে, আপাতত জুনিফারকে আমায় খুঁজে বের করতেই হবে সুব্রত!

জুনিফার?

হ্যাঁ, সেখানেই একটা সূত্র জট পাকিয়ে আছে। কাজেই সেটা খুঁজে বের করতে পারলে হয়ত আমরা সুস্পষ্ট একটা পথের সন্ধান পাব। জুনিফারকে ঘিরে একটা অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে।

বিরাজমোহন ভাবছিলেন।

লুসির আকস্মিক আবির্ভাবটা যেন বিরাজমোহনের মনটাকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল।

লুসিকে যেন কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না বিরাজমোহন।

আর লুসির কথা চিন্তা করতে করতে, বার বার জুনিফার যেন তাঁর সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল। মুখে তিনি যাই বলুন না কেন এবং ব্যবহারে তাঁর যাই প্রকাশ পাক না কেন, জুনিফার যে আজও তাঁর মনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে সেই চেতনাটাই যেন বিরাজের মনটাকে নতুন করে আলোড়িত করে গিয়েছিল লুসি হঠাৎ সেরাত্রে তাঁর ঘরে এসে।

অমন তীব্রভাবে জীবনে যেমন কাউকে বিরাজ ভালবাসেননি, তেমনি অমন তীব্র ঘৃণাও বুঝি কাউকে তিনি করেন না।

একদিকে ভালবাসা—একদিকে ঘৃণা, এ যেন অমৃতে ও গরলে সংঘাত।

সুধা ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠেছে গরল। আজও বিচিত্র এক দ্বন্দ্ব।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে লাইব্রেরি ঘরে নিজের আরামকেদারাটার উপর বসে সেই কথাগুলোই বুঝি ভাবছিলেন বিরাজ সান্যাল, হাতে ধরা তাঁর একখানা চিঠি।

ঐদিনই বিকেলের ডাকে চিঠিটা পেয়েছেন বিরাজমোহন এবং চিঠিটা পাবার পর থেকে অন্ততঃ বার দশেক পড়েছেন। চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছেন—কিন্তু পারেননি। ছিঁড়তে গিয়ে আবার পড়েছেন।

ছোট্ট সংক্ষিপ্ত চিঠি।

চিঠিটা লিখেছে জুনিফার।

বিরাজ, জানি না আজ কি বলে তোমাকে সম্বোধন করব, যদিও জানি আজ আমি তোমার কাছে সম্পূর্ণ মৃত এবং অনেকদিন থেকেই মৃত এবং আমার এ চিঠি হয়ত তুমি না পড়েই ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের মধ্যে ফেলে দেবে। তবুও লিখছি কেবলমাত্র এই আশাতেই যে, হয়ত আজও তোমার মনের এক কোণে জুনিফারের কিছু স্মৃতি অবশিষ্ট আছে। উপরে আমার বর্তমান ঠিকানা দিলাম, একটিবার যদি আসো—আসবে কি!

ইতি—জুনিফার।

জুনিফার তার সঙ্গে একটিবার দেখা করতে চায়। কিন্তু কেন? আবার হয়ত তার অর্থের প্রয়োজন হয়েছে। আজ আবার হয়ত তাকে তার চরম দুর্দশার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। আর তাই হয়ত তাকে তার মনে পড়েছে, যেমন করে অনেক বছর আগে তাকে মনে পড়ায় সে তার কাছে ছুটে এসেছিল তার রেঙ্গুনের গৃহে। কিন্তু না, কোন সম্পর্কই আজ আর নেই বিরাজের জুনিফারের সঙ্গে।

যাবে না সে আর জুনিফারের কাছে।

ঘৃণা আর বিরক্তিতে মনটা যেন বিরাজের বিষিয়ে উঠেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিরক্তিকে ছাপিয়ে কোথায় যেন মনের মধ্যে বার বার জুনিফারের সেই মুখটা—সেই দুটি নীল চোখ ভেসে উঠছে, যে চোখ দুটি একদিন তাকে মুগ্ধ করেছিল, সব কিছু ভুলিয়ে দিয়েছিল, এক অন্ধ দুর্নিবার আকর্ষণে তাকে জুনিফারের প্রতি পাগল করে তুলেছিল!

কি একটা অস্থিরতায় বিরাজের মনটা যেন ছট্‌ফট করতে থাকে। পারেন না বসে থাকতে আর বিরাজ। উঠে দাঁড়ান পাশ থেকে ক্রাচটা হাত দিয়ে টেনে নিয়ে। ডাকেন, মাধব!

মাধব এসে ঘরে ঢুকল, আমাকে ডাকছিলেন সাহেব?

হ্যাঁ।

গ্লাস আর বোতল আনব?

না, থাক। তুই যা—

মাধব যেন একটু বিস্মিত হয়েই ঘর থেকে চলে যাবার জন্য দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই বিরাজ আবার ডাকলেন, মাধব!

সাহেব ?

ড্রাইভারকে বল গাড়ি বের করতে।

মাধব বিস্মিত হয় আরো। তার সাহেব তো কখনও এ সময় বাড়ির বাইরে যান না! আজ এত বছর দেখছে তাঁকে—তাই বোধ হয় একটু দ্বিধার সঙ্গেই প্রশ্ন করে, গাড়ি বের করতে বলব ?

হ্যাঁ, যা।

মাধব চলে গেল। বিরাজ যেমন বসেছিলেন তেমনিই বসে রইলেন। মনের মধ্যে তখনো বুঝি সেই দ্বন্দ্বটা চলেছে। কোথায় যাবেন তিনি ? জুনিফারের গৃহে ? জুনিফার ডেকেছে তাই তিনি চলেছেন, কিন্তু কেন—যে তাঁর অত বড় ভালবাসাকে অমন করে অপমানিত করে একদিন চলে গিয়েছিল, সেই বিশ্বাস-ঘাতিনী জুনিফারের কাছে—

তিনি কি পাগল হলেন নাকি ?

মাধব ঐ সময় এসে ঘরে ঢুকল আবার, ড্রাইভার গাড়ি বের করেছে।

কেন ?

আজ্ঞে আপনি যে একটু আগে বললেন গাড়ি বের করতে, আপনি বেরুবেন—

ও, হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে—তুই যা।

মাধব চলে গেল।

ক্রাচের সাহায্যে এসে বিরাজ গাড়িতে উঠে বসলেন।

কিধার যায়গা সাব্ ? ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করে।

ফ্রি স্কুল স্ট্রীট চল—জান ফ্রি স্কুল স্ট্রীট ?

জি সাব্।

চল।

ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল।

ঠিকানাটা খুঁজে বের করতে গিয়ে দেখা গেল, একটা সরু অন্ধকার গলির মধ্যে বহুকাল আগেকার একটা পুরাতন তিনতলা বাড়ি। একতলা দোতলা তিন-তলায় অনেকগুলো ঘর। বহু দুঃস্থ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবার সেখানে কেউ একটা কেউ দুটো ঘর নিয়ে থাকে। রাত তখন প্রায় সাড়ে নটা। কোন ঘরে রেকর্ড বাজছে, কোন ঘরে হইচই চলেছে—যেন একটা বাজার।

সরু প্যাসেজে মিটমিটে কমশক্তির ইলেকট্রিক আলোয় আবছা একটা আলো-আঁধারি সৃষ্টি করেছে।

প্যাসেজেই কেমন যেন থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন বিরাজ।

একজন বুড়ী সেই সময় একটা ঘর থেকে বের হয়ে আসতে তাকেই বিরাজ জিজ্ঞাসা করেন, এই বাড়িতেই জুনিফার থাকে কিনা।

বুড়ী বললে, হ্যাঁ।

কোথায় কোন্ ঘরে ?

ফার্স্ট ফ্লোরে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাও সোজা—সিঁড়ির ডান দিকটায় ঘর।

কথাগুলো বলে বুড়ী আর দাঁড়াল না, চলে গেল।

বিরাজ ধীরে ধীরে ক্রাচের সাহায্যে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। দোতলায় উঠে নির্দিষ্ট ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। একটু ইতস্তত করলেন, তারপর দরজার গায়ে নক করলেন আস্তে আস্তে।

বার-দুই নক করার পরই ভিতর থেকে ক্লিষ্ট নারীকণ্ঠে সাড়া পাওয়া গেল, কে?

বিরাজ আবার নক করলেন দরজার গায়ে।

পূর্ব নারীকণ্ঠের সাড়া পাওয়া গেল আবার, কম ইন! দরজা খোলাই আছে।

দরজা ঠেলে বিরাজ ঘরে ঢুকলেন। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছিল। মাঝারি আকারের ঘর। ঘরে ঢুকতেই কেমন যেন একটা অস্বাস্থ্যকর স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা দিল বিরাজের।

কে? সেই নারীকণ্ঠেই প্রশ্ন ভেসে এল আবার।

ঘরের মধ্যে জীর্ণ কিছু আসবাব। নিদারুণ দৈন্যের চিহ্ন চারিদিকে সুস্পষ্ট। বিরাজ সেই নারীকণ্ঠস্বর অনুসরণ করে ঘরের কোণে তাকালেন। একটা স্ক্রীন নজরে পড়ল। স্ক্রীনের ওদিক থেকেই নারীকণ্ঠস্বর ভেসে এসেছিল।

কে, পল? আবার নারীকণ্ঠে প্রশ্ন এল ভেসে।

ক্রাচে ভর করে কয়েকটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন বিরাজ। তারপর স্ক্রীনের দিকে এগিয়ে গেলেন। স্ক্রীনের সাহায্যেই ঘরের একটা অংশকে কিছুটা প্রাইভেট করা হয়েছে পৃথক করে। একটা খাট। খাটের উপরে কে যেন শুয়ে আছে। এদিকটায় ততটা আলো না আসায় কেমন ঝাপসা-ঝাপসা, অন্ধকার।

কে?

খট্ করে একটা শব্দ হল, তারপর একটা আলো জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দৃশ্যটা বিরাজের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। নারীমূর্তি ততক্ষণে শয্যার উপর উঠে বসেছে। ছিন্ন মলিন শয্যা। সামনে একটা খালি দিশী মদের বোতল ও একটা কাচের গ্লাস। একটা সস্তা সিগারেটের প্যাকেট। পুরাতন একটা অ্যাসট্রে-ভর্তি ছাই, দেশলাইয়ের পোড়া কাঠি ও দগ্ধ সিগারেটের টুকরো।

কেমন যেন বোবাদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন নারীমূর্তির দিকে বিরাজ।

কে ঐ নারী? পরনে মলিন ছিন্ন একটা গাউন, তার উপরে গলায় একটা উলের স্কার্ফ জড়ানো, মাথার চুল রুক্ষ এলোমেলো। দু'পাশের চুলে অনেকদিন মনে হয় পাক ধরেছে—প্রায় সাদা। ভাঙা চোপসানো গাল, কোটরগত দুটি চক্ষু—চোখের কোলে কালি।

নারীমূর্তিও চেয়েছিল বিরাজের দিকে কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর সে-ই প্রথমে বলে উঠল, বিরাজ! তুমি—সত্যিই তাহলে তুমি এসেছ?

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না জুনিফার, অতিরিক্ত নেশা করেছিল বোধ হয়—টলে বসে পড়ে আবার শয্যাটার উপরেই।

থাক, থাক—বসো। বিরাজ বলেন।

॥ চোদ্দ ॥

বসে বসেই অতঃপর কেমন যেন ক্লিষ্ট সামান্য জড়ানো স্বরে বলে জুনিফার, সত্যিই তাহলে তুমি এসেছ বিরাজ! আমি জানতাম—জানতাম তুমি আসবে, দেখ—I am dying! সবাই আজ আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে—I am alone! বলতে বলতে কেঁদে ফেলল জুনিফার।

ক্লাচে ভর করে তখনো বিরাজ দাঁড়িয়ে আছেন কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে জুনিফারের দিকে তাকিয়ে।

ঐ কঙ্কালই জুনিফার!

কি দেখছ বিরাজ, মাই ডার্লিং? এ আমার পাপের ফল। তোমাকে—তোমার ভালবাসাকে একদিন বিক্রি করেছিলাম, এ তারই শাস্তি। কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন ডার্লিং, বস—বস ঐ চেয়ারটায়।

বিরাজ সত্যিই আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। চেয়ারটায় বসলেন।

প্রচণ্ড একটা ঘৃণা যেন বুকটার মধ্যে বিরাজের ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছিল, কিন্তু তবু তিনি স্থিরদৃষ্টিতে জুনিফারের দিকে তাকিয়েছিলেন নিঃশব্দে।

জান, আজ আমার কেউ নেই! পল আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। লুসি আমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। নিজে উঠতে পারি না, বেরুতে পারি না—গাঁটে গাঁটে অসহ্য ব্যথা। ঘরে একটা পয়সা নেই। একটানা কান্নাঝরা গলায় জুনিফার তার দুর্দশার ইতিহাস ব্যক্ত করে যেতে লাগল, কেউ নেই আজ আর আমার—কেউ নেই, I am alone—deserted!

আমাকে চিঠি দিয়ে ডেকেছিলে কেন তুমি? শান্ত গলায় এতক্ষণে প্রশ্ন করলেন বিরাজ।

কেন ডেকেছি?

হ্যাঁ।

জানি আজ ভিক্ষা চাইবারও মুখ নেই আমার তোমার কাছে, তবু তোমাকেই ডেকেছি, কারণ জানি যদি কেউ আজ আমাকে সাহায্য করে তো একমাত্র তুমিই হয়ত করবে, যদি কেউ ভিক্ষা দেয় তো তুমিই দেবে—

কি সাহায্য চাও? টাকা?

না।

তবে?

একটু আশ্রয়। এই নরকখানা থেকে আমাকে উদ্ধার কর বিরাজ।

বিরাজের ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষীণ একটা হাসির রেখা জেগে উঠল, তারপর ঈষৎ যেন শ্লেষ-জড়ানো কণ্ঠে বললেন, তার আজ আর কোন উপায়ই নেই জুনিফার।

উপায় নেই?

না। প্রথমতঃ এই তোমার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল, আর আজ যার কাছে তুমি অনুনয় করছ সে বিরাজ অনেকদিন আগেই মরে গিয়েছে।

বিরাজ! অস্ফুট একটা আর্তনাদের মতোই যেন ডাকটা জুনিফারের গলা থেকে বের হয়ে এল।

ওকথা থাক জুনিফার, তবে আমি যতদিন বেঁচে আছি মাসে মাসে কিছু টাকা তোমাকে আমি পাঠিয়ে দেব। তাও একটি শর্তে—

কি শর্ত?

তুমি কখনও কোন কারণে এবং কোন অজুহাতেই আমার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে না। আর তা যদি কর তাহলে জানবে সেইদিন থেকেই টাকা তোমার বন্ধ হবে।

জুনিফার কি যেন ভাবল কিছুক্ষণ মাথাটা নীচু করে, তারপর ধীরে ধীরে মাথা তুলে বললে, বেশ, তাই হবে। জানি না কি বলে তোমাকে ধন্যবাদ জানাব—

তার কোন প্রয়োজনই নেই, কারণ আমি রাজী হয়েছি কেন জান?

কেন?

তোমার মেয়ে লুসির জন্য—

লুসি! তাকে তুমি তো দেখওনি এ জীবনে কখনও। সে শুধু অকৃতজ্ঞ নয়, বেইমান—

কেন, তোমার প্রস্তাবে রাজী হয়নি বলে সে?

কি বলছ তুমি?

ঠিকই বলছি। আর এও বুঝতে বাকি নেই আমার যে, মেয়ে তোমার প্রস্তাবে রাজী হয়নি বলেই তুমি শেষ পর্যন্ত আমাকে চিঠি দিয়েছিলে। কিন্তু কেন বল তো? যে কৌশল মনে মনে তুমি স্থির করেছিলে, আমার কাছ থেকে আমার সব কিছু আদায় করে নেবে—সেটা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হল না বলেই কি?

এ—এসব তুমি কি বলছ বিরাজ?

থাক ওসব কথা, এবারে আমি উঠব।

যাবে?

হ্যাঁ। বিরাজ উঠে দাঁড়ালেন। হাত বাড়িয়ে ক্রাচ দুটো টেনে নিলেন।

বিরাজ!

বল।

জানি না তুমি একটু আগে যা বললে সে কথাগুলো কেন বললে, তুমি বিশ্বাস করবে না জানি তবু শুনে যাও তোমাকে আজও আমি ভালবাসি। কথাগুলো বলতে বলতে জুনিফারের গলা কান্নায় জড়িয়ে গেল।

তার শীর্ণ গাল বেয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। পূর্ববৎ অশ্রুঝরা কণ্ঠেই বলতে লাগল, জীবনে একটি পুরুষকেই আমি ভালবেসেছিলাম—সে তুমি। ধীরাজের ভালবাসা বলব না—বলব একটা দুর্নিবার অন্ধ পাশবিক আকর্ষণ আমার প্রতি, যার দ্বারা সে আমাকে কুক্ষিগত করেই একপ্রকার রেজেস্ট্রি অফিসে টেনে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল। এবং যে কারণে বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত আমি

বাধ্য হয়েছিলাম তাকে ছেড়ে যেতে একদিন বিবাহের তিনটি বছরের মধ্যেই। তুমি তো তোমার ভাই ধীরাজের কলকাতার ঠিকানা জানতে, কেন তবে সেদিন আমি যখন নির্দিষ্ট সময়ে হোটেলে তোমার কাছে গেলাম না, তুমি জোর করে গিয়ে আমাকে ধীরাজের বাহুপাশ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এলে না?

ছিনিয়ে নিয়ে সেদিন আসলেও তুমি আমার কাছে থাকতে না। থাকতে পারতে না।

বিরাজ ক্রাচে ভর করে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।

বিরাজ!

না। কারণ তোমার রক্তে ছিল যে উচ্ছৃংখলতা, যে বিশ্বাসঘাতকতা—সে-ই তোমাকে আমার কাছ থেকেও দূরে টেনে নিয়ে যেত, যা ধীরাজের কাছ থেকেও তোমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। যাক সে কথা, আমি যাচ্ছি।

বিরাজমোহন আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। তাকালেন জুনিফারের মুখের দিকে ওর ডাক শুনে।

তোমার কাছে কিছু আছে?

কি, টাকা?

হ্যাঁ।

বিরাজ কয়েকটা মুহূর্ত জুনিফারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। জীর্ণ কঙ্কাল-সার ভাঙা বসা গাল, কোটরগত চক্ষু, মাথার চুল প্রায় সবই পাকা। কেমন যেন ঘিন-ঘিন করে ওঠে বিরাজের সমস্ত দেহ।

কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে খানচারেক দশ টাকার নোট টেনে বের করে নোটগুলো ছুঁড়ে দিলেন জুনিফারে মলিন ছিন্ন শয্যার উপর। তারপর মুখ ঘুরিয়ে ক্রাচে ভর দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

জুনিফারের শেষ কথাটা কানে ভেসে এল সিঁড়ির কাছে এগুতে এগুতে, থ্যাংক্‌স!

বিরাজ ঘর থেকে বের হয়ে যাবার একটু পরেই শীর্ণ দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি ঘরে এসে ঢুকল জুনিফারের। পরনে জীর্ণ কোট প্যাণ্টুলন ছিন্ন একটা টাই।

বয়েস লোকটার চল্লিশ-বিয়াল্লিশের বেশী হবে না, কিন্তু দীর্ঘ অত্যাচারে শরীরটা যেন শুষ্ক শীর্ণ পাকানো দড়ির মত হয়ে গিয়েছে।

খাঁড়ার মত উঁচু নাক, ভাঙা গাল, পুরু ওষ্ঠ, থুতনিতে একটা কাটা দাগ—সামনের দাঁত দুটো উচুঁ উপরের পুরু ঠোঁটটাকে যেন ঠেলে দিয়েছে।

হাতের আঙুলগুলো হাড়সর্বস্ব, লম্বা শীর্ণ মোটা মোটা শিরা বের করা।

লোকটা জুনিফারের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হিহি করে হাসতে থাকে। জুনিফার ততক্ষণে নোট চারটে উরুতের তলায় ঠেলে গুঁজে দিয়েছে।

চমৎকার অভিনয় করেছ জুনিফার! লোকটা বললে।

জুনিফার কেমন যেন ভীত শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রলোকটার মুখে

দিকে নিঃশব্দে।

কত পেলে ?

কি বলছ তুমি পল ?

হিহি করে হাসতে হাসতে পল বললে, আর ছেনালি নাই বা করলে। বলি কত বাগালে পুরনো নাগরের কাছ থেকে ?

সত্যি বলছি কিছু দেয়নি, তবে কথা দিয়েছে মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেবে।

লোকটা পূর্ববৎ নিঃশব্দে হি হি করে হাসতে হাসতে জুনিফারের শয্যার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলে, কিছু পাওনি, না ? কিছুই দিয়ে যায়নি ?

সত্যি বলছি—

হঠাৎ যেন পল ক্ষুধার্ত একটা জন্তুর মতই ঝাঁপিয়ে পড়ল জুনিফারের উপরে এবং এক হ্যাঁচকা টানে জুনিফারের পরিধেয় জীর্ণ গাউনটা দু'ফালা করে দিয়ে হিংস্রভাবে ওর সারা দেহ তল্লাশ করতে করতে একসময় ওকে প্রায় উলঙ্গ করে শয্যার উপর চিত করে ফেলে দিতেই দলাপাকানো নোট চারটে দেখতে পেয়ে থাবা দিয়ে তুলে নিল সেগুলো।

You brute! You scoundrel! চেঁচিয়ে ওঠে হিংস্র দলিত একটা নাগিনীর মত জুনিফার।

হি হি করে হাসছে তখন পল।

দলিত ফণিনীর মতই গর্জন করে ওঠে যেন জুনিফার আবার হিসহিস করে, I shall kill you—I shall kill you—

পল ওর দিকে আর ফিরেও তাকাল না। নোটগুলো পকেটে পুরে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ছিন্নভিন্ন গাউন। প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় শয্যার উপর উবুড় হয়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল জুনিফার।

বিরাজমোহন ফিরে এলেন তাঁর গৃহে। কেমন যেন ক্লান্ত, বিষণ্ণ। গাড়ি থেকে নেমে ক্রাচে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে সোজা এসে প্রবেশ করলেন তাঁর শয়নকক্ষে। মাধব বিরাজমোহনের অপেক্ষাতেই পথ চেয়ে ছিল, সে এসে ঘরে ঢুকল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

ডিংক নিয়ে আয়। বিরাজ বললেন।

এই ঘরেই দেব ?

হ্যাঁ।

মাধব চলে গেল। বিরাজ গা থেকে জামাটা খুলে ড্রেসিং গাউনটা গায়ে চাপিয়ে ঘরের মধ্যে যে আরামকেদারাটা ছিল সেটার উপরে বসলেন। মাধব ড্রিংক দিয়ে গেল।

রাত সোয়া এগারোটা বেজে গেল, বিরাজ তেমনিই বসে আছেন আরামকেদা-

রাটার উপরে। প্রথম যে পেগটা নিয়েছিলেন গ্লাসে তখনও সেটাই শেষ হয়নি। গ্লাসে ঢালবার পর সেই যে বার দুই চুমুক দিয়েছিলেন, তারপর আর গ্লাসটা ধরেনইনি।

ঘড়িতে যখন সাড়ে এগারোটা বাজল মাধব এসে আবার ঘরে ঢুকল, সাহেব!

বিরাজ মুখ তুলে মাধবের দিকে তাকালেন।

খানা তো ঠাণ্ডা হয়ে গেল—

আজ কিছু খাব না। যা—

কিছুই খাবেন না?

না। দরজাটা টেনে দিয়ে যা।

মাধব আর প্রশ্ন করতে সাহস পায় না। ঘর থেকে বের হয়ে গেল দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে।

ক্রমশঃ রাত আরও গভীর হয়। চারিদিক কেমন স্তব্ধ হয়ে আসে। বাগানে কোথায় যেন একটা ঝিঁঝিঁ পোকা একটানা ডেকে চলেছে।

জুনিফারের কথাগুলোই বার বার বিরাজের মনের মধ্যে আনাগোনা করছিল। চিঠি সে দিয়েছিল, তার চিঠি না দিয়ে উপায় ছিল না বলেই। কিন্তু তিনি কেন গেলেন? কবেকার একটা মোহ আজ এত বছরেও কি তাঁর শেষ হল না? অস্বীকার করে লাভ নেই, সেইটাই তাঁকে ঐ নোংরা নরকের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সেই নরকের দুর্গন্ধটা যেন এখনও তাঁর গায়ে লেগে রয়েছে।

মৃদু একটা পদশব্দ কানে এল। ফিরে তাকালেন বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে দরজার দিকে।

ভেজানো দরজাটা খুলে ঘরে ঢুকল শ্যামা।

বিরক্তিভরা দৃষ্টিতেই তাকিয়ে রইলেন বিরাজ শ্যামার দিকে। শ্যামা আরো কাছে এগিয়ে এল।

বাবু!

এত রাত্রে কেন এসেছিস? বিরাজের কণ্ঠে রীতিমত বিরক্তির সুর।

একটা কথা বলতে এলাম—

কি কথা?

সেরাত্রে দিদিমণির ঘরে যে এসেছিল তাকে আমি চিনতে পেরেছিলাম—

চিনতে পেরেছিলি!

হ্যাঁ।

পুলিসকে সেকথা জানিয়েছিস?

না।

কেন?

ভয়ে, বাবু।

বিরাজ স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন শ্যামার মুখের দিকে। কি কুৎসিত লাগছে ঐ মেয়েমানুষটাকে! মতিভ্রম হয়েছিল নিশ্চয়ই তাঁর একসময় বছরখানেক আগে,

ঐ মেয়েমানুষটাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। তাতেই আজ রাত্রে ও এই সময় তাঁর ঘরে এসে ঢুকতে সাহস পেয়েছে।

কে এসেছিল সে রাত্রে বাসবীর ঘরে? শ্যামার চোখের ওপরে চোখ রেখেই প্রশ্নটা করলেন বিরাজ।

বোধ হয় দিদিমণির এক কলেজের বন্ধু—

কে কলেজের বন্ধু?

রঞ্জনবাবু।

রঞ্জন!

হ্যাঁ।

ঠিক জানিস তুই?

হ্যাঁ, রঞ্জনবাবুই আমার মনে হয়।

কি করে বুঝলি?

রঞ্জনবাবুর নাম ধরে একবার দিদিমণিকে ডাকতে শুনেছিলাম—

তারপর কি হল?

কিছুক্ষণ পরে রঞ্জনবাবু চলে যান।

ঠিক আছে, তুই যা।

পুলিসকে জানাব বাবু কথাটা?

না, তোকে কাউকে কিছু বলতে হবে না।

শ্যামা তবুও যায় না, দাঁড়িয়েই থাকে।

যা, ঘরে যা।

উপরে একা থাকতে আমার ভয় করে বাবু। মাধবকে কথাটা বলেছিলাম, কিন্তু সে আমার কথায় কোন কান দেয়নি। আমাকে নীচের তলায় থাকবার একটা ব্যবস্থা করে দিন।

ঠিক আছে, তুই এখন যা। মাধবকে কাল আমি বলে দেব। আর শোন্, আমি না ডাকলে কখনও আমার ঘরে তুই আসবি না।

শ্যামা বিরাজের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

পরের দিন। বেলা তখন সোয়া সাতটা হবে সকাল।

সারাটা রাত ঘুম আসেনি চোখে, শয্যার উপর চোখ বুজে পড়েছিলেন বিরাজ। হন্তদন্ত হয়ে মাধব এসে ঘরে ঢুকল, সাহেব!

কি হয়েছে?

শ্যামা—

কি হয়েছে শ্যামার?

শ্যামা তার ঘরের মধ্যে মরে পড়ে আছে। মনে হচ্ছে কেউ তাকে—

সে কি! সঙ্গে সঙ্গে শয্যার উপর উঠে বসলেন বিরাজ মাধবের কথাটা শেষ হবার আগেই।

মেঝের উপর পড়ে আছে শ্যামা, মরে গিয়েছে। মাধব আবার বললে।

খাটের পাশ থেকে ক্রাচটা টেনে নিলেন বিরাজ। তারপর কোন কথা না বলে ক্রাচে ভর দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে গেলেন। মাধব তাঁকে অনুসরণ করল।

শ্যামার ঘরের দরজাটা হা-হা করছে খোলা। মেঝের উপর পড়ে আছে শ্যামার মৃতদেহটা।

হাত দুটো ছড়ানো।

মুখটা হাঁ করা, জিভটা একটু বের হয়ে এসেছে, বিস্ফারিত দুটি চক্ষুতারকা —যেন অক্ষিগোলক দুটি কোটর থেকে বের হয়ে আসছে। ক্ষীণ একটা রক্তের ধারা কষের পাশে শুকিয়ে আছে। পরিধেয় শাড়িটা এলোমেলো। বোঝা যায় মৃত্যুর পূর্বে সে যথেষ্ট স্ট্রাগল করেছিল।

কিছুক্ষণ যেন পাথরের মত দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলেন বিরাজ শ্যামার মৃতদেহটার দিকে। তারপর ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

ইতিমধ্যে গৃহের অন্যান্য সকলেও সিঁড়ির সামনে এসে ভিড় করেছিল ব্যাপারটা জানতে পেরে।

নিজের ঘরে ঢুকে বিরাজ থানায় ফোন করে দিলেন। শ্যামাকে তার ঘরে মৃত পাওয়া গিয়েছে।

রথীন সিকদার থানাতেই ছিল। সে বললে এখুনি সে আসছে।

ওদিকে রথীন সিকদার বিরাজের ফোন পেয়েই কিরীটীকে ফোন করে। কিরীটী তখন ঐদিনকার সংবাদপত্রে চোখ বুলাচ্ছিল।

ফোন বাজতে উঠে এসে ফোন ধরে রথীনের গলা পেয়ে শুধাল, কি ব্যাপার রথীন, এত সকালে?

আর একজন গত হয়েছে কিরীটী—

গত! কে আবার গত হল?

ঝাউতলার বাড়িতে শ্যামা, সেই ঝি—

কে বললে?

বিরাজ সান্যাল ফোন করেছিল এইমাত্র। আমি যাচ্ছি, তুই আসবি নাকি?

হ্যাঁ যাব। আমাকে তুলে নিয়ে যা।

রথীন ফোনটা ছেড়ে দিতেই কিরীটী সুব্রতকে ফোন করল। কিরীটী গত-রাত্রেই সুব্রতকে বলেছিল, আজ কোন এক সময় তারা আর একবার বিরাজ সান্যালের ঝাউতলার ভবনে যাবে। কিন্তু কিরীটী যখন ফোন করে জানাল এখুনি চলে আসবার জন্য, তারা যাবে সকলেই বিরাজ সান্যালের গৃহে, সুব্রত বললে, এখুনি যাবি—মানে নতুন আবার কিছু ঘটল নাকি এর মধ্যে?

হ্যাঁ, শ্যামা মনে হচ্ছে খুন হয়েছে—

শ্যামা!

হ্যাঁ। এখন দেখতে পাচ্ছি সেদিন শ্যামাকে অ্যারেস্ট করে আপাততঃ জেলের

সেফ কাস্টডিতে রাখলেই হত। তাহলে হয়ত চিরদিনের জন্য খুনী শ্যামার মুখটা বন্ধ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠত না এত তাড়াতাড়ি।

আমিও তো তোকে বলেছিলাম, শ্যামাকে আপাতত অ্যারেস্ট করবার জন্য।

বলেছিলি জানি, আমি কেবল অ্যারেস্ট করিনি তাকে—খুনী আবার সেখানে হানা দেবে সেই আশাতেই। যাক গে তুই চলে আয়, রথীন আসছে—তার গাড়িতেই আমরা যাব।

কিরীটী ফোনটা রেখে চট্‌পট তৈরী হয়ে নেয়।

একটু পরেই রথীনের গাড়ির হর্ন বেজে উঠল। কিরীটী জংলীকে বললে, রথীনকে উপরে ডেকে আনবার জন্য।

কৃষ্ণাকে ডেকে রথীনের জন্য কফির মগ রেডি করতে বললে।

বিরাটবপু রথীন হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, জানিস সিঁড়ি ওঠানামা করতে আমার কত কষ্ট হয়, আবার ডাকলি কেন?

বোস্। কফি পান কর্—

শুধু কফি? বসতে বসতে রথীন বললে।

না, কাল বৌবাজার থেকে কৃষ্ণা বিরাট সাইজের রাজভোগ এনেছে।

রাজভোগ! আজকাল আর রাজভোগের সে সাইজ আছে নাকি? ও তো আগেকার দিনের চার আনার রসগোল্লার সাইজ করেছে—

না রে, এর মূল্য পুরো একশত দশ পয়সা। অর্থাৎ একটি টাকারও বেশী দাম এক-একটির।

কৃষ্ণা ঐ সময় জংলীর হাতে ট্রে দিয়ে ঘরে ঢুকল। একটা প্লেটে গোটা চারেক রাজভোগ ও এক মগ ধূমায়িত কফি।

রাজভোগের আকার দেখে উফুল্ল হয়ে রথীন বলে ওঠে, আরে এ যে সত্যি-সত্যিই রাজভোগ! দেখি দেখি টেস্ট কেমন—রথীন হাত বাড়িয়ে রাজভোগের প্লেটটা তুলে নিয়ে ডান হাতের কাজ শুরু করে দেয়।

কেমন? কিরীটী বলে, ঠিক বলেছি কিনা?

বিলকুল। কিন্তু ওদিকে শ্যামা যে পটল তুলে সরকারের কাছ থেকে আমার রাজভোগের ব্যবস্থা করে রেখেছে আর এক দফা—

কিরীটী সে কথার জবাব না দিয়ে শুধায়, ঐ বাড়িতে কাকে পাহারায় রেখে-ছিলি?

দ্বিজেনকে।

দ্বিজেন মানে তোর সেই শ্যালক?

হ্যাঁ।

সে তোকে এখনো কোন রিপোর্ট দেয়নি?

না। হয়ত এখনো ব্যাপারটা তার গোচরীভূতই হয়নি।

রথীনের মধ্যে মধ্যে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা অভ্যাস।

সুব্রত ঐ সময় এসে ঘরে ঢুকল।

কিরীটী রথীনকে তাগিদ দেয়, নে, কফিটা শেষ করে এবারে ওঠ্।

দাঁড়া বাবা। খাওয়া বলে কথা—এত তাড়াহুড়ো করলে কি হজম হয়? বলে যার নাম মিষ্টান্নের আস্বাদন—

কিরীটী হেসে বলে, ভয় নেই, সুগার ঠিক তার রাস্তা বেছে নেবে।

যা বলেছিস! আজ বোধ হয় দুটো ইনসুলিনে শানাবে না। রথীন জবাব দেয়।

কৃষ্ণা হাসছিল তার দিকে চেয়ে। রথীন আবার বলে, হাসছেন কি বৌদি, ঐ সুগারই শেষ পর্যন্ত আমাকে একদিন শেষ পথটি প্রদর্শন করাবে।

খাওয়া কমালেই পারেন ঐ মিষ্টিটা! কৃষ্ণা বলে।

বলেন কি? তাহলে বাঁচার আর অর্থ কি রইল, কি জন্যই বা জীবনধারণ?

কেন, সুগার ছাড়া কি আর খাদ্যবস্তু নেই এ দুনিয়ায়? কৃষ্ণা বলে।

আছে বৌদি জানি, কিন্তু যেদিন আমার এক ডাক্তার বন্ধু বললে, মানবদেহটি আমাদের এমনই এক বিচিত্র কারখানা যে যাহাই খাদ্য বলিয়া গ্রহণ কর না কেন, শেষ পর্যন্ত সব কিছুই সেই সুগারে পরিণত হচ্ছে, সেদিন থেকেই স্থির করেছি যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন, খা কত খাবি খা—সুগারই খা! জন্মমুহূর্তে মধু ওষ্ঠে দিয়ে এ জীবনের যখন শুরু, শেষ মুহূর্তেও মধুই খেতে খেতে মহাযাত্রা!

সকলেই হেসে ওঠে রথীনের কথায়।

কিরীটী তাগিদ দেয়, নে, এবারে ওঠ্। তোর মহাযাত্রার এখন বহু বিলম্ব আছে, এত সহজে কি তুই মহাপ্রস্থান করবি?

বলছিস!

হ্যাঁ, চল্—

চল্। কিন্তু আর গমন করিয়াই বা কি হবে—এবারে তো সরকারের শেষ অস্ত্র প্রয়োগ, তাদের দাবি মানতেই হবে—হয় ছাড়ো, না হয় ছাড়াই!

॥ পনেরো ॥

বিরাজ সান্যালের ঝাউতলার বাড়ির সামনে আসতেই দ্বিজেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

দ্বিজেন তখনো বাড়ি পাহারা দিচ্ছে।

কিরীটী প্রশ্ন করে, দ্বিজেনবাবু, খবর কি?

সব ঠিক আছে, স্যার। এত সকালে আপনারা?

তোমার মাথা, তোমার মুণ্ডু! হঠাৎ রথীন খিঁচিয়ে ওঠে দ্বিজেনকে, আজ ফিরে গিয়েই তোমার নামে রিপোর্ট সাবমিট করব।

সকলের সামনে দ্বিজেন বরাবর রথীনকে 'স্যার' বলেই সম্বোধন করে, বললে, কেন স্যার? আমার কি কোন ত্রুটি হয়েছে? আমি তো কাল রাত আটটা থেকেই constant দৃষ্টি রেখেছি বাড়িটার ওপরে, এখন পর্যন্ত—

রেখেছ?

Certainly স্যার, believe করুন। কাল একবার ঘণ্টা দুয়েকের জন্য বিরাজ-

বাবু বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন, আর কেউ আসেওনি যায়ওনি ঐ বাড়ি থেকে।

চুলোয় যাক তোমার বিরাজবাবু! তোমার কথা বল—কাছাকাছি বেকবাগানে একবারও যাওনি তোমার সেই চাঁদবদনখানি একটিবার প্রাণভরে দর্শন করতে?

বেকবাগান! মানে—থতিয়ে যায় যেন বেচারী দ্বিজেন হঠাৎ।

হ্যাঁ, সন্ধ্যা দেবীর মুখচন্দ্রিমা একটিবার দর্শন করতে যাওনি?

ছি ছি, কি বলছেন স্যার? মা কালীর দিব্যি—

থাম। রথীন তার শ্যালককে থামিয়ে দেয়, চাকরি আর তোমায় করতে হবে না, তোমার গৃহিণী সন্ধ্যা দেবীর আঁচলটি হাতের মুঠোয় নিয়েই অতঃপর সারাটা দিনরাত বসে থাক গে।

আজ্ঞে স্যার—

যাওনি তুমি একবারও তোমার বাসায় বলতে চাও? বল—Speak out! সত্যি বল—

আজ্ঞে—

যাওনি?

হ্যাঁ, মানে মিনিট দশ-বারোর জন্য—

কিরীটী এবারে বাধা দিল, থাক্ থাক্—চল্, এগোনো যাক। তারপর দ্বিজেনের দিকে ফিরে বললে, ঐ বাড়িতে আবার কাল রাত্রে একজন খুন হয়েছে দ্বিজেন!

সে কি স্যার?

হ্যাঁ। যাক গে, তুমি এখানেই অপেক্ষা কর আমরা না আসা পর্যন্ত।

কিরীটী জীপ-ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করল, সে গাড়ি নিয়ে সোজা গিয়ে গেট দিয়ে বিরাজ সান্যালের গৃহে প্রবেশ করল অতঃপর।

মাধব ওদের সাড়া পেয়ে এগিয়ে এল। সে বোধ হয় ওদের অপেক্ষাতেই ছিল আশেপাশে কোথাও।

কিরীটীই প্রশ্ন করে, মাধব, তোমার সাহেব কোন্ ঘরে?

লাইব্রেরি ঘরে হুজুর।

সকলে লাইব্রেরি ঘরের দিকেই পা বাড়াল। প্রথমে কিরীটী, তার পশ্চাতে রথীন ও সর্বশেষে সুব্রত। তিনজনে একে একে ঘরে ঢুকল।

বিরাজ সান্যাল জানালার দিকে মুখ করে আরামকেদারাটার উপর বসেছিলেন বাগানের দিক তাকিয়ে তাঁর লাইব্রেরি ঘরে। হাত দুটি কোলের উপর ন্যস্ত।

ওদের পদশব্দে ফিরে তাকালেন, আসুন দারোগাসাহেব। রথীনের দিকে তাকিয়েই কথা বললেন বিরাজ সান্যাল।

ওরা আরো সামনে এগিয়ে এল।

বিরাজ সান্যালকে যেন কেমন ক্লান্ত বিপর্যস্ত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। মাথার চুল এলোমেলো, দু চোখের দৃষ্টিতে যেন কেমন একটা বিহ্বলতা।

বসুন। বিরাজ বললেন ওদের দিকে তাকিয়ে।

সকলে চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

প্রথমেই প্রশ্ন করে কিরীটী, কাল আপনি সন্ধ্যায় বের হয়েছিলেন, কোথায় গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, বের হয়েছিলাম। একটু জরুরী কাজ ছিল।

কোথায় কার কাছে জরুরী কাজ ছিল আপনার?

জানাতেই হবে?

হ্যাঁ।

জুনিফার দেখা করবার জন্য একটা চিঠি দিয়েছিল —

তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

চিঠিটা দেখতে পারি?

বিরাজ চিঠিটা বের করে দিলেন।

কিরীটী চিঠিটা দেখে ফিরিয়ে দিল আবার।

আচ্ছা কখন জানতে পারলেন ব্যাপারটা মিঃ সান্যাল? রথীন সিকদারই প্রশ্ন করে।

সকালে মাধব এসে বলবার পর। তারপরই ফোন করি আপনাকে। বিরাজ-মোহন বললেন।

কিরীটী এবারে প্রশ্ন করল, বাসবী দেবীর মৃত্যুর পরও শ্যামা তো উপরেই থাকত? একাই থাকত?

হ্যাঁ।

মেয়েটার সাহস ছিল বলতেই হবে। দোতলায় ঠিক তার পাশের ঘরেই কিছুদিন আগে ঐ ঘটনাটা ঘটে যাবার পরও ও একা থাকত! রথীন বলে।

মাধবকে নাকি বলেছিল ও নীচে আসবার জন্য। বিরাজ বললেন।

কার কাছে শুনলেন? কিরীটী প্রশ্ন করল এবারে।

কাল রাত্রে বলছিল—

কে? কিরীটী আবার প্রশ্নটা করে তাকাল বিরাজের মুখের দিকে।

শ্যামা।

কি বলছিল শ্যামা?

ওর নাকি আর একা একা উপরের ঘরে থাকতে সাহস হচ্ছে না।

এতদিন থাকতে পারল, তারপর হঠাৎ এমন কি ঘটল যাতে ও ভয় পেয়ে গেল? কিরীটী প্রশ্নটা করে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকায় বিরাজের মুখের দিকে আবার।

জানি না, ঠিক বলতে পারব না। তবে বলছিল কথাটা—

কিছু সে বলেনি—কেন সে হঠাৎ এতদিন পরে ভয় পেয়ে গেল? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

না।

তবে?

একটা কথা বলছিল শ্যামা—

কি ?

বিরাজ সংক্ষেপে তখন গতরাত্রের ঘটনাটা বিবৃত করে গেলেন, নিজের ব্যাপারটা গোপন করে।

রথীন বলে, রঞ্জনবাবুর নাম শুনেছিল শ্যামা ?

হ্যাঁ।

রথীন কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে।

আচ্ছা মিঃ সান্যাল—

কিরীটীর প্রশ্নে ওর দিকে মুখ তুলে তাকালেন বিরাজ, বলুন !

শ্যামার হত্যার ব্যাপারটা আপনার কি মনে হয় ?

হত্যা—

যদিও এখনো মৃতদেহ দেখিনি, তবে সেইরকমই মনে হচ্ছে।

কিন্তু আমার মনে হচ্ছে—

কি মনে হচ্ছে আপনার ?

বোধ হয় ভয়টয় পেয়ে—

ভয় ?

হ্যাঁ, মানে—

না, মিঃ সান্যাল। সামান্য আলাপে তার যতটুকু পরিচয় সেদিন আমি পেয়েছিলাম এবং যে এতদিন ঐ দুর্ঘটনার পরও একা একা উপরের তলায় থেকেছে, সে যে অন্ততঃ ভয় পেয়ে মারা যায়নি সে সম্পর্কে আমি স্থিরনিশ্চয়। যাক সে কথা, শ্যামার সঙ্গে কে দেখা করতে আসত বলতে পারেন ?

না। তাছাড়া যতদূর শুনেছি তার তো কোন আত্মীয়স্বজনই তেমন ছিল না তার সঙ্গে দেখা করতে আসবার মত।

সে কখনো সেরকম কোন কথা কি আপনাকে বলেছিল ?

আমাকে !

হ্যাঁ।

না। তাছাড়া ওসব প্রশ্ন তাকে আমি করতে যাবই বা কেন ? একটা ঝি—

ঝিও তো অনেক সময় ঝিয়ের অধিকার অতিক্রম করে অনেকদূর এগিয়ে যায়, বিশেষ করে দেহে যৌবন ও যৌনজনিত আকর্ষণ থাকলে ! তাই বলছিলাম—

বিরাজ কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন স্থিরদৃষ্টিতে। কিরীটীর কথা শেষ হল না, বললেন মিঃ রায় কি সেরকম কিছু কল্পনা করেছেন শ্যামার ব্যাপারে ?

কথাটা খুব অযৌক্তিক কি ?

কথাটা স্পষ্ট করে বললে একটু খুশী হব মিঃ রায়—

আমার কথার মধ্যে অস্পষ্টতা তো কিছুই নেই মিঃ সান্যাল !

কিরীটীর দুটি চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তখনো বিরাজের প্রতি স্থিরনিবদ্ধ। বিরাজমোহন কয়েকটা মুহূর্ত স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন কিরীটীর চোখের

দিকে। তারপর বলেন, মিঃ রায়, ঐ ধরনের অপ্রীতিকর কথা না বললেই আমি খুশী হব—

মানুষের ব্যক্তিগত খুশী-অখুশী নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হলে হত্যার ব্যাপারে তদন্ত করতে এসে তদন্তের কাজ করা যায় না। তাছাড়া এ ধরনের sentiment-এর আমাদের কাছে কোন মূল্যই নেই মিঃ সান্যাল!

কথাটা যে অমন রূঢ় ও অমন স্পষ্ট ভাবে কিরীটী তাঁর মুখের উপরে উচ্চারণ করতে পারে, বিরাজ বোধ করি ভাবতেও পারেননি। তাই একটু যেন থমকে থেকে বললেন, ঠিক আছে, তাহলে যা করতে এসেছেন তাই করুন গে। আমার যেটুকু জানা ছিল বলেছি, আর কিছুই আমার বলবার নেই জানবেন।

না, আপনি বলেননি—

কি বললেন?

সেদিনও সব কথা বলেননি, জানতে দেননি—আজও বলছেন না, জানতে দিচ্ছেন না মিঃ সান্যাল। কিরীটীর কণ্ঠস্বর কঠিন ও স্পষ্ট।

কি কথা সেদিন আমি বলিনি, জানতে পারি কি?

প্রথমতঃ আপনি বলেননি যে শ্যামা মধ্যে মধ্যে রাত্রে আপনার ঘরে আসত—

কি আবোলতাবোল বলছেন? Most damaging—

Damaging তো বটেই, বিশেষ করে বাসবী দেবীও যখন ব্যাপারটা জানতে পেরে গিয়েছিলেন—

যাবেন এ ঘর থেকে আমার আপনারা? তীক্ষ্ন কণ্ঠে যেন গর্জন করে উঠলেন বিরাজমোহন।

তদন্তের কাজ মিটে গেলেই চলে যাব। ভুলে যাবেন না, সরকারী প্রয়োজনে এখানে আমরা এসেছি। শান্ত গলায় কিরীটী জবাব দেয়।

আমি কোন কথা শুনতে চাই না, আপনারা যান এ ঘর থেকে। এবারে চেঁচিয়েই উঠলেন বিরাজমোহন।

শুনুন মিঃ সান্যাল, আমি জানি সেরাত্রে—অর্থাৎ বাসবী দেবীকে যেদিন হত্যা করা হয় সেই রাত্রে, রাত দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে কেউ তার ঘরে এসেছিল। এখনো বলুন, সে কে? কে এসেছিল?

আমি জানি না।

বলতে বাধ্য হচ্ছি, সত্যের অপলাপ করছেন—আপনি জানেন। কিরীটী বললে।

না, জানি না।

জানেন।

না।

বেশ, বলবেন না স্থির করেছেন যখন নাই বললেন, কিন্তু জানবেন সে কথাটা জানা কিরীটী রায়ের পক্ষে অন্ততঃ অসম্ভব হবে না, জানতে সে পারবেই। আয় রথীন, চল্ ওপরে চল্।

কিরীটীই প্রথমে ঘর থেকে বের হয়ে এল। তার পশ্চাতে রথীন ও সুব্রত।

ঘর থেকে বের হয়ে সিঁড়ি অতিক্রম করে দোতলায় উঠতে উঠতে সুব্রত বললে, কোণঠাসা ইঁদুরের অবস্থা হয়েছিল বেচারার !

রথীন পাশ থেকে ঐ সময় প্রশ্ন করে, কিন্তু কে এসেছিল ? রঞ্জনবাবুই নিশ্চয় ?

কিরীটী কোন জবাব দিল না, মৃদু হাসল মাত্র এবং সিঁড়ি দিয়ে যেমন উঠছিল তেমনি উঠতে লাগল।

কিরীটী !

উঁ—

ঐ রঞ্জন ছোকরাই তাহলে বাসবীকে হত্যা করেছে, তাই না ?

আশ্চর্য নয়। কিরীটী মৃদু গলায় বলে কথাটা।

কিন্তু কেন ?

হতাশ প্রেম। জবাবটা দেয় এবারে সুব্রত।

হতাশ প্রেম ?

হ্যাঁ। সুনীল, ব্রজেশ, রঞ্জন ও সুহাস প্রত্যেকেই তো বাসবীকে মনে মনে চেয়েছিল, তবে কেউ স্পষ্ট করে, কেউ গোপনে অস্পষ্ট ভাবে—

বলছেন কি সুব্রতবাবু ?

কেন, এখনও আপনি বুঝতে পারেননি ?

কিরীটী ততক্ষণে শেষ ধাপে পা দিয়েছে, মৃদু হেসে বললে, আমাদের রথীন ঐ বিষয়ে চিরদিনই একটু মাটো আছে সুব্রত, মানে যাকে বলে—ঐ রথীনেরই ভাষায়—প্রেম-কানা !

রক্ষে কর বাবা, যা একখানি গৃহিণী—সম্মার্জনী প্রহারে একেবারে ধুলো পরিমাণ করে ছাড়বে না !

কিরীটী হাসতে হাসতে বলে, নচেৎ বাসনা ছিল, তাই না রথীন ?

বাসনা কারই বা না থাকে বল্ ! ঘরের তো আছেই—নিত্যনৈমিত্তিক, মধ্যে মধ্যে তাই বাইরে গিয়ে মুখ বদলাতে কারই বা মনে মনে অন্ততঃ বাসনা জাগে না বল্ !

আহা রে ! কিরীটী সকৌতুকে শব্দটা বিশেষ এক ভঙ্গিতে উচ্চারণ করে !

তুই যদি বলিস তোর সে বাসনা কখনো মনে জাগেনি কিরীটী, তাহলে বলব তুই মিথ্যুক, সত্য স্বীকার করবার মত সৎসাহসটুকু তোর নেই।

শালুক চিনেছেন গোপালঠাকুর ! কিরীটী হাসতে হাসতে বলে।

দেখ্ সব শর্মাকেই আমার জানা আছে। ও সব পুরুষই মনে মনে polygamous—আবহমানকাল থেকে যা চলে আসছে আজও তা আছে, কেবল আজকের সামাজিক ও আইনের ন্যায়নীতিগুলো সেটাকে একটা মুখোশ চাপা দিয়ে রেখেছে।

কিরীটী আর কোন জবাব দিল না। সোজা এগিয়ে শ্যামার ঘরে গিয়ে ঢুকল। সুব্রত ও রথীনও ওকে অনুসরণ করল।

ঘরের মধ্যে তখনো শ্যামার মৃতদেহটা পড়েছিল।

আলুথালু বেশ। আঁচলটা একপাশে মেঝেতে লুটাচ্ছে। ডান হাতটা ছড়ানো,

বাঁ হাতটা সামান্য ভাঁজ হয়ে আছে। চোখের মণি দুটো যেন চক্ষুকোটর থেকে ঠেলে বের হয়ে আসছে। মুখটা সামান্য হাঁ করা—জিভ্‌টা দেখা যায়।

কিরীটী শ্যামার ভূলুণ্ঠিত মৃতদেহটার দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সামনে। দ্বিধাবিভক্ত ওষ্ঠের ফাঁক দিয়ে দাঁতের সারির কিছুটা অংশ দেখা যায়। চিবানো পানের রসের দাগ ওষ্ঠে ও দাঁতে কালো হয়ে শুকিয়ে আছে। বোঝা যায় মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেই হয়ত পান চিবোচ্ছিল।

ভাল করে তাকাতে নজরে পড়ল গলায় নখের আঁচড়ের দাগ।

কিরীটী উঠে দাঁড়াল।

স্ট্রাগল করে হত্যা করা হয়েছে! মৃদুকণ্ঠে কিরীটী বললে।

একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে এবারেও। বললে সুব্রত।

তাই দেখছি।

রথীন সিকদার শ্যামার মৃতদেহের উপরে এবারে ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকে। কিরীটী তখন ঘরের চারপাশে নজর বুলোতে ব্যস্ত।

শ্যামা যে একটু ছিমছাম প্রকৃতির ছিল, ঘরের চারপাশে দৃষ্টিপাত করলেই সেটা বোঝা যায়।

একপাশে একটা তক্তপোশের উপর শয্যা। সবুজ রঙের একটা সুজনি দিয়ে শয্যাটি ঢাকা সযত্নে। বোঝা যায় গত রাত্রে আদৌ শয্যা ব্যবহৃত হয়নি।

এক কোণে একটি আলনায় কয়েকটা তাঁতের শাড়ি সযত্নে কোঁচানো রয়েছে। ঘরের দেওয়ালে টাঙানো একটি আরশি। তারই পাশে দেওয়ালের গায়ে গোটা চারেক শেল্‌ফ্‌।

শেল্‌ফের প্রথম তাকে চিরুনি ফিতা প্রভৃতি চুল বাঁধার সরঞ্জাম।

কিরীটী আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। একটা মাথায় মাখার ক্যাস্টর অয়েলের শিশি—অর্ধেকেরও বেশী তেল আছে তাতে। একটা হিমানী স্নোর কৌটা ও পাউডারের কৌটা। একটা টাসেল—আজকাল সাধারণতঃ মেয়েরা চুলের পরিচর্যার সময় ব্যবহার করে থাকে। এক শিশি ঝোরো কুমকুম, একটা কাজললতা। কিছু চুলের কাঁটা, এক পাতা সেফটিপিন, এক শিশি সেণ্ট।

কিরীটী সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে মৃদু মৃদু হাসছিল। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল সুব্রত, সে বললে, শ্যামা দাসী আমাদের দেখছি বালবিধব হলে কি হয় শৌখিন ছিল রীতিমত।

হ্যাঁ, কর্তার বদান্যতা। কিরীটী মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল।

বেচারী জানতো না যে বড়র প্রেম বালির বাঁধ! সুব্রত বললে।

কিরীটী?

রথীন সিকদারের ডাকে কিরীটী ফিরে তাকালো ওর দিকে, কি?

এও তো মনে হচ্ছে গলা টিপেই হত্যা!

কোন ভুল নেই বৎস তাতে।

॥ ষোলো ॥

কিরীটী কথাটা বলে ঘরের মেঝেতে কি যেন তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে থাকে।

কি দেখছিস ? রথীন প্রশ্ন করে।

গতরাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল না রথীন ?

হ্যাঁ, সামান্য এক পসলা। বোধ হয় তখন রাত দশটা সোয়া দশটা হবে। কিন্তু সে কথা কেন ? রথীন বলে।

একটা কথা ভাবছি—

কি ?

সত্যিই পঙ্গু, না সবটাই অভিনয় ?

কার কথা বলছিস ?

যার কথা ভাবা উচিত তার কথাই ভাবছি। কিন্তু তোকে একটা কাজ করতে হবে—

কি ?

বিরাজমোহন সম্পর্কে আরো একটু detailed information-এর আমাদের দরকার।

হঠাৎ ?

প্রয়োজন হচ্ছে। তুই সেণ্ট্রালের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের সাহায্যে দেখ্ বর্মা সরকার থেকে সেটা সংগ্রহ করতে পারিস কিনা।

তা পাওয়া যেতে পারে—

আজই তাহলে আমাদের শম্ভু রায়ের সঙ্গে লালবাজারে দেখা করে তাকে বলিস কথাটা।

বলব।

কিরীটী কথা বলছিল আর মেঝেতে ঝুঁকে পড়ে বসে পকেট থেকে এক-টুকরো কাগজ বের করে কি যেন মেঝে থেকে সযত্নে কুড়িয়ে কাগজটার মধ্যে ভাঁজ করে রেখে দিল।

কি নিলি রে মেঝে থেকে কুড়িয়ে ?

কিছু না, শুকনো কাদা অর্থাৎ ধুলো। এমন ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন ঘরের মেঝেতে কাদা শুকিয়ে থাকাটা তো উচিত নয় তাই। কিরীটী বললে।

কিরীটীর তদন্ত-পদ্ধতির সঙ্গে রথীনের পূর্ব-পরিচয় কিছুটা থাকায় ব্যাপার-টাকে সে উড়িয়ে দিতে পারল না এবং নিজেও সে এতক্ষণ যা তার দৃষ্টিতে পড়েনি সেই মেঝের দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালো। এবং তার নজরেও এবার পড়ল ব্যাপারটা। ঝকঝকে মসৃণ পালিশ লাল সিমেণ্টের মেঝেতে এখানে ওখানে কয়েকটা গোলাকৃতি ছাপ রয়েছে।

কিরীটী তখন ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। খাটের নীচে একটা ফাইবারের সুটকেস দেখতে পেয়ে সেটা নীচু হয়ে ঝুঁকে

কিরীটী টেনে এনে খোলবার চেষ্টা করছিল।

কিন্তু সুটকেসটায় চাবি দেওয়া।

চাবিটা বিশেষ খুঁজতে হল না। মৃতা শ্যামার আঁচলেই বাঁধা আছে গিঁট দিয়ে দেখা গেল একটা চাবির রিং। কিরীটী শ্যামার আঁচল থেকে চাবির রিংটা খুলে নিয়ে তারই একটা চাবির সাহায্যে সুটকেসটা খুলে ফেলল।

খানকয়েক দামী দামী তাঁতের শাড়ি সযত্নে ভাঁজ করা আছে। গোটাচারেক ব্লাউজ, গোটাদুই ব্রেসিয়ার, এক প্যাকেট স্যানিটারী টাওয়েল, কয়েকটা রুমাল আর পাওয়া গেল ছোট একটি চন্দনকাঠের সুদৃশ্য কৌটো।

অন্যান্য জিনিসগুলো সামান্য নাড়াচাড়া করে মৃদু হাস্যতরল কণ্ঠে কিরীটী বললে, দূর গাঁয়ের চাষাভুষার মেয়ে হলে কি হবে, শ্যামা শহরে এসে রীতিমত আধুনিকা হয়ে উঠেছিল দেখছি।

সুব্রত পাশেই দাঁড়িয়েছিল, সে বললে, পরশমণির স্পর্শে মনে হচ্ছে—

কিরীটী প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসলো। তারপর চন্দনকাঠের কৌটোটার ডালা খুলতে গিয়ে দেখে তাতে ছোট একটি তালা লাগানো। চাবির রিংয়ের মধ্যে কিন্তু তালার চাবিটা পাওয়া গেল না। তালাটা ছোট হলেও খেলো কম দামের দিশী তালা নয়—সুদৃশ্য, ছোটর উপরে হলেও বেশ মজবুত বিলিতী তালা।

কিরীটী সুটকেসটা ভাল করে তন্নতন্ন করে খুঁজলো, কিন্তু ঐ তালার কোন চাবিই পেল না। অগত্যা সে স্থির করল কৌটোর তালাটা ভেঙেই ফেলবে। কৌটোটা হাতে নিতে মনে হচ্ছিল বেশ ভারী।

কিরীটী রথীনের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধাল, কি হে পুলিস অফিসার, তালাটা ভাঙব?

নিশ্চয়ই, ভেঙে ফেল। রথীন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়।

কিন্তু কি দিয়ে ভাঙা যায়? তালাটা মনে হচ্ছে বেশ মজবুত। কিরীটী তালাটা নাড়াচাড়া করতে করতে বললে।

সুব্রতর পকেটে চাবির রিংয়ের সঙ্গে একটা বটল্‌ওপনার স্ক্রু ছুরিসমেত যন্ত্র ছিল, অবশেষে তারই সাহায্যে তালাটা ভাঙা হল বেশ কষ্ট করেই।

কিন্তু কৌটোর ডালা খুলে দেখা গেল নোট ও খুচরো টাকায় মিলিয়ে শ'-চারেক টাকা, একটা ভারী সোনার মটরমালা হার গলার ছাড়া আর যে বস্তুটি পাওয়া গেল সেটা একটা ছোট শিশি। শিশির মধ্যে কতকগুলো লাল লাল বড়ি এবং শিশির গায়ে লেবেল আঁটা এক কবিরাজী ঔষধালয়ের 'অব্যর্থ ঋতুবটিকা' নামটি লেখা তাতে।

রথীন জিজ্ঞাসা করে, কিসের শিশি রে?

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বললে, অব্যর্থ ঋতুবটিকা!

সে আবার কি বস্তু?

গর্দভ তুই! পুলিসের চাকরি ছেড়ে দে। এখন বুঝতে পারছি কেন তোর আজও প্রমোশন হল না! কিরীটী বললে।

সুব্রত মৃদু হেসে বললে, আহা বেচারী তো আজও পিতৃত্বেরই অধিকারী হল না, অতএব ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের চোরাগলিতে ওকে কখনও আজ পর্যন্ত পা ফেলতেই হয়নি, ও জানবে কি করে ?

রথীন বোধ হয় এতক্ষণে ব্যাপারটা উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে কিছুটা। বলে ওঠে তাড়াতাড়ি, অ্যাবরসনের ওষুধ নাকি রে ?

হ্যাঁ, সাদা কথায় গর্ভপাত বটিকা ঐ শিশিতে। সুব্রত বললে রথীনের দিকে তাকিয়ে।

তা শ্যামার বাক্সে—

কিরীটী বললে, ওরে নিরেট, গোপন প্রেমের কাঁটা উদ্ধার করতে হলে শ্যামার মত মেয়ের যা করা স্বাভাবিক তাই করেছে!

বলিস কি ? মেয়েটা তবে pregnant ছিল নাকি—সন্তানসম্ভবা ?

সে বলতে পারবেন সঠিক তোর পুলিস সার্জন ময়নাতদন্ত করে।

কিন্তু কার—কার দ্বারা ব্যাপারটা ঘটল ? মানে সন্তান-সম্ভাবিতা হল—

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, কার দ্বারা আবার, শ্যামার যে গোপনচারী প্রেমিক ছিল তারই কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে!

আরে তাই তো জিজ্ঞাসা করছি, কে ? মাধব যে সেদিন বলছিল একটা লোক মাগীটার কাছে মধ্যে মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ করতে আসত ? সেই কি ?

বলিস কি, সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে তুই এখনো বলছিস সীতা কার বাপ ? কিরীটী বললে।

তবে ?

তবে আপাতত আর কিছুই নয়, মৃতদেহটি মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে চল বন্ধু এবারে আমরা প্রস্থান করি এই ভবন থেকে। কিরীটী বললে।

হুঁ, তা যেন হল, কিন্তু—, রথীনকে কেমন যেন একটু চিন্তিত মনে হয়।

চিন্তা করবার অনেক সময় পাবি, নে চল্ এখন। কিরীটী তাড়া দেয়।

রথীন বলে ঐ সময় কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে, আচ্ছা কিরীটী, তাহলে কি তোর মনে হয়—

কি ?

ঐ কারণেই মাগীটাকে তার নাগর শেষ করে দিয়েছে ?

কিরীটী প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসল রথীনের মুখের দিকে তাকিয়ে।

হাসছিস যে ?

হাসলাম এই জন্য যে, তুই তোর ভাষায় বর্তমান ঘটনা পরিস্থিতি ছেড়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিস—

তার মানে ?

মানে তুই ভুলে গিয়েছিস আপাতত, এই বাড়িতেই পাশের ঘরে কিছুদিন আগে বাসবীকেও ঐ একই ভাবে হত্যা করা হয়েছিল!

তুই বলছিস, সেই হত্যার সঙ্গে শ্যামার হত্যার ব্যাপারটাও জড়িয়ে আছে ?

আছে বই কি।—

তাহলে কি এবারেও বাসবীর সেই বন্ধু প্রেমিকদেরই একজনের দ্বারা ব্যাপারটা ঘটেছে বলতে চাস ?

তুই দেখছি বাসবীর বন্ধু চারটি ভদ্রসন্তানকে এখনো ভুলতে পারছিস না ! কিরীটী মৃদু হেসে বললে।

সে তুই যাই বল্ কিরীটী, আমার ধারণা এ তাদেরই কাজ।

কোন্ যুক্তিতে বন্ধু ?

নিশ্চয়ই সেরাত্রে বাসবীর হত্যাকারীকে শ্যামা দেখে ফেলেছিল। রথীন বলে।

যাক, এতক্ষণে তবু একটু বুদ্ধির চমক দেখা দিয়েছে তোর ব্রেন ম্যাটারে ! কিরীটী বললে।

ব্যাপারটা রীতিমত জটিল হয়ে উঠল দেখছি। রথীন বললে।

এখন চল্ তো !

সঙ্গের একজন কনস্টেবলকে ঐ বাড়িতে মৃতের প্রহরায় রেখে ওরা ঝাউতলার বাড়ি থেকে বের হয়ে এল। এবং আসার সময় দ্বিজেনকেও কিছু নির্দেশ দিয়ে ওখানেই থাকতে বলা হল।

জীপে করে যেতে যেতে রথীন শ্যামার হত্যার ব্যাপারটা সম্পর্কে নানা কথা বলে চলে, কিন্তু কিরীটী একেবারে চুপচাপ। তার দিক থেকে বিশেষ কোন সাড়া-শব্দই পাওয়া গেল না। মধ্যে মধ্যে কেবল সে 'হাঁ-হাঁ' করে যাচ্ছিল।

কিরীটী ও সুব্রতকে তাদের গৃহে নামিয়ে দিয়ে রথীন থানায় ফিরে এল। ফোন করে মৃতদেহটা মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করল। তারপর লালবাজারে ফোন করল বিরাজ সান্যালের রেঙ্গুনের জীবন সম্পর্কে যাতে একটা খোঁজ তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় তারই ব্যবস্থা করবার জন্য।

ঐদিনই সন্ধ্যার সময় সুব্রত আসতেই কিরীটী বললে, সুব্রত, চল্ একবার জুনিফারের ওখানে ঘুরে আসি।

আমিও কথাটা ভাবছিলাম, কিন্তু জুনিফারের কাছ থেকে কি বিরাজ সান্যাল সম্পর্কে জানতে পারবি সেরকম কিছু ?

চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি ! একেবারে শূন্যহাতে নাও তো ফিরতে পারি।

চল্ তাহলে।

দুজনে বের হয়ে পড়ল কিরীটীরই গাড়িতে।

সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে তখন বেশ জমাট বেঁধে উঠেছে। পথে ও দোকানে দোকানে আলো জ্বলে উঠেছে।

রাস্তায় ও ফুটপাথে নানাবিধ যানবাহন ও পথচারীদের রীতিমত ভিড়। দুপুরের দিকে এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। পথ কিছুটা তার স্বাক্ষর দিচ্ছে কাদায় ও জলে। কিরীটী অন্যমনস্কভাবে গাড়ির জানালাপথে তাকিয়ে, তার মুখে একটা চুরোট। সকাল থেকেই জুনিফারের কথা ভাবছিল কিরীটী। জুনিফার

আবার চিঠি দিয়ে সাহায্যের জন্য বিরাজ সান্যালকে ডেকেছিল, অর্থাৎ জুনিফার আজও আশা রাখে বিরাজ তাকে সাহায্য করবেন। আশা না থাকলে সে চিঠি দিত না। তাছাড়া তার আশা যে মিথ্যা নয় তাও তো প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। বিরাজ গিয়েছিলেন জুনিফারের গৃহে কাল রাত্রে। আর জুনিফারের চিঠিটার মধ্যেও যে আশার সুর ছিল সেটাও ঐ একই দিকে যেন ইঙ্গিত করে। আচ্ছা ঐ সঙ্গে আরো একটা কথা গত কাল থেকে বার বার মনের মধ্যে যেন আনাগোনা করছে কিরীটীর, বাসবীর মত অবিকল দেখতে—বাসবীর প্রতিচ্ছবি ঐ মেয়েটি কে? যাকে সুহাস বার দুই দেখেছে, যাকে দেখে বাসবী বলে সে ভুল করেছে—বাসবীরই কি সে কেউ, নিকটতমা কেউ? তা যদি হত বাসবী কি জানতে পারত না? তাছাড়া বিরাজমোহনও কি সেকথা ওদের বলতেন না?

একই রকম দেখতে তো কতজনই হয়। কতজনের চেহারার সঙ্গে কতজনের চেহারার আশ্চর্য রকম মিল থাকে। হঠাৎ দেখলে চমক লাগে। হয়তো বা সেই-রকমই কিছু!

কিংবা হয়তো সেরকম নিকটতমা আত্মীয় সত্যিই কেউ ছিল বাসবীর, হয়তো বা যমজ বোন—বাসবী হয়তো জানতে পারেনি কখনও, একের সঙ্গে অন্যের কখনও বড় হয়ে দেখাসাক্ষাৎও ঘটেনি! কিন্তু তাই যদি হত, ধীরাজ বাসবীর বাবা কি স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার সময় বাসবীর সঙ্গে তার যমজ বোনটিকেও কাছে রেখে দিতেন না?

আবার এমনও তো হতে পারে, ঐ একই চিন্তার সূত্র ধরে কথাটা কিরীটীর মনে উদয় হয়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছাড়াছাড়ির সময় একজনকে ধীরাজ নিয়েছিলেন, অন্যজন ছিল জুনিফারের কাছে? কিন্তু সেখানেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়, বিরাজ হয়তো তেমন কিছু থাকলে জানতে পারতেন। জানা সত্ত্বেও, আবার মনে হয় কিরীটীর, বিরাজ আজ পর্যন্ত সে কথাটা তাদের বলেননি কেন? না বলারই বা কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? গোপন করার কি এমন কারণ থাকতে পারে?

ইতিমধ্যে গাড়িটা ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের মধ্যে ঢুকে গলিপথে খানিকটা অগ্রসর হয়ে থেমে গেল সুব্রতর নির্দেশে।

কি হল সর্দারজী, থামলে কেন?

জবাব দিল সুব্রত কিরীটীর প্রশ্নের, নম্বরটা বোধ হয় সামনের ঐ সরু গলিটার মধ্যে, তাই গাড়ি থামাতে বলেছি।

ওঃ, আচ্ছা চল নামা যাক।

দুজনে নেমে সরু গলিটার মধ্যে ঢুকল। গলির মধ্যে আলো খুব কম। থমথমে একটা আলো-আঁধারি যেন। দুজনে পায়ে পায়ে অগ্রসর হয়।

বাড়িটা খুঁজে পেতে ও জুনিফারের ঘরটা বের করতে ওদের বিশেষ কষ্ট হয় না।

ঘরের দরজা ঈষৎ ভেজানো ছিল। ভিতরে আলোর আভাস পাওয়া যায়। একটু ইতস্তত করে কিরীটী ঘরের দরজার গায়ে মৃদু আঘাত করল দুবার।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় নারীকণ্ঠে ভিতর থেকে সাড়া এল, হুস্ দেয়ার ?

নারীকণ্ঠস্বর একটু যেন জড়ানো, একটু ভারী ভারী, ক্লান্ত—

মে উই কাম ইন ? কিরীটী জবাব দেয়।

ইয়েস্ ! পূর্বের নারীকণ্ঠস্বর আহ্বান জানাল।

কিরীটী ও সুব্রত ঘরের মধ্যে ঢুকল দরজা ঠেলে। ঘরে ঢুকে কাউকেই চোখে পড়ল না প্রথমটায়। চারিদিকের ঘরের মধ্যেকার আসবাবপত্রে একটা দারিদ্র্য ও বিশৃঙ্খলার ছবি যেন স্পষ্ট। মেঝেতে ধূলিধূসরিত ছিন্ন মলিন একটা কতকালের পুরাতন কার্পেট যে বিছানো সেটার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। দু-চারটে সোফা রয়েছে। জীর্ণ, তেল-চিটচিটে। কতকালের পুরনো, কতকালের ব্যবহৃত কে জানে! একটা সেণ্টার টেবিলের ওপরে কিছু ছেঁড়া পুরাতন পিকটোরিয়াল পড়ে আছে এলোমেলো ভাবে। এক পাশে একটা কাঠের আলমারি। ভেতরে প্রবেশের দরজাটি ছাড়া দ্বিতীয় কোন দরজা আর কিরীটীর চোখে পড়ে না।

এদিক ওদিক দৃষ্টি বুলিয়ে জানবার চেষ্টা করছিল কিরীটী ঘরের মধ্যে থেকে একটু আগে কে সাড়া দিয়েছিল !

কিন্তু কাউকেই চোখে পড়ে না।

ঐ সময় আবার সেই নারীকণ্ঠস্বর শোনা গেল, হুস দেয়ার ?

এবারে কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে কিরীটীর নজরে এল, অল্প-শক্তির আলোর জন্য ঘরের যে অংশটা ভাল স্পষ্ট করে তার ইতিপূর্বে নজরে পড়েনি, সেই দিকেই একটা কাঠের ফ্রেমে পর্দা দিয়ে ঘরের কিছুটা অংশ বোধ হয় প্রাইভেট করবার চেষ্টা করা হয়েছে—সেই অংশ ও পর্দার ওপাশ থেকেই কণ্ঠস্বরটা ভেসে এসেছিল।

কিরীটী সামান্য একটু ইতস্তত করে পর্দার দিকে পা বাড়াল। সুব্রতও তাকে অনুসরণ করে কিরীটীর চোখের ইঙ্গিতে।

লিনেনের পর্দা। কোন এক সময় হয়তো মেরুন রংয়ের ছিল, এখন আর সে রঙটা বুঝবার উপায় নেই।

কেমন একটা বদ্ধ বাতাস ও নোংরা ভ্যাপসা গন্ধ সারাটা ঘরে। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হয়।

পর্দার ওপাশে পা দিতেই নজরে পড়ল একটা নেওয়ারের খাটের ওপরে মলিন একটা শয্যা। তার উপরে বসে আছে এক নারী। গায়ে ছেঁড়া ময়লা ক্লাশড্ একটা গাউন। মাথার চুল রুক্ষ বিপর্যস্ত।

সামনে একটা ছোট টেবিলের ওপরে একটা কাঁচের গ্লাস। খানিকটা তরল পদার্থ গ্লাসের মধ্যে। পাশে একটা দিশী মদের বোতল।

হু আর ইউ জেণ্টলমেন ? কারা তোমরা ?

জুনিফার ওদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

Good evening ! If I am not wrong—Mrs Sanyal ! কিরীটী

বললে।

কি—কি বললে? জুনিফার যেন রীতিমত চমকে গিয়েছে। তার নেশারক্তিম দুচোখেও যেন বিস্ময় একটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জুনিফার কিরীটীর মুখের দিকে তখনও তাকিয়ে।

কিরীটী আবার বললে, নিশ্চয়ই আমার ভুল হয়নি, আপনিই ডাঃ ধীরাজ সান্যালের স্ত্রী মিসেস জুনিফার সান্যাল!

একটা যেন ঢোক গিলল জুনিফার, তারপর জিভ দিয়ে নীচের ঠোঁটটা এক বার চেটে নিয়ে বললে, আমার নাম জুনিফারই বটে, কিন্তু আমি জুনিফার সান্যাল কে তোমাকে বললে? কার কাছে শুনেছ?

বসতে পারি?

হ্যাঁ, বসো।

কিরীটী একটা চেয়ার ও সুব্রত পাশ থেকে একটা টুল টেনে নিয়ে জুনিফারের মুখোমুখি একেবারে বসল। তারপর মৃদু হেসে কিরীটী বললে, আমি জানি তুমি ডাঃ সান্যালের স্ত্রী!

But how? কেমন করে জানলে? কারোরই তো জানার আর কথা নয় আজ—

তোমাদের তো divorce হয়নি!

না, তা হয়নি বটে, তবে—

জানি, সেপারেশন হয়ে গিয়েছিল কেবল।

॥ সতেরো ॥

কিরীটীর মুখের দিকে কয়েকটা মুহূর্ত চেয়ে রইল জুনিফার কেমন যেন অসহায় বিহ্বল ক্লান্ত দৃষ্টিতে। তারপর একসময় মাথাটা নীচু করল।

মিসেস সান্যাল! কিরীটী মৃদু কণ্ঠে ডাকে।

Don't call me by that name—সে সব কবে চুকে গিয়েছে, কবে সবই ভুলে গিয়েছি। ধীরাজ মরে গিয়েছে আর আমি—আমিও তো কবরের দিকে পা বাড়িয়েই বসে আছি—one foot is on my grave—বলতে বলতে জুনিফার মুখ তুলল।

ঘরের আলোয় দেখা গেল, জুনিফারের দুটো চোখ জলে চিকচিক করছে। পরিধেয় গাউনের একটা প্রান্ত তুলেই জুনিফার চোখের জল মুছে নিল। তারপর কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বললে, কিন্তু জেণ্টলম্যান, তোমাদের তো আমি চিনতে পারছি না। কখনও জীবনে তোমাদের দেখেছি বলেও মনে পড়ছে না। কে তোমরা, কি তোমাদের পরিচয়, কোথা থেকে আসছ আর আমার কাছেই বা কেন এসেছ?

কিরীটী বললে, দেখ মিসেস সান্যাল—

প্লিজ ও নামে আমাকে ডেকো না। আমাকে বরং তুমি শুধু জুনিফার বলেই ডাকো।

বেশ তাই হবে। আমি বলছিলাম, কেন আমি এসেছি সে কথা বলার আগে আমি একটা প্রয়োজনীয় কথা তোমার সঙ্গে সেরে নিতে চাই।

কি কথা মিঃ—

মিঃ রায় বলেই তুমি আমাকে ডেকো।

বল, কি বলছিলে?

কিছু মনে না কর যদি, মানে if you don't take it otherwise, একটা কথা বলতাম—

বল না কি বলতে চাও? বলতে বলতে জুনিফার হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা ঠোঁটের সামনে তুলে ধরে একটা চুমুক দিল।

তুমি যেভাবে আছ তাতে মনে হচ্ছে you are much in need!

Yes I am completely broken and deserted! বলতে বলতে নিঃশেষিত গ্লাসটা নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর জুনিফার।

কিরীটী তার জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দুটো একশো টাকার নোট বের করে জুনিফারের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললে, জুনিফার, এই দুশো টাকা রাখ—

টাকা! কথাটা অর্ধস্ফুটভাবে উচ্চারণ করে জুনিফার কেমন যেন বোবা বিহ্বল দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ, ধর। Have it—

আমার খুব অভাব, একটা টাকাও আমার কাছে আজ হাজার টাকা, কিন্তু তুমি আমাকে টাকা দিচ্ছ যে কেন তা সত্যিই বুঝতে পারছি না মিঃ রায়!

মনে কর বন্ধু বন্ধুকে দিচ্ছে—

বন্ধু!

হ্যাঁ, আমাকে কি তুমি বন্ধু বলে গ্রহণ করতে পার না জুনিফার?

বন্ধু বলে—

হ্যাঁ, মনে কর বন্ধু তোমাকে দিচ্ছে টাকাটা। ধর, please!

জুনিফারের দু'চোখের কোল সহসা জলে ভরে উঠল দেখতে দেখতে। জল-ভরা চোখে জুনিফার কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, ঠোঁট দুটো তার কাঁপছে।

ধর নাও। কিরীটী যেন একপ্রকার নোট দুটো জুনিফারের শিথিল হাতের মুঠোর মধ্যে গুঁজেই দিল। জুনিফারের শীর্ণ গাল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে এল। এবারে আর সে মুছল না সে চোখের প্রবহমাণ অশ্রুর ধারা। কেমন যেন অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিরীটীর মুখের দিকে। ঠোঁট দুটো কাঁপছে জুনিফারের।

কতদিন—কতদিন কেউ আমার সঙ্গে তোমার মত করে কথা বলেনি! যখন রূপ ছিল যৌবন ছিল সবাই এসেছে আমার কাছে, মুঠো মুঠো টাকাও দিয়েছে—

আজ তোমাকে দেখতে পারে এমন কেউ নেই তোমার ? কোন আপনার জন বা পরিচিত —

না, কেউ নেই।

কেউ নেই ? নিকট বা দূর সম্পর্কের—

ছিল—আমার সব ছিল মিঃ রায়, loving husband, দুটি মেয়ে, অথচ—

মেয়ে ?

হ্যাঁ।

তারা কোথায় ?

তুমি একটু বসবে মিঃ রায়, অনেকদিন বিলিতী হুইস্কি খাই নি—এক বোতল আনাই ! টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল জুনিফার।

এত রাত্রে মদ তুমি কোথায় পাবে ? সব দোকান তো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিরীটী বললে।

এই বাড়িতে David বলে একজন থাকে, তার কাছে সব সময়ই টাকা দিলে পাওয়া যায়। একটু বস, আমি আসছি। জুনিফার ঘর থেকে বের হয়ে গেল গায়ের গাউনটা সামলাতে সামলাতে।

জুনিফার ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই সুব্রত বলে, চমৎকার ফাঁদ পেতেছিস তো কিরীটী !

আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছিলাম সুব্রত। কিরীটী মৃদু হেসে বললে।

সে তো বুঝতেই পারছি।

কিন্তু এত সহজে যে কাজ হাসিল হবে ভাবতে পারিনি। কিন্তু মেয়েটাকে দেখে সত্যিই দুঃখ হচ্ছে, সত্যিই হতভাগ্য—

কিন্তু জুনিফারের কথা শুনে এখন কি আমার মনে হচ্ছে জানিস কিরীটী ?

কি ?

বাসবীরা বোধ হয় যমজ বোন ছিল—

পূর্বেই সেটা আমি অনুমান করেছিলাম এবং বুঝতে পেরেছিলাম সুহাস-বাবু যাকে দেখেছে সে বাসবীরই যমজ বোন—

কিন্তু একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে, বাসবী কি কথাটা জানত না ?

জানা তো উচিত।

তবে ?

সেটাই আমাদের জুনিফারের কাছ থেকে জানতে হবে।

যদি না বলে ?

না বললেও এখন আর কিছু এসে যায় না। যতটুকু সে বলেছে তাই যথেষ্ট। তবে মনে হয় সবই সে বলবে। যে বোতলটা সে আনতে গেল তারই কিছুটা পেটে পড়লেই দেখবি সব কথা একটু একটু করে বের হয়ে আসবে।

একটা কথা ভাবছি —

কি ?

বিরাজ সান্যালও কি জানত না বা জানে না ব্যাপারটা ?

মনে হয় জানে—

কিন্তু জুনিফার যে মদ্যাসক্ত, বুঝতে পারলি কি করে ?

যেটুকু বর্ণনা ওর সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম এর-ওর মুখ থেকে তাতেই বুঝেছিলাম। কিন্তু চুপ, ও বোধ হয় আসছে—

সত্যিই জুনিফারই ঘরে এসে ঢুকল। হাতে তার এক বোতল স্কচ হুইস্কি। রেড লেবেল জনিওয়াকার। মুখে একটা পরিতৃপ্তির হাসি। বোতলটা কিরীটীর সামনে তুলে ধরে বললে, দেখেছ—দেখ! বলেছিলাম না মিঃ রায় তোমাকে—দাঁড়াও একটু অপেক্ষা কর, আরো দুটো গ্লাস আনি—

না না, তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না জুনিফার, তুমি বসো—আমরা ড্রিংক করব না।

তোমরা খাবে না ?

কেমন যেন বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকাল জুনিফার কিরীটীর মুখের দিকে।

না।

আমি একা খাব ?

হ্যাঁ। বস, তুমি গ্লাসে ঢেলে নাও।

জুনিফার আর দ্বিরুক্তি করল না। বোতল থেকে গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে সামান্য জল মিশিয়ে দীর্ঘ একটা চুমুক দিয়ে পরিতৃপ্তির সঙ্গে বললে, আঃ! The scotch—what a flavour!

কিরীটী আর সুব্রত ওকে নিঃশব্দে লক্ষ্য করতে লাগল। দ্বিতীয় পেগ শুরু করতেই কিরীটী পুনরায় মুখ খুলল, জুনিফার!

ইয়েস্—

তোমার দুই মেয়ে বলছিলে, তারা এখন কোথায় ?

কিছুই জান না তোমরা ?

না।

একজন তো মরে গিয়েছে—বাসবী, লুসি এখনও আছে। ধীরাজের সঙ্গে যখন সেপারেশন হয়ে যায় তখন আমার এক মেয়ে থাকে তার কাছে, আর এক-জনকে আমি—মানে ঐ লুসিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসি। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি লুসিকেও না আনলেই বুঝি ভাল হত।

কেন ? ওকথা বলছ কেন ?

সে মানুষ হলে, আমাকে দেখলে—আর আমার আজ দুঃখ ছিল কি ? বলতে বলতে নেশার ঘোরে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে দেয় জুনিফার, সে আমাকে ত্যাগ করেছে, জান মিঃ রায়!

কেন ?

আমাকে সে ঘৃণা করে—she hates me! শুনেছ কখনও এমন কথা মিঃ রায়, যাকে গর্ভে ধরলাম, নিজের সন্তান—সে তার গর্ভধারিণী মাকে ঘৃণা করে,

ত্যাগ করে! যাক গে, মরুক গে, I don't care—বিরাজ বলেছে সে আমাকে সাহায্য করবে। After all he has got heart—

বিরাজের সঙ্গে তোমার জানাশোনা আছে বুঝি?

হ্যাঁ। ধীরাজ আর বিরাজ তো দুই সহোদর ভাই। তারপরই হেসে বলে, I know he has got a soft corner in his heart for me still now!

Soft corner?

হ্যাঁ, একসময়ে যে ভালবেসেছিল আমাকে বিরাজও!

You mean, জুনিফার—

That's an interesting story! গলগল করে অতীত কথা জুনিফার নেশার ঘোরে বলতে শুরু করে দেয়। কিরীটী আর সুব্রত শুনতে থাকে।

সব কিছুই কিরীটীর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। যে সূত্রটা জট পাকিয়ে ছিল সেগুলো সরল হয়ে আসে, স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাসবী আর লুসি যে যমজ বোন, তাও বলে জুনিফার।

বোতলটা প্রায় ইতিমধ্যে অর্ধেক নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। কিরীটী বাধা দেয়, Already you drank a lot to-night, আজ আর খেও না জুনিফার—

ভাবছ মিঃ রায়, আমি মাতাল হব! না, মাতাল আমি হই না। তাছাছা I want to forget—forget everything, সব ভুলতে চাই—ভুলে থাকতে চাই। আবার হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে দেয় জুনিফার।

কিরীটী সুব্রতকে ইশারা করে ওঠবার জন্য।

জুনিফার, আজ আমরা তাহলে যাই—

যাবে?

হ্যাঁ, রাত হল অনেক—

যাবে কেন বন্ধু, থাক না।

না, আজ যাই—আবার আসব।

আসবে তো? ঠিক?

হ্যাঁ।

ভুলে যাবে না জুনিফারকে?

না না—আচ্ছা Good night!

Good night!

কিরীটী ও সুব্রত জুনিফারের ঘর থেকে বের হয়ে এল। সত্যিই রাত হয়েছিল—প্রায় সাড়ে এগারোটা। ম্যানসন বাড়িটা তখন প্রায় নিঝুম হয়ে গিয়েছে। দু-একটা ঘর ছাড়া সব ঘরেরই আলো তখন প্রায় নিভে গিয়েছে। একটা গীটারের সুর কানে এল কিরীটীর। কোন ঘরে হয়ত কেউ গীটার বাজাচ্ছে।

রাতের স্তব্ধতায় গীটারের সুরটা ছড়িয়ে যাচ্ছে। সস্তা একটা ইংরেজী নাচের সুর। আর একটা ঘরে বোধ হয় দুটি নারী ঝগড়া করছে। তাদের উচ্চ কথা-কাটাকাটির আওয়াজ শোনা যায়। কথা-কাটাকাটি মানে পরস্পর পরস্পরকে

জঘন্য গালিগালাজ করছে।

পরস্পরের প্রতি পরস্পরের গালিগালাজ থেকেই বোঝা যায়, ঐখানে কোন্ শ্রেণীর মানুষের বাস।

নিম্নশ্রেণীর একদল অ্যাংলো পরিবার। সবাই হয়ত কোন ফ্যাক্টরিতে বা দোকানে বা অফিসে কিংবা গোডাউনে কাজ করে। যা উপার্জন করে তাতে করে ওদের জাতের স্বপ্ন—ইয়োরোপীয় চালচলন বজায় রাখা তো দূরের কথা, সাধারণভাবে খেয়ে পরে বাঁচবারও সুযোগ পায় না। ফলে সেই জাত্যাভিমানের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকার দরুন এবং তার ব্যর্থ প্রয়াসে বিচিত্র এক জগৎ নিজেরাই গড়ে তুলেছে—তৈরি করেছে নিজেদের নিয়ে নিজেদের এক সমাজ, গোষ্ঠী।

মুখে সর্বদা অশুদ্ধ স্ল্যাং ককনি ইংরেজী বুলি, পরনে মলিন কমদামী সুট বা গাউন, অপুষ্টিকর খাদ্য। যৌন-যথেচ্ছাচারিতা কতকটা স্বভাব ও পরিবেশের জন্য এবং কিছুটা অর্থের লোভে।

কিরীটী প্রায়-অন্ধকার ভাঙা পুরাতন বাড়িটা থেকে বের হতে হতে ভাবছিল, জুনিফারকে আজ এখানে এই নরককুণ্ডের মধ্যেই মাথা গুঁজতে হয়েছে, যেহেতু তার মদ্যপানে আসক্তিই হয়ত তার একমাত্র কারণ। যতদিন রূপযৌবন ছিল দেহ দিয়ে তার প্রয়োজন মিটিয়েছে, কিন্তু আজ সে রূপযৌবনের কিছুই অবশিষ্ট নেই, কাজেই এখানে এসে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

হয়ত জুনিফারের চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খলতাই একদিন ধীরাজ ডাক্তারের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল, অন্যথায় মানুষটা হয়ত তত খারাপ নয়। উচ্ছৃঙ্খলতা যদি শুভবুদ্ধি বা বিবেককে গ্রাস না করত, ও সুখী হতে পারত স্বামী ও সন্তান নিয়ে আর দশটি স্বাভাবিক নারীর মতই এ সংসারে।

কিন্তু তা হতে পারেনি।

নির্জন রাস্তা ধরে গাড়ি ছুটে চলেছিল। কোলাহলমুখর কলকাতা নগরী যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। ক্বচিৎ দু-একটা দ্রুত ধাবমান ট্যাক্সি বা প্রাইভেট গাড়ির শব্দ স্তব্ধতার বুকে একটা তরঙ্গ তুলে মিলিয়ে যাচ্ছে।

রাস্তা ও ফুটপাথ জনহীন বললেই চলে। কদাচিৎ একটি-আধটি পদাতিক চোখে পড়ে। কেবল রাস্তার দু'পাশে আলোগুলো জ্বলছে আর কোথায়ও কোথায়ও নিওন আলোর রঙবেরঙের বিজ্ঞাপন জ্বলছে নিভছে এখনও।

আর কিছুক্ষণ পরে হয়তো ওগুলোও নিভে যাবে। কেবল এক চক্ষু মেলে তাকিয়ে থাকবে স্থগিতযাত্রা পদাতিকের মত পথের দু'পাশের ঐ আলোগুলো।

আকাশ বেশ পরিষ্কার। তারায় তারায় আকাশটায় একেবারে যেন স্থান নেই কোথায়ও। চলমান গাড়ির খোলা জানালাপথে হু-হু করে মধ্যরাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়া চোখেমুখে এসে ঝাপটা দিচ্ছিল।

কিরীটী!

সুব্রতর ডাকে কিরীটীর হঠাৎ যেন চমক ভাঙে। পাশেই উপবিষ্ট সুব্রতর

দিকে তাকায়, কি ?

আমাকে নামিয়ে দিয়ে যা—

আমার ওখানে চল্। কৃষ্ণাকে বলে এসেছি আসার সময় তোর জন্য খাবার রাখতে।

সুব্রত আর উচ্চবাচ্য করে না। বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে। গাড়ি ততক্ষণে চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে আশুতোষ মুখার্জী রোডে পড়েছে।

কিরীটী গাড়ির কাচ তুলে পাইপটায় অগ্নিসংযোগ করে নিল।

আচ্ছা কিরীটী—

কি ?

আচ্ছা লুসি নিশ্চয়ই জানত, তার এক যমজ বোন ছিল ?

আগে না জানলেও এখন হয়তো জানে বলেই মনে হয়।

কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, সুহাসকে সেদিন মার্কেটে লুসি এড়িয়ে গিয়েছিল কেন ?

বাসবী-হত্যারহস্যের ছোট একটা জট এখনও ঠিক ঐ জায়গাতেই পাকিয়ে আছে সুব্রত !

সুব্রত সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল। কিরীটী বললে, ঐ জটটুকু খুলতে পারলেই সমস্ত ব্যাপার স্পষ্ট করে বুঝবার হয়তো একটা পথ খুঁজে পাব।

আচ্ছা কাকে তোর সন্দেহ হয় ?

কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে সুব্রতকে পালটা প্রশ্ন করে, তোর কাকে সন্দেহ হয় আগে বল্ !

প্রথম সন্দেহ আমার ঐ বিরাজ সান্যালকে—

কেন ? বাসবীকে হত্যা করার মধ্যে তার কি স্বার্থ থাকতে পারে বা উদ্দেশ্য ?

সেটাই এখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তবে সেরাত্রের ঘটনা বিশ্লেষণ করলে ও তার পর শ্যামার মৃত্যুর ব্যাপারটা চিন্তা করলে বিরাজ সান্যালের উপরেই সব চাইতে বেশী সন্দেহ পড়ে।

উদ্দেশ্যের কথা না হয় থাকল, কিন্তু কেন তাকে হত্যাকারী বলে মনে হচ্ছে তা তো বলবি !

প্রথমতঃ শ্যামা যে জবানবন্দী দিয়েছিল, কোন একজন লোক সেরাত্রে বাসবীর ঘরে এসেছিল এবং তাকে সে বাথরুমের দরজা দিয়ে পালাতে দেখেছিল, আমার মনে হয় তার কিছুটা সত্য বাকিটা মিথ্যা। কোন একজন লোককে যে বাসবীর ঘরে সেরাত্রে শ্যামা দেখেছিল ঠিকই, তাকে সে চিনতে পেরেছিলও—যা অধিশ্যি সে স্বীকার করেনি, তাই প্রথম অংশ সত্য, শেষাংশ মিথ্যা—

ঠিক বলেছিস। তারপর ?

কিন্তু কথা আর এগুলো না, ইতিমধ্যে গাড়ি গৃহদ্বারে পেঁছে গিয়েছিল। সর্দারজী নেমে দরজা খুলে দেওয়ায় ওরা গাড়ি থেকে নামল।

কলিং বেল বাজাবার আগেই জংলী এসে দরজা খুলে দিল।

।। আঠারো ।।

কৃষ্ণা ওদের অপেক্ষায় বাইরের ঘরেই জেগে বসেছিল একটা উপন্যাস হাতে নিয়ে।

কি ব্যাপার, এত দেরি ?

খানা খেতে খেতেই সবিস্তারে বলব। ক্ষুধায় পেট জ্বলছে। আমি জামাকাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে এখুনি আসছি। কথাটা বলে আর কিরীটী দাঁড়াল না, সোজা শয়নঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

খাওয়ার টেবিলে বসেও বিশেষ কথাবার্তা হল না। খাওয়া শেষ করে যখন ওরা কফির কাপ নিয়ে বসল তখন আবার আলোচনা শুরু হল।

কিরীটীই প্রথমে অর্ধসমাপ্ত আলোচনাটা শুরু করে। বলে, তুই তখন যা বলেছিলি সুব্রত তাতে মনে হচ্ছে সেরাত্রে বিরাজ সান্যালই বাসবীর ঘরে গিয়েছিল, তাই কি ?

আমার মনে হয় তাই। আর—

কি, বল্, থামলি কেন ?

শ্যামা সেটা জানতে পেরে, ওদের মানে বিরাজ ও বাসবীর মধ্যে সেরাত্রে যে কথাবার্তা হয় তাও আড়ি পেতে শুনেছিল।

সম্ভবতঃ তোর অনুমান মিথ্যা নয় সুব্রত, কিন্তু কি কথা হয়েছিল ওদের মধ্যে সেরাত্রে বলে তোর মনে হয় ?

খুব সম্ভবতঃ বাসবীর বিয়ের ব্যাপার নিয়েই কথাবার্তা হয়। বিরাজ সান্যাল হয়ত শেষ চেষ্টা করতে গিয়েছিল—

বিয়েটা যাতে না হয়, তাই কি ?

মনে হয় তাই।

কিন্তু বিয়ে ব্রজেশের সঙ্গে বাসবীর হলেই বা কি হত ?

তা বলতে পারব না, তবে আমার মনে হয় তাই—

কিরীটী মৃদু হাসল।

হাসছিস যে ?

না, কিছু না।

নিশ্চয়ই কিছু, বল্ ?

আমার যা বলবার আর দিন দুই পরে বলব সুব্রত। বিরাজ সান্যালের প্রতি সন্দেহের কারণগুলো এখনও তুই সব বলিসনি!

আমার বিশ্বাস বিরাজ জানতে পেরেছিল অনেক আগেই, বাসবীর আর এক যমজ বোন আছে—

হয়ত জেনেছিল, তাতে করে বাসবীকে কেন নিহত হতে হবে ?

জানতই যদি তো আমাদের কাছে বলেনি কেন ভদ্রলোক ?

সেটা অবিশ্যি important, কেন বলেনি— কেন চেপে গিয়েছিল কথাটা ? তবে আমার মনে হয়—

কি ?

লুসিকে দিয়ে তার কোন কাজ উদ্ধার করবার বাসনা আছে। সে আলোচনায় আমরা পরে আসব। বিরাজ সান্যাল ছাড়া আর কাকে তোর সন্দেহ হয় ?

সুনীলবাবুকে। হয়ত সে আগাগোড়াই মিথ্যা evidence দিয়েছে, সে-সময়ে সে বম্বেতে ছিল। হয়ত প্লেনে করে এসে হত্যা করে একটা alibi সৃষ্টি করবার জন্য পরের দিন আবার বম্বে ফিরে গিয়েছিল।

আশ্চর্য নয়! কিন্তু সন্দেহটা কেন—ভিত্তি কিসের উপর ?

সুনীলবাবুর life এর উপরে সেরাত্রে সিনেমায় যে attemptটা হয়েছিল সেটা আদতে একটা attemptই নয়!

কেন ?

হত্যাকারীর যদি সত্যি-সত্যিই তাকে হত্যা করবার ইচ্ছা থাকত, তাহলে আরো কোন মারাত্মক বিষই তার দেহে প্রয়োগ করা যেতে পারত। একটা ঘুমের ওষুধ inject করে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত একটা লঘু ঘটনায় পর্যবসিত করার বোধ হয় প্রয়োজন হত না।

Exactly! আমি তোর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত সুব্রত। আর ঠিক সেই কারণেই সুনীলবাবুর প্রতি সন্দেহটা পড়া আমাদের খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া তার motiveও ছিল বেশ strong—প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীর উপরে ঈর্ষা! যে ঈর্ষা ক্ষেত্রবিশেষে মানুষকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করে অনায়াসেই তুলতে পারে। ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ ?

একটা নাম যদি করি চমকে যাবি না তো!

না, বল্। তবে জানি তুই কার নাম করবি, বোধ হয়—

কার বল্ তো ?

জুনিফার বোধ হয়— কিরীটী সুব্রতর মুখের দিকে তাকাল। চোখের কোলে যেন কেমন একটা কৌতুকের ইঙ্গিত।

হ্যাঁ।

না রে। আর কারো কথা বলতে পারি না এখনো জোর গলায়, তবে হত্যাকারী যে জুনিফার নয় সেটা আমি বলতে পারি। তবে এটা ঠিকই এবং স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই, বাসবীর হত্যার ব্যাপারে যদি কারো উপরে প্রথম সন্দেহের উদ্রেক করে তো সে ঐ জুনিফারই। কারণ তার পক্ষে মোটিভটা যত strong ছিল, আর কারো পক্ষেই ততটা ছিল না। একসময় মনেও হয়েছিল আমার, বুঝি জুনিফারের চরিত্রের নারীর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয় অর্থের জন্য। নিজের সন্তানের বুকেও সে ছুরি বসাতে পারে। আর সত্যি কথা বলতে কি, জুনিফারের সঙ্গে একটিবার দেখা করবার জন্য সেই কারণেই আমি

তার ওখানে ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু তাকে দেখবার ও তার সঙ্গে কথা বলবার পর সে সন্দেহ আমার দূর হয়েছে।

কিরীটীর কথায় বাধা দিয়ে সুব্রত বললে, মনে হচ্ছে তুই—overcarried by emotions!

তা নয়, সুব্রত।

তবে?

নারী যেমন দুর্বলতা, কোমলতা ও স্নেহের প্রতীক, তেমনি কত সহজে যে তারা এক জনের বুকে ছুরি চালাতে পারে তাও আমি জানি, বিশেষ করে নারী কোন কারণে unbalanced হয়ে গেলে! কিন্তু জুনিফার আজ একপ্রকার মৃতা নিজেই। ঠিকই বলেছিল সে, আজ সে completely broken! না সুব্রত, জুনিফারের প্রতি আমার এতটুকু সন্দেহ নেই, তার motive যতই storng মনে হোক না কেন আপাত-দৃষ্টিতে।

কিরীটী কথাগুলো বলতে বলতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। খোলা জানালাপথে রাত্রির আবছায়া অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার হাতের পাইপ হাতেই ধরা থাকে।

আচ্ছা কিরীটী—সুব্রত ডাকে।

উঁ?

শ্যামা যে তার জবানবন্দিতে সাহেবের কথা বলেছিল সে কে? ঐ পলই কি? যার কথা জুনিফার বলেছিল?

হতে পারে, নাও হতে পারে।

সুব্রত বুঝতে পারে, কিরীটী যেন কি ভাবছে। তার ভাবনার মধ্যে সে তলিয়ে গিয়েছে। হয়ত কোন সূত্র হাতড়ে বেড়াচ্ছে মনের মধ্যে। তাই সুব্রত আর কোন কথা বলে না. চুপ করে থাকে।

বাইরে রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে আসছে। অন্ধকার তরল হয়ে আসছে। চোখ দুটো জ্বালা করছিল সুব্রতর। সে সোফাটার উপরই একটা ডানলোপিলো কুশন টেনে নিয়ে কাত হয়ে পড়ল।

দেখতে দেখতে সুব্রত ঘুমিয়ে পড়ল।

কিরীটীর চোখে ঘুম ছিল না। বাসবীর হত্যার ব্যাপারে যারাই বাসবীর সঙ্গে পরিচিত ছিল তাদের প্রত্যেককেই মনের মধ্যে দাঁড় করিয়ে সে একের পর এক বিশ্লেষণ করছিল। রঞ্জন—সুনীল—ব্রজেশ—সুহাস—বিরাজমোহন প্রত্যেককেই।

মুখে সুব্রতকে বিরাজ সান্যাল সম্পর্কে ক্ষণপূর্বে যাই বলুক না কেন, মনটা কিন্তু একেবারে নিঃসন্দেহ হতে পারছিল না জুনিফারের ব্যাপারে। কোথায় যেন একটা অদৃশ্য কাঁটা কিচকিচ করছিল, বিশেষ করে শ্যামার মৃত্যুর কথাটা। যখনই মনে পড়ছিল জুনিফারের কথাটা—ধীরাজ ও বিরাজ দুই ভাইই তাকে ভালবেসেছে, তীব্রভাবে কামনা করেছে—

তারপর শ্যামার সঙ্গে বিরাজের একটা যৌন-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং সেটা আর যার কাছেই গোপন থাক্ ঐ বাড়ির দুজনের চোখকে ফাঁকি দিতে নিশ্চয়ই পারেনি—বাসবী ও মাধব। দুজনেই নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিল। শ্যামার মৃত্যুর কারণটা সেই গোপন যৌন-সম্পর্কের জের হতে পারে, কিন্তু বাসবীর মৃত্যুর সঙ্গে হয়ত তার কোন সম্পর্কই নেই।

দুটো ঘটনা হয়ত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। একের সঙ্গে অন্যের কোন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগই নেই।

কিন্তু সত্যিই কি নেই?

সত্যিই কি দুটো ঘটনা সম্পূর্ণ যোগসূত্রহীন?

রাত প্রায় যে শেষ হয়ে এল বুঝতে পারেনি কিরীটী।

কৃষ্ণা এসে ঘরে ঢুকল।

হাতে তার দু'কাপ গরম কফি।

কৃষ্ণা হাসতে হাসতে বললে, নাও কফি—

কফি!

হ্যাঁ, রাত পোহাল শুনহ সখি দীপ্ত উষার মাঙ্গলিক—

রাত পুইয়ে গেল নাকি! হাত বাড়িয়ে কফির একটা কাপ কৃষ্ণার হাত থেকে নিতে নিতে স্মিতকণ্ঠে বলে কিরীটী।

হ্যাঁ।

কৃষ্ণা একবার অঘোরে নিদ্রিত সুব্রতর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে, আহা বেচারী, গভীর নিদ্রাভিভূত! ঘুমোক। জাগলে আবার কফি করে দেবো। নিজেই এটার সদ্ব্যবহার করা যাক।

কৃষ্ণা কিরীটীর পাশেই সোফাটার উপর বসে পড়ল।

দুজনে পাশাপাশি সোফার উপরে বসে কফির কাপে চুমুক দিতে থাকে।

তারপর? কৃষ্ণা কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করল, তারপর বাসবী-হত্যারহস্যের কোন কিনারা হল প্রভু!

মোটামুটি। সামান্য একটু জট কেবল বাকি। আশা করছি সেটাও শীঘ্রই খুলে যাবে। তারপরই যবনিকা পতন বাসবী-হত্যারহস্য-নাটকের উপরে।

যাক, নিশ্চিন্ত—

তার মানে?

আর ছট্‌ফট করতে হবে না। যবনিকা এবারে নামবে বুঝতে পারছি।

তার উপায় নেই কৃষ্ণা। মৃদু হেসে কিরীটী বলে।

কেন?

নাটক এখনো শেষ দৃশ্যে আসেনি—

তাহলে শেষ দৃশ্যের প্রস্তুতি এবারে বল!

হ্যাঁ।

তা নাট্যকার, শেষ দৃশ্যের পাত্রপাত্রী কারা?

বল তো কারা ! তুমি তো সব জান, সব শুনেছ—

ইতিমধ্যে সুব্রতর ঘুম ভেঙে সে উঠে বসে কিরীটীর কথাগুলো শুনছিল, কিন্তু কিরীটী বা কৃষ্ণা দুজনের একজনও কেউ জানতে পারেনি।

হঠাৎ সুব্রতর গলার স্বরে ওরা দুজনেই যুগপৎ সুব্রতর মুখের দিকে ফিরে তাকায়।

সুব্রত বলে, শ্রীমতী লুসি বোধ হয় নায়িকা—

কিরীটী সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, ঠিক বলেছিস।

আর নায়ক ঐ পাঁচ বন্ধু—

পাঁচ নয়, চার !

কৃষ্ণা ঐ সময় বলে ওঠে, কিন্তু নায়ক তো কোন নাটকে চারজন হতে পারে না মহাশয় !

সুব্রত বলে, কিরীটী ঠিক তা বলেনি কৃষ্ণা, ও বলতে চেয়েছে ঐ চার বন্ধুর মধ্যেই একজন—কিন্তু আমার কফি কই কৃষ্ণা ? সুব্রত মৃদু হেসে কথা শেষ করে।

আনছি ভাই। কৃষ্ণা উঠে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ রথীন এল।

কি সংবাদ ভগ্নদূত ? কিরীটী হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে।

সংবাদ অতীব জটিল। হাঁপাতে হাঁপাতে সোফাটার উপরে ধুপ করে বসে পড়ে রথীন বললে।

শ্যামার পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট পেয়েছিস ? কিরীটী প্রশ্ন করে।

সেই কথাই বলতে এসেছি—

রথীনকে কথা শেষ করতে দিল না কিরীটী, বললে, কি, শ্যামা অন্তঃসত্ত্বা ছিল—সেই কারণেই জটিল বোধ হয় ?

হ্যাঁ। তুই—তুই কি করে অনুমান করেছিলি ? তবে কি সেই জন্যই পথের কাঁটা সরানো হয়েছে ?

কিরীটী রথীনের প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না। প্রত্যুত্তরে মৃদু একটা হাসির আভাস ওর ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা যায়।

রথীন আবার বলে, তবে কি ঐ বুড়ো ঘুঘুটাই—

কিছুই বিচিত্র নয়। কিরীটী বলে এবারে।

তাহলে—

কি, তাহলে ?

বিরাজ সান্যালই কি তার ভাইঝিকেও হত্যা করেছে ?

স্বার্থের জন্য মানুষ কি না পারে রথীন !

কৃষ্ণা এসে ঘরে ঢুকল, দু'হাতে তার একটা প্লেটে বড় বড় চারটে সন্দেশ ও এক মগ কফি, নিন রথীনবাবু, গলাটা ভিজিয়ে নিন।

আহা ! প্লেটটা হাতে নিতে নিতে রথীন বলে, এ না হলে আর বলেছে

ভ্রাতৃজায়ার স্নেহ!

আচ্ছা কৃষ্ণা, তোমার মতলবখানা কি বল তো? কিরীটী বলে ঐ সময়।

কেন? কৃষ্ণা কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল সহাস্যে।

ওকে কি শেষ পর্যন্ত তুমি সুগার দিয়েই ভরাডুবি করতে চাও সত্যি সত্যি?

সন্দেশ একটা চিবুতে চিবুতে রথীন বলে, চিনির সাগরে ভরাডুবি! হোক হোক—তাই হোক। তুমি কিছু ভেবো না বৌদি, সামান্য দুটো ইনসুলিন ইনজেকশন তো, ও ভয়ে কম্পিত নয় হৃদয় আমার!

সন্দেশ শেষ করে কফির মগে চুমুক দিতে দিতে রথীন বলে, কিন্তু লোকটার সত্যি সত্যি বাহাদুরি আছে বলতেই হবে।

সুব্রত প্রশ্ন করে, কার সিকদার?

কথায় বলে না, খোঁড়ার এক পা বাড়া! ঐ খোঁড়া পা নিয়েই লোকটা ভেল্কি দেখিয়ে দিল দেখছি।

কিরীটী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, দোহাই ধর্ম, তাকে আবার গিয়ে সাত তাড়াতাড়ি arrest করে বসিস না রথীন!

তবে কি করতে হবে মহাপ্রভুটিকে? পাদ্যঅর্ঘ দিয়ে পুজো?

কিছুই না।

তার মানে?

আপাতত দুটো দিন সবুর কর বৎস। তারপর যা করবার করো।

ঠিক হ্যায় জনাব।

তা তোর ময়না তদন্ত রিপোর্টে আর কি বলছে? ক'টা নাগাদ শ্যামা খুন হয়েছে, তোর পুলিস সার্জেনের ধারণা?

বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে।

তাহলে ঠিক মধ্যরাত্রি?

হ্যাঁ, সেই রকমই নন্দা সাহেবের মত।

বাসবীর ময়না তদন্তের রিপোর্টও তো সেই রকমই, বলেছে না?

হ্যাঁ।

দুটো হত্যাই তাহলে মধ্যরাত্রি?

শুধু দুটো কেন, সেরাত্রে সুনীলবাবুকে হত্যা করতে পারলেও ঠিক মধ্যরাত্রিতেই ব্যাপারটা সংঘটিত হত। রথীন কফির মগটা নিঃশেষিত করে সামনের টেবিলের উপর নামিয়ে রাখতে রাখতে বলে।

ঐ সময় জংলী এসে ঘরে ঢুকল, বাবু!

কি রে?

সুহাসবাবু বলে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

ডাক্ তাঁকে এই ঘরেই—

জংলী চলে গেল এবং একটু পরে সুহাস এসে ঘরে ঢুকল। মাথার চুল রুক্ষ বিশৃঙ্খল, চোখেমুখে কেমন যেন একটা উদ্বিগ্ন ভাব।

বসুন সুহাসবাবু, কিরীটীই বলে, এই সকালে কি ব্যাপার ? চেহারা অমন রুক্ষ কেন ?

কাল রাত্রে আমার উপর দিয়ে একটা attempt হয়ে গিয়েছে মিঃ রায়—

রথীন চমকে ওঠে, সে কি ! কখন ?

কাল রাত্রে তখন সাড়ে এগারোটা বারোটা হবে—

রথীন কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল প্রথমে, তারপর সুহাসের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, খুলে বলুন তো ব্যাপারটা !

রাত্রের শোতে সিনেমায় গিয়েছিলাম একট পিকচার দেখতে। ইংরেজী বই। সোয়া এগারোটার আগেই শো ভেঙে গিয়েছিল। বাড়িতে ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে দোতলায় শোবার ঘরে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছি ঠিক সেই সময়—

কি ?

রাস্তা থেকে কে যেন আমায় গুলি করে—

গুলি ?

হ্যাঁ, তবে রক্ষে গুলিটা আমার বুকে না লেগে জানলার শার্সিতে লাগে। শার্সির কাচটা ঝনঝন শব্দে ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়।

বুলেটটা পেয়েছেন ? সুহাসের মুখের দিকে তাকিয়ে এবারে প্রশ্ন করল সুব্রত।

পেয়েছি বৈকি, এই যে—

সুহাস পকেট থেকে একটা পিস্তলের গুলি বের করে সুব্রতর হাতে দিল। সুব্রত গুলিটা বারকয়েক ঘুরিয়ে দেখে কিরীটীর হাতে সেটা তুলে দিল।

কিরীটী বুলেটটা পরীক্ষা করে নিঃশব্দে রথীনের হাতে দিল কোনরূপ মন্তব্য না করে।

।। উনিশ ।।

রথীন গুলিটা পরীক্ষা করতে করতে বললে, একটা কথা কিরীটী তোকে বলা হয়নি—

কি ? কিরীটী প্রশ্নটা করে রথীনের মুখের দিকে তাকাল।

বিরাজ সান্যালের একটা পিস্তল আছে। অবশ্যি লাইসেন্সও আছে পিস্তলের। এই গুলিটা এ ধরনের পিস্তলে ব্যবহৃত হয়—

তুই জানলি কি করে কথাটা ?

বাসবীর হত্যার তদন্তের সময় আমিই প্রশ্ন করেছিলাম, তখন সান্যাল বলেছিল, বর্মা থেকেই নাকি আনে তার পিস্তল—

হঠাৎ পিস্তলের কথা সেদিন উঠল কেন ? বাসবীকে তো গলা টিপে হত্যা করা হয়েছিল ?

হয়েছিল ঠিকই, তবু investigation-এর সময়, বিশেষ করে কোন খুনের ব্যাপারে সব কিছুই জিজ্ঞাসা করাটা একটা রীতি। তাই জিজ্ঞাসা করতে জানতে পেরেছিলাম কথাটা—

সুহাস ওদের কথাগুলো যেন গিলছিল এক প্রকার। সে এবারে বললে, সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রায়, সেদিন সুনীলের life-এর উপরে cinema-এর lobbyতে attempt হওয়ার পর আপনি যখন আমাদের সকলকে সতর্ক থাকতে বলেছিলেন, আমাদেরও life-এর উপরে ঐ ধরনের attempt হতে পারে বলে, কথাটায় তখন ততটা গুরুত্ব দিইনি কিন্তু কালকের ব্যাপারের পর বুঝতে পারছি, সত্যিই আপনার দূরদৃষ্টি আছে। তাই ভাবছি কাল রাত্রের ব্যর্থতার পর যদি আবার attempt হয়—

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, ভয় নেই সুহাসবাবু, আর attempt হবে না আপনার life-এর উপরে।

সত্যি বলছেন ?

সত্যিই বলছি। কারণ বোকামি মানুষ একবারই করে, বার বার করে না।

বোকামি! প্রশ্নটা করে কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সুহাস কিরীটীর মুখের দিকে।

ঠিক তাই। কালকের ব্যাপারটা একটা নিছক নির্বুদ্ধিতা প্রদর্শন ছাড়া অন্য কিছুই আমি বলতে পারছি না।

আপনারা একবার আমার বাড়িতে যাবেন না ?

কেন বলুন তো ?

কিভাবে ঘরের জানালার কাচটা ভেঙেছে স্বচক্ষে দেখবেন না ?

যাবেন বৈকি রথীনবাবু—

আপনি ?

রথীন দেখলেই হবে। তাছাড়া পুলিস অফিসারেরই কর্তব্য ওটা। ভাল কথা—হঠাৎ কিরীটী প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়, আপনার সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ইতিমধ্যে ?

কোন্ ভদ্রমহিলার কথা বলছেন মিঃ রায় ? সুহাস প্রশ্ন করে।

ঐ যে বলেছিলেন, ঠিক বাসবী দেবীর মত অবিকল দেখতে একজন মহিলা—

না।

দেখা হয়নি তাহলে ?

না।

দেখা হলে কিন্তু এবারে follow করবেন তাঁকে—

Follow করবো!

হ্যাঁ, কোথায় থাকেন তিনি, তাঁর সত্যিকারের পরিচয়টা আমাদের জানা একান্ত দরকার।

কিন্তু ভদ্রমহিলা হয়ত আপত্তি করবেন—

আহা, তা তো করবেনই। তবে বুদ্ধি করে সব দিক বাঁচিয়ে ভদ্রমহিলাকে follow করে তাঁর সব কিছু আপনাকে জানতে হবে। পারবেন না?

বোধ হয় পারব।

নিশ্চয়ই পারবেন।

আজ তাহলে আমি উঠি?

আসুন।

সুহাস সোফা থেকে উঠে ঘর হতে বের হয়ে গেল কেমন যেন শিথিল পদবিক্ষেপে।

সুহাস ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই রথীন বললে, ভদ্রলোক খুব ভয় পেয়ে গিয়েছেন মনে হল।

কিরীটী নিবন্ত পাইপটার পোড়া তামাক ফেলে দিয়ে নতুন তামাক ঠেসে পুনরায় অগ্নিসংযোগ করতে করতে বললে, হবারই তো কথা। জীবনসংশয় বলে কথা—

সুব্রত কিরীটীর মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকাল একবার।

রথীন! কিরীটী পাইপে একটা টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করে ডাকল।

কিছু বলছিস?

ঝাউতলার বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা ঠিক চলেছে তো?

হ্যাঁ। দ্বিজেনকে বদলে অবিনাশকে রেখেছি। খুব চালাকচতুর ছোকরা।

আরো একটা বাড়িতে watch রাখতে হবে যে রথীন—

আবার কোন্ বাড়িতে?

ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে জুনিফার যে ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকে সেই বাড়ির ঠিকানাটা বলে দিল কিরীটী রথীনকে।

ওখানে আবার কেন?

ওখানেই তো বাসবীর মা জুনিফার থাকে। কিন্তু আর নয়, এবারে অফিসার সাহেব তুমি গাত্রোত্থান কর, আমরা একটু বেরুব।

কোন্ দিকে যাবি?

বেশী দূরে নয়, কালীঘাট অঞ্চলে—

তোর গাড়ি আবার কেন বের করবি—চল্ সঙ্গে আমার জীপ আছে, নামিয়ে দেবো'খন।

ধন্যবাদ বন্ধু। গাড়ি নয় ট্রাম—তারপর পদব্রজে যাব স্থির করেছি।

ট্রামে উঠতে পারবি?

আজ তো রবিবার, ভিড় হবে না তেমন নিশ্চয়ই—

তাহলেই হয়েছে! এ শহরে শনি রবি সোম বলে কিছু নেই, শহরসুদ্ধ সবাই এক সঙ্গে যাত্রী হয়ে ঠেলাঠেলি করবেই বাসে ট্রামে প্রতিটি দিন।

তা হোক, কতকাল ট্রামে চাপিনি, সে অনুভূতিটাই যেন ভুলে গিয়েছি, ট্রামে চেপে যাবার—

আমার বড় শালী লীলার বান্ধবী লাবণ্যদির সেই ট্রামে চেপে যাবার অনুভূতিটার কথা মনে পড়ল রে তোর কথায়। সে রকম কিছু না তো!

সে আবার কি?

সে এক মজার ব্যাপার। লীলাকে লাবণ্য একদিন বলেছিল, আচ্ছা লীলা, ট্রামে যাবার সময় কি রকম ভিতরে সুড়সুড় করে যেন আমার, তোর করে না?

হো হো করে কিরীটী ও সুব্রত রথীনের কথায় হেসে ওঠে।

রথীন বলে, হ্যাঁ রে, সত্যি।

হয়েছে—যা তো এখন! কিরীটী বলে ওঠে।

রথীন ঘর থেকে বের হয়ে যায়। রথীন বের হয়ে যেতেই সুব্রত প্রশ্ন করে, কোথায় বেরুবি এখন?

চল্ একবার লুসি দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি—

আমি তো গতকাল থেকেই কথাটা ভাবছিলাম, সুব্রত বললে, বাসবীর যমজ বোন, তাছাড়া—

কি রে, থেমে গেলি কেন?

বিরাজ সান্যাল লুসির অস্তিত্বের ব্যাপারটা একেবারেই জানে না, কেমন যেন বিশ্বাসযোগ্য নয়!

আরো একটু স্পষ্ট করে বল্ সুব্রত। তুই যেন কিছু চেপে যাচ্ছিস, তোর মনের কথাটা মনে হচ্ছে—

মনে হয় কেন জানি না, বাসবী ও লুসি কেউ-না-কেউ হয়তো আর একজনের অস্তিত্বের কথাটা জানত। আর তা যদি জেনে থাকে, সেখানেও একটা জটিলতা দেখা দিতে পারে।

ঠিক বলেছিস। একজন কিছু পেল না, আর একজনের ভাগ্যে সব কিছু মিলল—হিংসা তো জন্মাতেই পারে, বিশেষ করে মেয়েদের বেলায়—

আর সেই হিংসা থেকেই গরল উঠে আসতে পারে।

স্বাভাবিক। কিন্তু আমি তা ভাবছি না সুব্রত, আমি ভাবছি অন্য একটা কথা লুসি সম্পর্কে বর্তমানে—

কি?

বাসবীর ঐ পাঁচ বন্ধুর মধ্যে কেউ লুসিকে চিনত কিনা, কিংবা তার অস্তিত্বের কথাটা অন্তত জানত কি না! যদি না জেনে থাকে, তাহলে—

সুব্রত সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, বুঝতে পেরেছি তোর মতলবটা।

পেরেছিস?

হ্যাঁ। কিন্তু তুই কি তাহলে—

তাহলে কিছুই না। সমস্ত রহস্যটা একটা বিশেষ জায়গায় এসে হঠাৎ যেন ঘন একটা কুয়াশায় পরিণত হয়েছে। সেই কুয়াশাটুকু যতক্ষণ না কাটছে, ঐ তাহলের ব্যাপারটা ঘটালেও আমরা কোন মীমাংসায় পেঁছতে পারব না। কিন্তু আর না, চল্ এবারে দেখা করে সন্দেহভঞ্জনটা করে আসি।

জুনিফারের কাছ থেকেই কিরীটী গতরাত্রে লুসির কালীঘাটের বাসার ঠিকানাটা জেনে নিয়েছিল। ট্রামে এসে টালীগঞ্জ ব্রিজের মুখে দুজনে নেমে পড়ল।

ঠিকানাটা বাঁয়ে কিছুটা এগিয়ে সরু একটা রাস্তায় কালীঘাট স্কুলের পিছনে। খুঁজে বের করতে ওদের বিশেষ বেগ পেতে হল না। তিনতলা একটা লাল রঙের বাড়ি। তারই দোতলায় তিনখানি ঘর নিয়ে লুসি ও তার বান্ধবী সুমিত্রা পন্থ থাকে। নীচের তলায় এক প্রৌঢ়, তার স্ত্রী ও একটি স্কুল-মিসট্রেস মেয়ে থাকে। সেই স্কুল-মিসট্রেস মেয়েটিই লুসির খোঁজ করতে বললে উপরের তলায় যেতে সিঁড়ি দিয়ে।

কমন সিঁড়ি একতলা দোতলা ও তিনতলার বাসিন্দার। সিঁড়ির গায়েই দরজা। দরজার কলিং বেল টিপতেই লুসিই এসে দরজা খুলে দিল। পরনে তার সাধারণ একটি সরু কালোপাড় তাঁতের শাড়ি। দু হাতে একগাছি করে সরু সোনার বালা ও দু কানে দুটি মুক্তার টাব ব্যতীত দেহের কোথাও আর কোন আভরণের চিহ্ন নেই। পায়ে স্যাণ্ডাল।

বাসবীর ফটো দেখা ছিল ওদের, তাই লুসিকে চিনতে ওদের কষ্ট হয় না। অবিকল একই রকম দেখতে।

কাকে চান?

কিরীটীই কথা বললে, আপনি তো মিস সান্যাল!

হ্যাঁ।

আমাদের আপনি চিনবেন না। আমরা আপনার কাছেই আসছি। আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।

আসুন। লুসি কিরীটী ও সুব্রতকে অভ্যর্থনা করে ভিতরের প্রথম ঘরটিতেই নিয়ে গিয়ে বসতে বললে, বসুন!

ছোট ঘর। খান দুই সোফা ও চেয়ার। একটি ডিম্বাকৃতি মাঝারি আকারের সেণ্টার টেবিল। টেবিলের উপরে ফ্লাওয়ার ভাসে কিছু লাল সাদা অ্যাস্টার ফুল ও একগোছা রজনীগন্ধার স্টিক। মেঝেতে অল্পদামের একটা কার্পেট পাতা। ঘরের দেওয়ালে একটি ডেট ক্যালেণ্ডার ও যীশুক্রোড়ে মেরি মাতার ছবি।

লুসি তখনও দাঁড়িয়েই ছিল, তার দিকে তাকিয়ে কিরীটী বললে, বসুন মিস সান্যাল।

লুসি বসল ওদের মুখোমুখি।

পরিচয় দিই, আমার নাম কিরীটী রায় আর ইনি সুব্রত রায়—

লুসির চোখমুখে কোন ভাববৈলক্ষণ্যই দেখা গেল না। সে ইতিপূর্বে ঐ নাম দুটি কখনও শুনেছে বলেও মনে হল না।

আমার কাছে আপনাদের কি প্রয়োজন? লুসিই প্রশ্ন করে।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আপনার একটি যমজ বোন ছিল, নাম বাসবী—কিরীটীর মুখ থেকে কথাটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন চমকে লুসি কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল। কিরীটী বলে যেতে লাগল, সেই বোনটি

আপনার কিছুদিন আগে খুন হয়েছে, তাও জানেন নিশ্চয়ই—

আপনারা কে? কোথা থেকে আসছেন? পুলিসের লোক কি?

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, না।

তবে কে আপনারা?

অবিশ্যি পুলিসের লোক না হলেও পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ আছে বলতে পারেন। আর এও অস্বীকার করব না যে ঐ হত্যার ব্যাপারেই আমরা এসেছি।

কিন্তু আমার কাছে কেন?

ব্যস্ত হবেন না। সবই বলব, সবই জানতে পারবেন। বাসবী দেবী আপনার সেই যমজ বোনের—

কিরীটীকে কথাটা শেষ করতে দেয় না লুসি। বলে, কিন্তু তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল না তার জীবিতকালে। পরস্পর আমরা কেউ কাউকে বড় হবার পর দেখিওনি—চিনতামও না একে অন্যকে, খুব ছোটবেলায় ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

জানি—সব জানি।

তবে?

তবুও কেন আপনার কাছে এসেছি আমরা, তাই না?

হ্যাঁ, মানে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না—

আচ্ছা আপনি তো বরাবরই জানতেন দেখাসাক্ষাৎ না হলেও যে আপনার একটি যমজ বোন আছে, ঠিক আপনারই মত দেখতে—

না, ব্যাপারটা কিছদিন আগে মাত্র জানতে পেরেছিলাম।

কেন, ছোটবেলার কথা কি কিছুই মনে ছিল না আপনার?

না—না। একটু যেন ইতস্তত করে শব্দটা উচ্চারণ করল লুসি।

সে বড় ছিল, না আপনি?

বোধ হয় আমিই। আমার জন্মের কয়েক মিনিট পরে সে জন্মেছিল। কিন্তু এসব কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন মিঃ রায়? একটু আগেই তো বললাম, তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই ছিল না!

হুঁ। আচ্ছা একটু আগে আপনি বলছিলেন কিছুদিন আগে মাত্র তার কথা জানতে পেরেছিলেন—কেমন করে, বলবেন কি?

মার ডাইরী থেকে –

আপনার মা বুঝি ডাইরী রাখতেন?

একসময় রাখত মনে হয়, পুরাতন একটা ডাইরী তার বাক্সর মধ্যে পড়েছিল—

মাকে কথাটা বলেছিলেন?

না।

কেন?

প্রয়োজন মনে করিনি।

কেন?

কেন আবার কি, করিনি—

হুঁ। তা তাকে কবে দেখেছিলেন প্রথমে বাসবী আপনার যমজ বোনকে?

লুসি একটু ইতস্তত করে সেরাত্রে বিরাজের সঙ্গে দেখা করে বাসবীকে দেখার কথা যা ঘটেছিল সেই ঘটনাটা বিবৃত করে গেল সংক্ষেপে।

তার পরও মাকে বলেননি সব কথা?

না। মার সঙ্গে আমার বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না ঐ সময়। আমি একটা ক্রীশ্চান স্কুল-বোর্ডিংয়ে মানুষ হয়েছি।

খরচ নিশ্চয়ই আপনার মা-ই চালাতেন?

না।

তবে কে?

আমার জ্যাঠা।

বিরাজ সান্যাল কি?

হ্যাঁ, তাঁকে আপনি চেনেন?

চিনি।

তাঁর কাছ থেকে আমার সংবাদ পেয়েছেন?

না।

তবে? আমার ঠিকানা জানলেন কি করে?

আপনার মার কাছ থেকে।

লুসির মুখটা যেন হঠাৎ কঠিন হয়ে ওঠে, সে চুপ করে থাকে।

আপনার—বিরাজ সান্যাল মানে আপনার জ্যাঠার সঙ্গে পরিচয় নেই?

বাসবীর মৃত্যুর পর একদিন রাত্রে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তার আগে তাঁকে কখনও দেখিনি, চিনতামও না—সেই প্রথম পরিচয়।

হুঁ। তা কেন গিয়েছিলেন হঠাৎ তাঁর কাছে?

তাঁর বিপদের কথা ভেবে তাঁকে সতর্ক করে দিতে—

যাঁকে দেখেননি, চিনতেন না—তাঁর বিপদের কথা ভেবে আপনি হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন?

জানি না, তবে গিয়েছিলাম—

তিনি সব শুনে কি বলেছিলেন?

কিছুই না।

আচ্ছা আপনিই তো এখন বাসবীর অবর্তমানে বিরাজ সান্যালের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী?

আমার কারও কোন সম্পত্তির কোন প্রয়োজন নেই।

কেন?

কেন আবার কি, ওসবে আমার কোন স্পৃহা বা আকাঙ্ক্ষা নেই।

একটু থেমে লুসি বলে, তাঁকে আমি সেকথা জানিয়েও দিয়ে এসেছি স্পষ্ট করে সেই দিনই।

আপনার কি অর্থের প্রয়োজন নেই?

যা আমি রোজগার করি তাই যথেষ্ট, আমার তো কোন অভাব নেই!

অভাব না থাকলেও সম্পত্তি টাকাকড়ি পেলে কে ছেড়ে দেয়?

যার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, জন্মের পরেই যে সম্পর্কের শেষ হয়ে গিয়েছিল বলতে গেলে—সে সম্পর্ককে আর যে-ই বড় করে ভাবুক না কেন আমি ভাবি না।

আপনার জ্যাঠারও কি তাই মত?

জানি না।

তিনি কিছু বলেননি?

হ্যাঁ, পরিচয় পাবার পর আমাকে তাঁর ওখানে গিয়ে থাকতে বলেছিলেন কিন্তু আমি রাজী হইনি।

আচ্ছা একটা কথা বলব, মনে যদি কিছু না করেন—

বলুন! মনে করব কেন?

আপনার মার কথা বলছিলাম—

লুসির মুখটা আবার কঠিন হয়ে উঠল, সে বললে, তার কথা থাক—

তাঁর খুব অভাব, আর আপনি ছাড়া তাঁর সত্যিই আজ আর তো কেউ নেই!

তার হয়েই কি ওকালতি করতে এসেছেন আপনারা? তা যদি এসে থাকেন তো মিস্টেক্—

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, না, সে কারণে আসিনি। এমনিই কথাটা বলছিলাম। আপনার মা—তাঁকে যদি আপনি নাই দেখেন তো আমার কি বলবার থাকতে পারে!

আপনি সব কথা জানেন না মিঃ রায়, আর আমিও সে-সব কথা তুলতে চাই না। তারপর একটু থেমে বলে লুসি, একদিন সব কথা জানতামও না—বুঝতামও না, কিন্তু যেদিন থেকে বুঝতে পেরেছি তার প্রতি আর আমার কোন মমতাই নেই।

মমতা না থাকলেও কর্তব্যবোধ তো আছে একজন সন্তানের—

যত কর্তব্য বুঝি সন্তানেরই? মায়ের সন্তানের প্রতি কোন কর্তব্য বা দায়-দায়িত্ব বুঝি নেই? কেন, আজ তার পরম বন্ধু—পরম আপনার জন পল কোথায় গেল?

পলও তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছে।

আর কোন আশাই নেই বলে বুঝি?

তা জানি না, তবে পল আজ আপনার মার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে

যতদূর জানি—

কে, মা বলেছে বুঝি ?

ধরুন তাই—

বিশ্বাস করবেন না তার কথা, আজ পর্যন্ত জীবনে কখনও সে সত্যি কথা বলেছে কিনা সন্দেহ !

আচ্ছা একটা কথা, পল কি জানে আজ আপনিই বিরাজ সান্যালের সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ?

না, জানার কথা নয়। কিন্তু ওসব কথা বার বার বলছেন কেন ? আমি কারও সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকারিণীই হতে চাই না। কারও কোন সম্পত্তির উপরই আমার লোভ নেই, একটু আগেই তো বললাম আপনাকে।

তাই যদি না থাকবে তো জ্যাঠার সঙ্গে আপনি দেখা করতে গিয়েছিলেন কেন ? কেবল কি ঐ কথাটাই তাঁকে জানিয়ে দিতে ?

হ্যাঁ।

হঠাৎ ? হঠাৎ তাঁকে কথাটা জানাবার এমন কি প্রয়োজন ঘটেছিল ? তিনি তো নিশ্চয়ই আপনাকে ডাকেনওনি—

না।

তবে ?

সে কথা আমি বলতে পারব না—

বলতে কোন অসুবিধা আছে ?

মনে করুন তাই—

বেশ, না বলতে চান বলবেন না। আর একটা কথা, আপনি তো জানেন—কেউ বাসবীকে মানে আপনার যমজ বোনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে, তাঁর হত্যাকারী ধরা পড়ুক আপনি কি চান না ?

বাসবীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি ?

যার চাইতে বড় সম্পর্ক আর হতে পারে না—রক্তের সম্পর্ক !

হতে পারে, কিন্তু আপনি কি জানেন না—পরিচয় ও যোগাযোগ না থাকলে মা ও সন্তানের সঙ্গে যে সম্পর্ক তাও মিথ্যে হয়ে যায় ?

না, তা যায় না—যেতে পারে না। আর তা যদি হত তো মা ও সন্তান কথা দুটো আমাদের সমস্ত মানুষের মনের অভিধান থেকে চিরদিনের মতই মুছে যেত। তাছাড়া আমি বিশ্বাস করি, আপনি যা অস্বীকার করতে চাইছেন সেটা আপনার মনের সত্যিকারের কথা নয়, ওটা সামান্য একটা মুখের কথা।

কিরীটীর বলার ভঙ্গীতে ও কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যা লুসিকে কয়েকটা মুহূর্তের জন্য যেন স্তব্ধ করে দেয়। সে নিঃশব্দে মাথা নীচু করে থাকে।

শুনুন, আমি এতক্ষণ আপনাকে বলিনি সত্যিই কেন আপনার কাছে আমি এসেছি—

কিরীটীর কথায় লুসি ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল।

কিরীটী বললে, বাসবী দেবীর হত্যারহস্যের উদ্ঘাটনের ব্যাপারে আমি আপনার সাহায্য চাই।

আমার সাহায্য ?

হ্যাঁ।

কিভাবে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি বুঝতে পারছি না তো। তাকে আমি চিনতাম না—জানতাম না পর্যন্ত, মৃত্যুর পূর্বে ঘটনাচক্রে হঠাৎ একদিন তাকে দেখে কৌতূহলের বশে তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে তার পরিচয়টুকু জেনেছিলাম মাত্র। সেক্ষেত্রে—

তবু যদি কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারে তো একমাত্র আপনিই পারবেন।

বলুন কি সাহায্য চান ?

আপনি রাজী তো, আগে বলুন—

হ্যাঁ।

বেশ, এবারে বলুন বাসবীর বন্ধুদের কাউকে আপনি চিনতেন ?

বন্ধু !

হ্যাঁ, রঞ্জন অভিজিৎ সুনীল সুহাস ও ব্রজেশবাবু—ঐ পাঁচজনের মধ্যে কাউকে আপনি চেনেন ?

না তো—

কিন্তু ওঁদের মধ্যে একজন আপনাকে চেনেন !

আমাকে চেনেন ? কি করে ? কে ?

সুহাসবাবু।

না, ওঁর সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই।

কিন্তু সুহাসবাবু যে বলছিলেন—

লুসি কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল, কি বলছিলেন ?

তিনি আপনাকে চেনেন—

কখনো না।

হঠাৎ কিরীটী তার পকেট থেকে একটা গ্রুপ ফটো বের করল। ফটোর মধ্যে বাসবী। তাকে ঘিরে পাঁচ বন্ধু।

কিরীটী ফটোটা লুসির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, দেখুন তো ফটোটা !

লুসি ফটোটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। তারপর একটু পরে মুখ তুলল—

ঐ ফটোর মধ্যে আপনার যমজ বোন বাসবী ছাড়া আর কাউকে চিনতে পারছেন ? ভাল করে দেখে বলুন !

না, একমাত্র বাসবীকে ছাড়া কাউকেই চিনতে পারছি না।

কিরীটী ফটোটা এবারে নিজের হাতে নিয়ে ফটোর মধ্যে সুহাসকে দেখিয়ে বললে, এঁকে ?

না।

উনি কখনো আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসেননি ?

না, না।

কিন্তু উনি বলেছেন—

যাই বলে থাকুন, মিথ্যে বলেছেন।

কিরীটী ফটোটা আবার তার জামার পকেটে রেখে মৃদু হেসে বললে, আমার যা জানার ছিল জানা হয়েছে। এবারে উঠব। তবে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন কথা দিয়েছেন একটু আগে, কথাটা মনে থাকবে তো?

থাকবে।

তাহলে আজ চলি। শীগগিরী হয়ত আবার আমাদের দেখা হবে।

লুসি কোন জবাব দিল না কিরীটীর কথায়, চুপ করে রইল।

কিরীটী ও সুব্রত ঘর থেকে বের হয়ে এল।

গলিপথ অতিক্রম করে ওরা দুজনে হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় এসে পড়ল।

এতক্ষণ সুব্রত একটা কথাও বলেনি। কিরীটীর পাশে বসে নিঃশব্দে ওর ও লুসির কথাবার্তা শুনছিল।

রবিবার হলেও রাস্তায় মানুষের বেশ ভিড়। তবে সকলের চলাফেরাতেই যেন একটা ঢিলেঢালা ভাব, একটা ছুটির শিথিলতা।

কিরীটী!

উঁ!

আমার কিন্তু মনে হল, লুসি সত্যি কথা বলেনি—

শুধু তাই নয় সুব্রত, লুসি আরও অনেক কথা জানে যা বলল না!

সুহাসকে ও চেনে!

সেই কথাটাই ভাবছি সুব্রত, সুহাসের কথাটা ও চেপে গেল কেন? তাছাড়া আরও একটা কথা যেটা ও বার বার জোর দিয়ে বলবার চেষ্টা করছিল, আমার অনুমান সেটাও মিথ্যা।

কি বল্ তো? বিরাজের সম্পত্তির ব্যাপারটা?

হ্যাঁ, বিরাজের সম্পত্তির ওপর পুরোপুরি লোভ আছে। মুখে যাই বলুক, ওর দুটো চোখ সম্পূর্ণ অন্য কথা বলেছে—আর সেই কারণেই সেরাত্রে ও বিরাজের ওখানে গিয়েছিল।

তোর তাই মনে হয়!

হ্যাঁ। আর আমার শেষ রহস্যের জটটুকুও খুলে গিয়েছে।

তুই কি তবে—

হ্যাঁ রে সুব্রত, বাসবীর মৃত্যুর মোটিভটা আমার কাছে এতদিনে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। চল্ আর দেরি নয়, একটা ট্যাক্সি ধর্—বাড়িতে গিয়ে রথীনকে একটা ফোন করতে হবে।

আর একটু এগোতেই একটা খালি ট্যাক্সি পাওয়া গেল। সুব্রত হাত দেখিয়ে ট্যাক্সিটা থামিয়ে দুজনে উঠে বসল ট্যাক্সিতে।

কিধার যায়গা বাবুজী?

টালিগঞ্জ চল।

ট্যাক্সিতে দুজনের মধ্যে আর একটা কথাও হল না। কিরীটী একটা চুরোট ধরিয়ে গাড়ির জানলাপথে তাকিয়ে নিঃশব্দে ধূমপান করছিল। সুব্রতও সমস্ত ব্যাপারটা আর একবার নিজের মনের মধ্যে গুছিয়ে আগাগোড়া নতুন করে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করছিল।

গৃহে পৌঁছেই কিরীটী ফোনের কাছে গিয়ে রথীনকে ডায়েল করল কিন্তু রথীনকে থানায় পাওয়া গেল না, সে কি একটা জরুরী কাজে বেরিয়েছে, কখন ফিরবে ঠিক নেই। সেকেণ্ড অফিসার বললে।

কিরীটী তখন ব্রজেশকে ফোন করল।

ব্রজেশ বাসাতেই ছিল, তার গলার সাড়া পাওয়া গেল।

ব্রজেশবাবু, আমি কিরীটী রায়। শুনুন, পরশুদিন তো ছুটি আছে—ঐ দিন আমি আপনাদের সঙ্গে একবার মিট করতে চাই, ব্যবস্থা করতে পারবেন একটা?

ব্রজেশ জবাব দেয়, কেন পারব না—খুব পারব। কোন কিছুর কিনারা হল?

কিরীটী হেসে জবাব দিল, দেখা হলেই জানতে পারবেন। শুনুন, মিট করব আমরা সকলে রাত ন'টার পর।

কিন্তু কোথায়?

বিরাজ সান্যালের গৃহে।

কিন্তু সেখানে—

সব ব্যবস্থা রথীন করবে। আচ্ছা তাহলে সেই কথাই রইল।

কিরীটী ফোন রেখে দিল।

তুই বাড়ি ফিরবি নাকি রে সুব্রত?

কেন বল্ তো!

বলছিলাম এই রোদে আর বের হয়ে কি করবি, এখানেই স্নান সেরে খেয়েদেয়ে একটা ঘুম দে—কাল তো ভাল ঘুম হয়নি।

সুব্রত হেসে বললে, তারপর?

তারপর সন্ধ্যার শোতে একটা হিন্দী বই দেখতে যাব।

হিন্দী বই!

হ্যাঁ, বেশ থ্রিলিং হয় হিন্দী বইগুলো। প্রেম—সেক্স্—ফাইট—ড্যান্স—loud music—তার সঙ্গে সুন্দর সুন্দর জায়গার মনোরম দৃশ্য। হইহই করে বেশ ঘণ্টা আড়াই-তিন কেটে যায়।

দূর দূর! না আছে কোন গল্প, কোন মাথামুণ্ডু—

নাই বা থাকল! স্থূল অ্যামিউজমেণ্ট প্রচুর থাকে বইগুলোতে। ভাবনা-চিন্তার বালাই নেই—কেবল দেখে যাও। না রে, বেশ লাগে আমার। আমি তো আজকাল বড় একটা বাংলা বই দেখিই না—হয় ইংরাজী, না হয় হিন্দী।

কৃষ্ণা ঐ সময় ঘরে এসে ঢুকল, পশ্চাতে তার জংলী—তার হাতে ট্রেতে দু কাপ কফি।

কিরীটী একটা কাপ ট্রে থেকে তুলে নিতে নিতে বলে, আঃ প্রিয়ে, ঠিক এই কথাটাই অবচেতন মন আমার এই মুহূর্তটিতে ভাবছিল—

কিন্তু কিরীটীর কথা শেষ হল না, নীচের কলিং বেলটা বেজে উঠল।

এ সময় আবার কে এল, দেখ্ তো জংলী!

কৃষ্ণার কথায় জংলী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

একটু পরে জংলীর সঙ্গে ঘরে এসে ঢুকল রথীন সিকদার হাঁপাতে হাঁপাতে।

বৌদি, কফি!

বসুন, আনছি। কৃষ্ণা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

তারপর? মনে হচ্ছে যেন কোন জরুরী খবর সংগ্রহ করেছিস! কিরীটী রথীনের দিকে তাকিয়ে বলে, এই সকালবেলা দেখা হল—আবার ছুটে এসেছিস হন্তদন্ত হয়ে! অবিশ্যি একটু আগে থানায় ফোন করে তোকে না পেয়ে তোর জুনিয়ার সুশীলবাবুকে বলে দিয়েছিলাম তুই এলেই আমাকে ফোনে কনটাক্ট করতে, থানায় ফিরেই বুঝি—

না, থানায় যাইনি—সোজা লালবাজার থেকে আসছি।

ব্যাপার কি?

রেঙ্গুন থেকে রিপোর্ট এসেছে—

কার? বিরাজ সান্যাল সম্পর্কে যে রিপোর্ট সংগ্রহ করতে বলেছিলাম সেই রিপোর্ট?

হ্যাঁ, rather interesting!

কি রকম?

বিরাট কাঠের ব্যবসা ছিল বিরাজের পেগুতে—

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, আর ওর এক বিজনেস পার্টনার ছিল সমীর চৌধুরী—একজন বাঙালী। ঐ লোকটা অবিশ্যি রেঙ্গুনেই born ও brought-up—

আসল কথাটা বল্ তো?

রথীন পকেট থেকে একটা খাম বের করল।

কিরীটী হাত বাড়িয়ে খামটা নিল।

বেশ ভারী খাম।

খামের মধ্যে থেকে কয়েকটা ভাঁজ-করা টাইপ্‌ড্ কাগজ ও একটা পুরনো ফটো বের হল। প্রথমে ফটোটা দেখে, পরে টাইপ-করা কাগজগুলো বের করে চোখের সামনে মেলে ধরল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই পড়তে শুরু করে দেয়।

অনেক টাকার ব্যবসা দুজনের ছিল। সান্যাল অ্যান্ড চৌধুরী টিম্বার কোম্পানি। বছর কুড়ি আগে হঠাৎ সমীর চৌধুরীর একটা মোটর-দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। পুলিসের ধারণা ব্যাপারটা ঠিক একটা দুর্ঘটনা নয়। সেই মোটরেই বিরাজ সান্যালও ছিল, সেও ঐ দুর্ঘটনায় আহত হয়—একটা পায়ে তার আঘাত লাগে। তার নিজের গৃহেই ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে দেড় মাসের উপরে তাকে থাকতে হয়।

অবশেষে দেখা গেল সেই আহত পা'টা আর সারল না—পা'টা চিরজন্মের মত পঙ্গু হয়ে গেল। পুলিস দুর্ঘটনার ব্যাপারটা অনুসন্ধান করতে করতে জানতে পারে সমীর চৌধুরী ও বিরাজ সান্যাল সম্পর্কে কয়েকটা কথা। ঐ দুর্ঘটনার কিছুদিন আগে থাকতেই দুই বন্ধুর মধ্যে মন-কষাকষি চলছিল কোন এক নারীকে নিয়ে। সেই নারীটির কিন্তু পুলিস কোন সন্ধানই করতে পারেনি। কে সে, কি তার পরিচয় এবং সে কোথায় গেল? তারপরই হঠাৎ একদিন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এবং যুদ্ধ বাধায় সমস্ত ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল।

সেই সময়ই বিরাজ সান্যাল তার ব্যবসা ও রেঙ্গুনের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে রেঙ্গুন থেকে চলে আসে। তারপর থেকে রেঙ্গুন পুলিস বিরাজ সান্যালের আর কোন সংবাদ পায়নি। রেঙ্গুন পুলিসের মোটামুটি সংবাদ হচ্ছে ঐ।

রিপোর্ট'টা পড়া হয়ে গেলে কিরীটী ফটোটা নিজের কাছে রেখে টাইপ-করা-কাগজগুলো রথীনের হাতে ফিরিয়ে দিল।

পড়লি? রথীন প্রশ্ন করে।

হুঁ। কিরীটী বললে।

কি মনে হচ্ছে এখন বিরাজ সান্যাল সম্পর্কে? একের নম্বরের ঘুঘু, তাই না!

॥ একুশ ॥

কিরীটী কোন জবাব দিল না।

রথীন আবার বলে, আমার কি মনে হচ্ছে জানিস?

কি? কিরীটী রথীনের মুখের দিকে তাকাল।

বিরাজ সান্যাল সম্পর্কে আমাদের বোধ হয় আরও খোঁজ নেওয়া দরকার।

তার আর প্রয়োজন হবে না রথীন। মৃদু কণ্ঠে কিরীটী বললে।

ওকথা কেন বলছিস?

কারণ এবারে আমরা আমাদের অনুমানের ওপরে নির্ভর করেই এগুতে পারব। শোন্ যে কারণে তোকে আমি থানায় ফোন করেছিলাম, কাল বাদে পরশু আমি সকলের সঙ্গে একবার সান্যালের গৃহে রাত নটায় মিট করতে চাই। বিরাজকে পরশু সকালে বা দুপুরে কথাটা বলে সব ব্যবস্থা পাকাপাকি করে রাখবি।

সে তো আজই করতে পারি!

না। আজ নয়, কালও নয়—পরশুর আগে নয়। পরশু সকালে বা দুপুরে যে কোন সময়—

ওরা ছাড়া আর কে কে থাকবে?

সবাই—ওরা পাঁচ বন্ধু, বিরাজ সান্যাল, তুই, আমি, সুব্রত আর প্লেন ড্রেসে দুজন গোয়েন্দা পুলিস—তারা একেবারে প্রস্তুত হয়েই যাবে।

তবে কি পরশু—

কি ?

অপরাধীকে তুই সনাক্ত করবি ?

সনাক্ত করা আমার হয়ে গিয়েছে, কেবল সকলের সামনে তার মুখোশটা খুলে দিতে চাই।

অপরাধী কে, তুই জানতে পেরেছিস ? রথীনের কণ্ঠস্বরে একটা স্পষ্ট ব্যগ্রতা প্রকাশ পায়। সে যেন তার কৌতূহলকে আর চেপে রাখতে পারছে না।

কিরীটী শান্তকণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয়, পেরেছি।

রথীন আর কোন প্রশ্ন করে না। যদিচ অপরাধীর নামটা জানার জন্য সে ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল, তবু সেটা মুখে প্রকাশ করে না, কারণ সে ভাল করেই জানতো ঐ মুহূর্তে কিরীটী যতটুকু বলেছে নিজে থেকে তার বেশী একটি শব্দও আর সে উচ্চারণ করবে না।

তাহলে তুই যা রথীন, যেমন বললাম সব ব্যবস্থা যেন ঠিক থাকে। আবার আমাদের দেখা হবে পরশু রাত্রে বিরাজের ঝাউতলার গৃহে।

রথীনের উঠবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু উঠতেই হল বেচারীকে। মনের মধ্যে তখন তার নানা সম্ভব অসম্ভব প্রশ্ন তোলপাড় করছে।

রথীন উঠে পড়ল এবং শিথিল পদবিক্ষেপে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। তার ভারী পায়ের শব্দ ক্রমশঃ সিঁড়িতে মিলিয়ে গেল।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর সুব্রত একটা লম্বা দিবানিদ্রা দিল আর কিরীটী ব্যস্ত থাকল তার তাসের বাণ্ডিল নিয়ে পেসেন্স খেলায়। সুব্রত জানে ওই পেসেন্স খেলাটা কিরীটীর চিন্তার একটা খোরাক মাত্র। ঠিক সোয়া পাঁচটায় সুব্রতর নিদ্রা-ভঙ্গ হল। শীতের বেলা তখন ফুরিয়ে গিয়েছে, ম্লান আলোয় চারিদিক ঝাপসা হয়ে আসছে।

কি রে, ঘুম হল ? কিরীটী সহাস্যে প্রশ্ন করে সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে।

হ্যাঁ, খুব ঘুমিয়েছি।

কিরীটী কৃষ্ণাকে ডেকে চায়ের কথা বলে তাসের প্যাকেটটা গুছিয়ে রেখে হাত-মুখ ধোবার জন্য বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

একটু পরে চা-পান করতে করতেই সুব্রত প্রশ্ন করে, কি রে, সত্যি-সত্যিই সিনেমায় যাবি নাকি ?

বাঃ, যাব না মানে ! রবিবারের সন্ধ্যাটা তাহলে মাঠে মারা যাবে নাকি ?

কিন্তু টিকিট পাওয়া যাবে ? রবিবারের সন্ধ্যার শো—শুক্রবারেই হয়তো সব হাউস ফুল হয়ে গিয়েছে !

দীপচাঁদের হাউসে বলা আছে, তুই বোস্, আমি জামাটা বদলে আসি।

সন্ধ্যার শো ভাঙতে ভাঙতে রাত নটা হয়ে গেল। হল থেকে বের হয়ে গাড়িতে

উঠে কিরীটী সোফারকে অন্য একটা ঠিকানা বললে যাবার জন্য।

বাড়ি যাবি না?

না, রঞ্জনবাবুর ওখানে ভাবছি একবার ঘুরে যাব।

সেখানে কেন?

তাঁর সেতার বাজনা শুনব। কিরীটী মৃদু গলায় বললে।

এই রাত্রে?

এই তো সেতার শুনবার প্রকৃষ্ট সময়। শুনেছি ভদ্রলোক নাকি চমৎকার বাজান। আর বাসবী তাঁর সেতার বাজনা শুনতে খুব ভালবাসত—

সুব্রত আর উচ্চবাচ্য করে না। সে বুঝতে পেরেছিল, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়েই কিরীটী ঐ রাত্রে রঞ্জনের গৃহে চলেছে। এবং সেটা কি হতে পারে মনে মনে সেটাই চিন্তা করতে থাকে সুব্রত।

সুনীলকে লেখা রঞ্জনের চিঠিটা পড়েছে সুব্রত, যে চিঠিতে সে সুনীলকে বাসবীর আকস্মিক মৃত্যুসংবাদটা দিয়েছিল। চিঠিটা আগাগোড়া আর একবার মনে মনে ভাববার চেষ্টা করে সুব্রত।

ঐ চিঠিটা কি রঞ্জনের তার বন্ধু সুনীলের কাছে একটা সত্যিই সাফাই মাত্র! রঞ্জনের অবিশ্যি খুব strong motive ছিল—সে ভালবেসেছিল বাসবীকে, মনে-প্রাণে চেয়েছিল সে বাসবীকে কিন্তু সব ভেস্তে দিল ব্রজেশ। ব্রজেশ যেন হঠাৎ ছোঁ মেরে তার কাছ থেকে বাসবীকে ছিনিয়ে নিয়েছিল।

বাসবীকে না পাওয়ার সেই আক্রোশেই হয়ত রঞ্জন সেরাত্রে ঠিক বিবাহের দু-তিন দিন আগে বাসবীকে গিয়ে হত্যা করেছিল—

হঠাৎ কিরীটী বলে, আমি জানি সুব্রত, এই মুহূর্তে তুই কি ভাবছিস!

কি ভাবছি?

সুনীলবাবুকে লেখা রঞ্জনবাবুর চিঠিটা। হয়ত স্রেফ একটা সাফাই গাওয়া, তাই নয় কি?

ঠিক তাই ভাবছিলাম রে!

আমি কিন্তু সেজন্য যাচ্ছি না রঞ্জনবাবুর ওখানে—

তবে কি জন্য যাচ্ছিস?

রঞ্জনবাবু তাঁর চিঠিতে সব কথা লেখেননি, বাসবীর কথা কিছু সে চিঠিটার মধ্যে অনুক্ত থেকে গিয়েছে। সেটুকু যদি কৌশলে তাঁর কাছ থেকে বের করতে পারি সেই জন্য—কিন্তু আর speculation নয়, রঞ্জনবাবুর বাড়ির কাছে এসে পড়েছি। তার পরই সর্দারজীকে নির্দেশ দিল, সর্দারজী, গাড়ি ইধারই রোখো।

সর্দারজী গাড়ি থামিয়ে দিল।

দুজনে গাড়ি থেকে নেমে পদব্রজে অগ্রসর হল রঞ্জনের গৃহের দিকে। কলিং বেল টিপতেই ভৃত্য ভোলা এসে দরজা খুলে দিল।

কিরীটীই প্রশ্ন করে, রঞ্জনবাবু বাড়িতে আছেন?

আজ্ঞে না। ভোলা বললে।

বাড়িতে নেই ?

না।

ফিরবেন না ?

ফিরবেন বইকি—

কখন বের হয়েছেন ? কোথায় গিয়েছেন জান কিছু ?

জানি না, তবে বাসবী দিদিমণি—

কে ? কার কথা বলছ ?

আজ্ঞে বাসবী দিদিমণি ঘণ্টা দুই আগে এসেছিলেন, তাঁরই সঙ্গে বের হয়ে গেলেন। কিছু বললেন না কখন আসবেন।

কিরীটী চমকটা ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। সে বুঝতে পেরেছিল, বেচারী ভোলা বাসবীর মৃত্যুর সংবাদটা নিশ্চয়ই জানে না এখনো—নচেৎ অমন সহজ বিশ্বাস্য গলায় কথাটা ব্যক্ত করত না কিরীটীর কাছে। এবং বাসবীর যে এক যমজ বোন আছে সেটা ওর তো জানবার কথাই নয়—

কতক্ষণ হল বের হয়েছেন বাসবী দিদিমণির সঙ্গে ? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

তা ঘণ্টা দুই হবে—

মধ্যে মধ্যে বাবু দিদিমণি এলেই বেড়াতে যেতেন দুজনে, তাই না ? কিরীটী আবার শুধায়।

এতক্ষণে ভোলার মনে বোধ হয় কেমন একটু সন্দেহ জাগে। সে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনারা কে—কোথা থেকে আসছেন ? আপনাদের তো কখনো আগে দেখিনি—চিনতেও পারছি না !

না, তুমি আমাদের দেখনি—আমরা বাবুর ছোটবেলার বন্ধু।

ছোটবেলার বন্ধু !

হ্যাঁ, অনেকদিন বাংলাদেশের বাইরে ছিলাম—আজই ফিরেছি কিনা, আবার কাল সকালের প্লেনেই চলে যেতে হবে।

চলে যাবেন ?

হ্যাঁ।

কোথায় ?

সে অনেক দূর হে, আফ্রিকায় আমরা চাকরি করি। দেখা হল না রঞ্জনের সঙ্গে, ভেবেছিলাম অনেকদিন পরে দেখা হবে—

অপেক্ষা করুন না। এখুনি না এলেও রাত এগারোটার মধ্যে নিশ্চয়ই এসে পড়বেন।

না, বসার সময় নেই। তোমার দিদিমণির ঠিকানাটা জান ?

আজ্ঞে না। আগে মধ্যে মধ্যে আসতেন, তবে ইদানীং মাস দুই বড় একটা আসতেন না।

তোমার বাবুর সঙ্গে বুঝি দিদিমণির বিয়ে হবে ?

সেইরকমই তো মনে হয়, দুজনার খুব ভাব দেখতে পাই।

আচ্ছা আজ তাহলে চলি—

বাবু আসলে কি বলব ?

বলো রথীনবাবু এসেছিলেন।

আচ্ছা, বলব।

কিরীটী আর সুব্রত বের হয়ে এল।

গাড়িতে উঠে কিরীটী বললে, সর্দারজী, একবার কালীঘাট হয়ে যাব।

গাড়ি চলতে শুরু করে।

কিরীটী চুপচাপ বসে একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করে ধূমপান করতে থাকে। ব্যাপারটা সুব্রত বুঝতে পেরেছিল, কিরীটী লুসির ওখানে চলেছে। আর কেন যে চলেছে তাও তার অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

লুসি এসেছিল রঞ্জনের গৃহে। কিন্তু কেন ? তার চাইতেও বড় কথা, রঞ্জনের সঙ্গে লুসির পরিচয় আছে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সেটা কতদিনের ? আর কি ধরনেরই বা পরিচয় ?

হঠাৎ সুব্রতর চমক ভাঙে কিরীটীর কথায়। কিরীটী ড্রাইভারকে পার্ক স্ট্রীট থানায় যেতে বললে প্রথমে।

ওখানে কেন ? রথীনকে সঙ্গে নিবি মনে হচ্ছে—

হ্যাঁ। রথীনকে যদি হঠাৎ প্রয়োজন হয় ?

রথীন থানায়ই ছিল।

একটু আগে সে ফিরেছে। কিরীটী ও সুব্রতকে ঐ সময় থানায় উদিত হতে দেখে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার, এত রাত্রে তোরা ?

কেন রে, রাত কি খুব বেশী হয়েছে ? কিরীটী মৃদু হেসে বলে।

খুব কমও নয়—সাড়ে দশটা প্রায় ! শীতের রাত—

এই তো সময় অভিসারের। পুনরায় কিরীটী স্মিত কণ্ঠে বলে, নে চল্—এখুনি বেরুতে হবে !

কোথায় ?

শ্রীমতী লুসি দেবীর গৃহে।

সে আবার কোথা থেকে এল ?

বাসবীর যমজ বোন—

কি—কার যমজ বোন বললি ?

বাসবীর যমজ বোন—

তার আবার এক যমজ বোন আছে নাকি ?

হ্যাঁ, অবিকল একে যেন অন্যের প্রতিচ্ছবি। নে, আর দেরি করিস না—সঙ্গে দুজন অস্ত্রধারী পুলিসও নে।

কেন রে ? তাকে অ্যারেস্ট করবি নাকি ?

প্রয়োজন হলে করবি ! বলতে বলতে কিরীটী এগিয়ে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে ফোনটা তুলে নেয়।

সুব্রত, তোরা যা—আমার গাড়িতে গিয়ে বোস্, কৃষ্ণাকে একটা ফোন করে আমি আসছি।

সুব্রতকে নিয়ে রথীন পাশের ঘরে গিয়ে ঢোকে, ছোটবাবুকে দুজন আর্মড পুলিসের কথা বলে।

কিরীটী কিন্তু ফোন করে কৃষ্ণাকে নয়—লালবাজারে!

ফোন সেরে ও যখন বের হয়ে এল, ওরা দুজনে সুব্রত ও রথীন গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে।

সুব্রত ইতিমধ্যে রথীনের প্রশ্নোত্তরে সংক্ষেপে তাকে লুসি ও জুনিফার সম্পর্কে সমস্ত সংবাদ দিচ্ছিল।

তিনজনে গাড়িতে উঠে বসে। গাড়ি চলতে শুরু করে।

গাড়িতেই সুব্রত বাকিটা শেষ করল।

শীতের রাত। এর মধ্যেই শহরে লোকচলাচল কমে এসেছিল। দোকানপাটও সব বন্ধ। অবিশ্যি যানবাহনের সাড়া তখনো যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছিলো।

রথীন সুব্রতর কাহিনী শেষ হলে বলে, এ যে রীতিমত এক জটিল নাটক বলে মনে হচ্ছে সুব্রত!

রথীনের কথায় কিরীটী জবাব দেয়, সে বলে ওঠে, হত্যা যেখানে বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ও যথেষ্ট পূর্ব-পরিকল্পিত, রহস্য সেখানে জটিলই হয়—নাটকে অনেক জট থাকে।

তা যেন হল, কিন্তু ঐ রহস্য-নাটকের মেঘনাদটি কে?

তিনি এবারে মেঘের আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশে বাধ্য হবেন। কিরীটী মৃদু হেসে বললে।

তা যেন হল, কিন্তু—

সুব্রতর মুখে তো সব শুনলি? তোর কি মনে হয়? কিরীটী প্রশ্ন করে।

আমার সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে সত্যি বলতে কি কিরীটী—

কেন?

বিরাজ সান্যাল—শ্যামা দাসী—জুনিফার—পাঁচ বন্ধু ও সর্বশেষে সেই সাহেবী পোশাক পরা রহস্যময় ব্যক্তির সঙ্গে মৃতুর কয়েকদিন পূর্বে বাসবীর সাক্ষাৎ—

সব এক সূত্রে গাঁথা বন্ধু!

এক সূত্রে গাঁথা?

হ্যাঁ। এবং সমস্ত সূত্রগুলিই একের সঙ্গে অন্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য অচ্ছেদ্য। নর-নারীর অন্যতম প্রবল যে দুটি রিপু—লোভ ও ঈর্ষা, বর্তমানে সেই দুটিই বাসবী-হত্যা-নাটকের মোটিভ হয়েছিল এবং পরে শ্যামার হত্যা ঘটিয়েছিল—

কিন্তু কার—কার লোভ ও ঈর্ষা?

এখনো বুঝতে পারছিস না! মনকে প্রশ্ন কর্, জবাব পাবি ঠিকই।

না, বুঝতে পারছি না। সহজ গলায় জবাব দেয় রথীন।

ঐ জন্যই তোর প্রমোশন হল না রথীন। তোর মত সহজ সরল লোক পুলিসের চাকরিতে most misfit—অনুপযুক্ত।

স্বীকার করছি। এখন একটু আলো দেখাবি!

অন্ধকে আলো দেখালেও সে দেখতে পায় না—

তবু দেখা না হয়!

তবে শোন্, আরো কিছু বলি—বিরাজ লোকটা যেমন দুশ্চরিত্রের তেমনি ভীতু প্রকৃতির, তাই সে তার ক্ষমতার ব্যবহার করতে পারেনি ঠিক সময়ে, যার ফলে অঘটন ঘটেছে। নচেৎ সে যদি শক্ত হাতে লাগাম কষতে পারত, অন্ততঃ তার চোখের সামনে বেচারী বাসবীকে অমন নিষ্ঠুরভাবে নিহত হতে হত না!

কিন্তু শ্যামা—

শ্যামাকেও বিরাজ হত্যা করেনি—

তবে?

কি, তবে? বুঝতে পেরেছি কি তুই বলতে চাস রথীন—হ্যাঁ, বিরাজ যদিও শ্যামার অন্তঃসত্ত্বা হবার জন্য দায়ী, তাহলেও সে তাকে হত্যা করেনি। কারণ—

কি?

আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো তখনো সে জানতে পারেনি শ্যামা অন্তঃসত্ত্বা! অর্থাৎ শ্যামা তখনো তাকে জানায়নি ব্যাপারটা বা তার নিজেরও হয়তো সন্দেহটা পুরোপুরি মনে জাগেনি যে সে মা হতে চলেছে। কিংবা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ইচ্ছা করে রঙের তাস হিসাবে সংবাদটা হতে রেখেছিল—

তবে শ্যামাকে নিহত হতে হল কেন?

কারণ একমাত্র সে-ই সেরাত্রে বাসবীর হত্যাকারীকে দেখেছিল ও তাকে চিনতে পেরেছিল। সহজভাবে বিচার করতে গেলে, তারপর আর তার বেঁচে থাকা সম্ভব নয়—অন্ততঃ হত্যাকারী তা হতে দিতে পারে না।

হঠাৎ ঐ সময় রথীন বলে ওঠে, দ্বিজেনটা একটা idiot, গাড়োল—

না, সে idiot নয়।

আলবৎ idiot—

সে সেরাত্রে ভুল করেছিল—তুই হলেও সেই ভুলই করতিস রথীন!

ভুল করতাম?

হ্যাঁ। যাক সেকথা, আমরা বোধ হয় এসে গিয়েছি। সর্দারজী, হিঁয়াই রোখো গাড়ি, হামলোগ আভি পায়দলসে যায়গা।

।। বাইশ ।।

গাড়ি থামলো।

একে একে সকলেই গাড়ি থেকে নামল।

রাত প্রায় তখন পৌনে এগারোটা। শীতের কনকনে ঠাণ্ডা রাত। গলিপথটা প্রায় নির্জন বললেও চলে। নির্জন গলিপথ ধরে ওরা কটি প্রাণী এগিয়ে চলে। ওদের পায়ের জুতোর শব্দ কেবল শোনা যায়।

বাড়িটার কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে। খোলা জানালাপথে আলোকিত কক্ষটা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নীচের দরজাটা বন্ধ ছিল।

আমর্ড পুলিস দুজনকে বাড়ির নীচে সতর্ক থাকতে বলে কিরীটী এগিয়ে গিয়ে দরজার কলিং বেলের বোতামটা টেপে।

ক্‌-ক্‌ একটা আওয়াজ ভিতরে শোনা যায় অস্পষ্ট।

বার দুই বেল টেপবার পরই দরজাটা খুলে গেল। দরজা খুলে দিতে এসেছিল লুসিই।

কে?

আমি কিরীটী।

সঙ্গে সঙ্গে আলোটা জ্বলে ওঠে। এবং সামনেই লুসি কিরীটী রথীন ও সুব্রতকে দেখে হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। একেবারে যেন বোবা!

লুসি দেবী, আমরা একটু ভিতরে যাব যে? কিরীটীই বলে।

ভিতরে! কেমন যেন থমকে যাওয়া গলায় ক্ষীণ স্বরে প্রশ্নটা করে লুসি।

হ্যাঁ।

কিন্তু—, লুসি আবারও যেন কি বলবার চেষ্টা করে।

চলুন উপরে। আপনার ও সুহাসবাবুর সঙ্গে আমাদের কিছু প্রয়োজনীয় কথা আছে।

সুহাস?

হ্যাঁ, সুহাসবাবু তো উপরেই আছেন আপনার ঘরে!

সুহাসবাবু কে?

চেনেন না সুহাসবাবু কে! লুসি দেবী, সত্য আর গরল দুটো জিনিস কখনো চেপে রাখা যায় না—প্রকাশ হয়ে পড়েই।

কি বলছেন আপনি মিঃ রায়!

ঠিকই বলছি, চলুন।

কথাটা বলে কিরীটী আর অপেক্ষা না করে একপ্রকার লুসির পাশ কাটিয়েই এগিয়ে গিয়ে সিঁড়িতে পা দেয়, আয় রথীন, সুব্রত! কিরীটী ওদের ডাকে।

সুব্রত ও রথীনও ওকে অনুসরণ করে—লুসিও ওদের পিছনে পিছনে এগোয়।

ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল। ওরা তিনজনে হুড়মুড় করে একপ্রকার ঘরের

মধ্যে ঢুকে পড়ে।

সত্যিই সুহাস ঘরের মধ্যে একটা চেয়ারের উপর বসেছিল। পা ছড়িয়ে আরাম করে সিগারেট টানছিল। আচমকা ওরা তিনজন হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকতেই তড়াক করে যেন লাফিয়ে ওঠে সুহাস। হাত থেকে সিগারেটটা খসে পড়ে মেঝেতে।

আরে লাফিয়ে উঠলেন কেন সুহাসবাবু! বসুন বসুন। কিরীটী বলে।

সুহাস যেন বিস্মিত বিমূঢ় পাথর।

লুসিও ততক্ষণে ঘরে ঢুকেছে। কিরীটী লুসির দিকে তাকিয়ে একবার মৃদু হাসে মাত্র।

কিন্তু সুহাসের বিমূঢ়তা ও স্তব্ধতা বুঝি মুহূর্তের জন্যেই। পরক্ষণেই বিস্ময়বিমূঢ় সুহাসের কণ্ঠ হতে একটিমাত্র শব্দই নির্গত হয়, আ – পনি!

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, বড় অসময়ে এসে পড়েছি এখানে সুহাসবাবু, তাই না? যদিও কথা ছিল আগামী পরশু সবাই একত্রে মিলিত হব বিরাজবাবুর গৃহে—এখন বুঝতে পারছেন বোধ হয় সেরকম ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না, ওটা কেবল আপনাদের একটু ধোঁকা দেবার জন্যই বলেছিলাম। কিন্তু দাঁড়িয়ে কেন, বসুন! আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে অনেক কথা আছে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হবে না, বসুন বসুন!

সুহাস কিন্তু বসে না, যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনিই দাঁড়িয়ে থাকে। মেঝেতে সুহাসের হাত থেকে খসে পড়া ক্ষণপূর্বে সিগারেটটা তখনো জ্বলছিল। কিরীটী এগিয়ে গিয়ে সেটা পায়ের জুতো দিয়ে মাড়িয়ে নিভিয়ে দিল।

তারপর লুসি দেবী, আজকের মতই সেদিনও তাহলে মিথ্যাই বলেছিলেন! সুহাসবাবু আছেন, অথচ বললেন নেই—চেনেন, অথচ বলেছিলেন আপনি চেনেন না! কিরীটী বললে।

লুসি কোন জবাব দেয় না। সে যেন বোবা।

কিরীটী আবার বলে, কিন্তু আপনার মত একটি চতুর মেয়ে এত বড় ভুলটা কি করে করলেন, তাই ভাবছি মিস সান্যাল!

লুসি নিঃশব্দে তাকালো কিরীটীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে যেন।

সত্যি কথা বলতে কি, আমার যদিও খটকা লেগেছিল ঐখানেই—কিন্তু আপনার তো ভুল করার কথা নয়। তবে ভুলটা হল কেন আপনার?

ভুল! কেমন যেন জড়িত স্বরে উচ্চারিত হল কথাটা এবার লুসির কণ্ঠ হতে।

হ্যাঁ, ভুল। সুহাসবাবুর সামনেই বলছি, উনি আপনাকে কোনদিনই ভালবাসেননি। সবটুকুই পুরোপুরি তাঁর নিজের স্বার্থে, একটা ভালবাসার অভিনয় মাত্র তাঁর। জিজ্ঞাসা করুন, নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারবেন না সুহাসবাবু!

অভিনয়? অর্ধস্ফুট কণ্ঠে শব্দটা উচ্চারণ করে আবার লুসি।

অভিনয় বৈকি। বাসবী দেবীর প্রতিও যেমন তাঁর কোনদিনই কোন ভালবাসা জন্মায় নি তেমনি আপনার প্রতিও ছিল না।

বাইরের সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা গেল।

বোধ হয় ব্রজেশবাবু আর সুনীলবাবু এলেন, দেখ্ তো রথীন !

রথীনকে আর এগিয়ে গিয়ে দেখতে হল না, সত্যি-সত্যিই ব্রজেশ ও সুনীল ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

কি ব্যাপার মিঃ রায়, ফোন করে এত রাত্রে এখানে—কিন্তু ব্রজেশ কথাটা শেষ করে না, ঘরের মধ্যে সুহাস ও লুসিকে দেখে থমকে যায়। লুসির দিকে তাকিয়ে থাকে কেমন যেন বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে।

খুব আশ্চর্য হয়েছেন ব্রজেশবাবু, তাই না? উনি লুসি দেবী—বাসবী দেবীর যমজ বোন !

বাসবীর যমজ বোন !

হ্যাঁ।

বাসবীর এক যমজ বোন ছিল নাকি? ব্রজেশের কণ্ঠে তখনো বিস্ময়।

ছিল।

আশ্চর্য ! অথচ বাসবী—

তিনি জানতেন না। কিরীটী বললে।

জানত না?

না।

সুনীল চুপ করে থাকে। সে কোন সাড়া দেয় না।

কিন্তু আপনারা চার বন্ধু না জানলেও, উনি সুহাসবাবু জানতেন বা জানতে পেরেছিলেন—

সুনীল বলে, সুহাস জানত?

হ্যাঁ।

সুহাস, তুই জানতিস? ব্রজেশ প্রশ্ন করে।

সুহাস নির্বাক। কোন জবাবই দেয় না।

শুধু জানতেনই না, ওঁর সঙ্গে বিশেষ পরিচিতও ছিলেন।

সে কি ! সুনীলের কণ্ঠে বিস্ময়।

সে-সব কথা পরে হবে—কিরীটী বলে, এখন সুহাসবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন, আপনাদের বন্ধু রঞ্জনবাবু কোথায়?

রঞ্জন ! কথাটা একই সঙ্গে ব্রজেশ ও সুনীলের কণ্ঠ হতে নির্গত হয়।

হ্যাঁ, সন্ধ্যারাত্রে ঐ লুসি দেবীই সম্ভবত সুহাসবাবুরই পরামর্শে তাঁর বাড়ি থেকে তাকে ডেকে এনেছেন। জিজ্ঞাসা করুন, কোথায় তিনি? তাঁকেও কি বাসবী দেবী ও শ্যামার মতই পৃথিবী থেকে চিরদিনের মতই সরে যেতে হয়েছে?

সুহাস—

ব্রজেশকে থামিয়ে দিয়ে এতক্ষণে সুহাস বলে ওঠে, কি যা-তা সব বলছেন মিঃ রায়?

যা তা যে বলছি না—এখুনিই হয়ত তা প্রমাণিত হবে। লালবাজারে ফোন

করে এসেছি আমি এখানে আসার আগেই, দমদমায় আপনার বাগানবাড়িটা সার্চ করতে। জীবিত বা মৃত—হয়তো একটুক্ষণের মধ্যেই তারও সংবাদ পাওয়া যাবে।

সুহাস, এসব কি বলছেন মিঃ রায়? সুনীল বলে।

কিন্তু সুহাসের কণ্ঠ থেকে এবারে আর কোন প্রতিবাদ শোনা যায় না। সে কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সুহাসবাবু! কিরীটী শান্ত গলায় বলে, don't try to play any more of your dirty tricks—তাতে কোন ফল হবে না। এ বাড়ি এই মুহূর্তে পুলিস ঘিরে ফেলেছে। আমরা প্রস্তুত হয়েই এসেছি। সমস্ত প্রমাণও আমাদের হাতে।

সুনীল ঐ সময় বলে, আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না মিঃ রায়—

এখনও বুঝতে পারছেন না?

না।

তাহলে একটু অতীত ইতিহাস বলি, সুহাসবাবুর বাবা বর্মায় কাঠের ব্যবসা করতেন—

সুনীল বলে, সে তো ওর মুখেই শুনেছিলাম। ওর যখন বছর চোদ্দ বয়স, ওর বাবা একটা মোটর-অ্যাক্সিডেণ্টে মারা যান।

ঠিক মারা যাননি—

তবে?

He was killed!

সে কি?

হ্যাঁ, লুসি ও বাসবী দেবীর জ্যাঠামশাই বিরাজ সান্যাল তাঁকে সম্ভবত চলন্ত গাড়ি থেকে অতর্কিতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন। তাঁর তাতেই মৃত্যু হয়।

বলেন কি!

হ্যাঁ সুনীল, তাই। এতক্ষণে সুহাস কথা বলে, it's a fact—

তুই জানতিস সুহাস সেকথা?

জানতাম।

আর সেই কারণেই সুহাসবাবু ভীতু দুর্বলচিত্ত বিরাজ সান্যালকে ব্ল্যাকমেইল করতে সাহস পেয়েছিলেন। কিরীটী বলে এবারে।

ব্ল্যাকমেইল!

হ্যাঁ, সেই কারণেই হয়ত সুহাসবাবু মধ্যে মধ্যে বিরাজের কাছে যেতেন, যদিও বাসবী দেবীর ধারণা হয়েছিল তাঁর টানেই সুহাসবাবু ঝাউতলার বাড়িতে যেতেন—

কিন্তু আপনি এসব কথা জানলেন কি করে?

দুটি প্রমাণের সাহায্যে—

দুটি প্রমাণ! সুনীল প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। প্রথম প্রমাণ, আপনাদের—এবং রথীন তোরও মনে আছে নিশ্চয়ই, বিরাজ সান্যালের গৃহে প্রথম দিন গিয়ে মৃতা বাসবী দেবীর ঘরের মধ্যে একটা রাইটিং প্যাড ও একটি কলম পেয়েছিলাম!

রথীন বলে, হ্যাঁ মনে আছে, কিন্তু সেই প্যাডে তো—

কোন কিছু লেখা ছিল না! কারণ যে পৃষ্ঠায় লেখা ছিল সব কথা সেটা বাসবীর হত্যার রাত্রে তাঁর প্যাড থেকে হত্যাকারী ছিঁড়ে নিয়ে যায়। কিন্তু ছিঁড়ে নিয়ে গেলেও নীচের পাতায় হার্ড নিবের পেন দিয়ে লেখার জন্য যে impression পড়েছিল, infra red আলোর সাহায্যে তার ফটো তুলতেই সব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চিঠিটা লিখেছিলেন সেরাত্রে বাসবী দেবী সুহাসকেই—

কি লিখেছিল বাসবী? ব্রজেশ প্রশ্ন করে।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, লিখেছিলেন তিনি জানতে পেরেছেন যে, সুহাস তার জ্যাঠাকে ব্ল্যাকমেইল করছে। কিন্তু বাসবী দেবী ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেননি যে, বাসবী দেবী যে ব্যাপারটা জানতে পেরে গিয়েছেন সেটা আর তখন সুহাসবাবুর অবিদিত ছিল না। মনে পড়ে ব্রজেশবাবু আপনাদের, বাসবী দেবীর সঙ্গে কে একজন সাহেব দেখা করতে এসেছিলেন!

হ্যাঁ, মনে আছে—

সে কে জানেন?

না।

মিঃ পল—

পল!

হ্যাঁ, বর্তমানে যার আশ্রয়ে ছিলেন লুসি দেবীর মা জুনিফার। পল গিয়েছিল সেরাত্রে বাসবী দেবীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সুহাসবাবুকে বিয়ে করার কথা বলবার জন্য।

তার মানে?

তার মানে তাহলে বাসবী দেবীকেও পাওয়া হয়, সেই সঙ্গে তাঁর সম্পত্তিও হাতে আসে। কিন্তু বাসবী দেবী রাজী হলেন না। তখন অগত্যা তাঁকে পৃথিবী থেকে না সরাতে পারলে সব ভেস্তে যাবে বলে তাঁকে হত্যা করা হল।

বলেন কি! পল হত্যা করল? সুনীল বলে।

না, পল নয়। হত্যাকারী বাসবী দেবীর বিশেষ পরিচিত জন, যাকে তিনি অত রাত্রে অতর্কিতে তাঁর ঘরে দেখেও বিশেষ চমকাননি বা চেঁচিয়ে ওঠেননি—আর সেই সুযোগটুকুই খুনী পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিল।

কে—কে সে? ব্রজেশ যেন চাপা আর্তনাদে প্রশ্নটা করে।

ঐ সুহাসবাবু—

সুহাস! সুহাস বাসবীকে হত্যা করেছে? সুনীল ও ব্রজেশ একসঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করে পরম বিস্ময়ে।

হ্যাঁ।

মিথ্যা—সম্পূর্ণ মিথ্যা। চেঁচিয়ে ওঠে সুহাস, বিশ্বাস করো না সুনীল—বিশ্বাস করো না ব্রজেশ। সব মিথ্যা—It's a cock and bull story!

মিথ্যা যে নয় তার প্রমাণ আছে সুহাসবাবু আমাদের হাতে! শান্ত গলায় কিরীটী বলে।

মিথ্যা—কোন প্রমাণই থাকতে পারে না। কি—বলুন কি প্রমাণ আছে আপনাদের?

প্রমাণ প্যাডের যে পাতাটা সেরাত্রে বাসবীর স্বীকারোক্তিকে ঢাকা দেবার জন্য আপনি বাসবী দেবীর প্যাড থেকে ছিঁড়ে এনেছিলেন এবং যে কাগজটা বাগানের প্রাচীর টপকে ফিরে আসবার সময় আপনার পকেট থেকে যেভাবেই হোক কোন অসতর্ক মুহূর্তে পড়ে গিয়েছিল—সেটাও আমার হস্তগত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই প্যাডের কাগজেও আপনার finger print পাওয়া গিয়েছে—যা প্রমাণ করবে আদালতে সেরাত্রে আপনি সে-ঘরে গিয়েছিলেন সুহাসবাবু!

সুহাস স্তব্ধ, ফ্যাকাশে।

আরও একটি মোক্ষম প্রমাণ আছে সেরাত্রের সুহাসবাবু আপনার বিরুদ্ধে, বাথরুমে যে রুমালটি অসাবধানতা বশতঃ সেরাত্রে ফেলে এসেছিলেন সে রুমালটা ব্রজেশবাবুর হলেও তার মধ্যে নস্যির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে সেটিই প্রমাণ করে দেবে রুমালটা আপনি ব্যবহার করেছিলেন, তার সাহায্যে বাসবী দেবীকে throttle করে মারবার আগে। পাঁচ বন্ধুর মধ্যে আপনিই একমাত্র নস্য ব্যবহার করেন এবং সেটাও specially scented নস্য—

হঠাৎ ঐ সময় চিৎকার করে ওঠে লুসি, সুহাস, তুমিই তাহলে—

হ্যাঁ, লুসি দেবী। তাই বলছিলাম, আপনিও ভুল করেছিলেন। সুহাসবাবুর সবটাই অভিনয়। He was more interested in money than woman! রথীন, তুই এবারে তোর কর্তব্য করতে পারিস।

কিন্তু রথীন তার সুযোগ পেল না। তার আগেই হঠাৎ সুহাস তার পকেট থেকে একটা ক্যাপসুল বের করে মুখে পুরে চিবিয়ে ফেলল এবং পরক্ষণেই দড়াম করে তার দেহটা মেঝের উপর পড়ে গেল।

ছুটে গেল রথীন।

কিরীটী বললে, ফাঁকি দিয়েছে রথীন তোর আসামী। সায়েন্সের স্টুডেন্ট সুহাসবাবু সম্ভবত পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন, চরম কিছুর জন্য মনে হচ্ছে সব সময় উনি প্রস্তুত থাকতেন।

॥ তেইশ ॥

ঘরের মধ্যে সবাই স্তব্ধ, হতবাক যেন। বিচিত্র একটা নাটক যেন এইমাত্র সমাপ্ত হল।

সামনেই পড়ে সুহাসের নিষ্প্রাণ বিষজর্জর দেহটা। বাকি সব স্তব্ধ হয়ে চারপাশে দাঁড়িয়ে।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। একজন পুলিস অফিসারের সঙ্গে রঞ্জন এসে ঘরে ঢুকল।

সুনীল, ব্রজেশ—তোরা! কিন্তু রঞ্জনের কথা শেষ হল না—সে থেমে গেল সুহাসের ভূপতিত দেহটার দিকে তাকিয়ে, সুহাস মাটিতে পড়ে কেন?

রঞ্জনবাবু, সুহাসবাবু সুইসাইড করেছেন! কিরীটী মৃদু গলায় বললে।

উঃ, একটা স্কাউনড্রেল! জীবন্ত ধরতে পারলেন না ওকে? রঞ্জন বলে, পারলেন না মিঃ রায়!

ধরেছিলাম কিন্তু সামান্য অসতর্কতায় আমাদের উনি ফাঁকি দিয়েছেন সবাইকে। কিন্তু আপনি বাসবী মৃত জেনেও লুসিকে ভুল করেছিলেন কি করে বাসবী বলে আজ সন্ধ্যায়, যখন উনি আপনাকে ডাকতে যান?

কেমন যেন হঠাৎ আমি হয়ে গিয়েছিলাম মিঃ রায়, অবিকল বাসবীর মত ওকে দেখে! হঠাৎ যেন মনে হয়েছিল বাসবী মরেনি—সে আজও বেঁচে আছে। আচ্ছন্নের মত গিয়ে গাড়িতে উঠেছিলাম ওর আগে আগে, তারপরই কে যেন আমার মুখে একটা রুমাল চেপে ধরল!

ক্লোরোফর্ম-ভিজানো রুমাল সুহাসবাবু ধরেছিলেন আপনার মুখে চেপে, তিনি গাড়ির মধ্যেই ঘাপটি মেরে বসেছিলেন।

এখন বুঝতে পারছি, সঙ্গে সঙ্গে আমি তাই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কেন সুহাস আমাকে ঐভাবে—

সেকথা একমাত্র লুসি দেবীই বলতে পারেন, ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন না। কিরীটী বললে, বলুন মিস সান্যাল—

বলব—আজ আমি সবই বলব। লুসি হঠাৎ বলে ওঠে, কোন কথাই আর গোপন করব না—

সুহাসের সঙ্গে কি করে আপনার পরিচয় হল? কিরীটী প্রশ্ন করে, কতদিনের পরিচয়?

বেশী দিন নয়, মাত্র ছ মাসের পরিচয়—

কেমন করে পরিচয় হল?

ওর বোন—আমার বান্ধবী সহকর্মিণী রাখীর আপন মামতো ভাই সুহাস—

আপনার যে বান্ধবী আপনার সঙ্গে ঐ বাড়িতে থাকেন? বর্তমানে হাসপাতালে আছেন?

হ্যাঁ। ছ মাস আগে একদিন সুহাস এখানে তার বোনের সঙ্গে দেখা করতে আসে। রাখী বাসায় ছিল না, আমি দরজা খুলে দিই।

তারপর?

তখন তো বুঝতে পারিনি—আমাকে দেখে ও ভীষণ চমকে ওঠে, কয়েকটা মুহূর্ত তারপর কেমন যেন ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে,

বলে অর্ধস্ফুট গলায়, কে—কে আপনি? আশ্চর্য, কি সৌসাদৃশ্য দুজনের! জিজ্ঞাসা করি, কার কথা বলছেন? সুহাস বলে, না, একজনের সঙ্গে ভীষণ মিল আপনার তাই হঠাৎ চমকে উঠেছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কার সঙ্গে মিল? ও বললে, আমার জানা একটি মেয়ের সঙ্গে—

তখনও আপনি বাসবীকে দেখেননি নিশ্চয়ই?

দেখেছি। তারই কিছুদিন আগে জেনেছিলামও তার কথা—

তারপর?

কাজেই আমি বুঝতে পারলাম, কার কথা সুহাস বলছে। কিন্তু কিছু প্রকাশ করলাম না।

তাহলে বেশ কিছুদিন আগে থাকতেই আপনি আপনার যমজ বোনের কথা জানতেন? কিরীটী প্রশ্ন করে।

লুসি বলে, হ্যাঁ, জানতাম।

যাক। যা বলছিলেন বলুন।

বলতে দ্বিধা নেই, তার পর থেকেই মধ্যে মধ্যে সুহাস এখানে আসতে লাগল।

আপনার বান্ধবীর অনুপস্থিতিতেই বেশীর ভাগ বোধ হয়?

হ্যাঁ। এবং ক্রমে আমাদের আলাপ ও—

ঘনিষ্ঠতা হয়।

হ্যাঁ।

তারপর?

আমাদের আলাপ যখন ঘনিষ্ঠতায় পেঁাচেছে, সেই সময় হঠাৎ একদিন এক রেস্টুরেণ্টে আমরা যখন বসে আছি, পল সেখানে এল। পল আমাকে দেখে চমকে ওঠে। তারপর সুহাস যখন তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে উদ্যত হয় সে বলে, আমাকে সে চেনে, পরিচয়ের প্রয়োজন নেই।

সুহাসবাবু কি জানতেন না যে আপনার মা জুনিফার?

তখনও জানত না। পরে পলের মুখে শুনেছিল।

বলুন, তারপর?

আমি তখনও জানতাম না সুহাস আমার জ্যাঠাকে ব্ল্যাকমেইল করছে—

কবে জানতে পেরেছিলেন সেটা?

বাসবীর মৃত্যুর কয়েক দিন আগে—

কেমন করে জানলেন?

মার কাছে—

মার কাছে আপনি যেতেন?

হ্যাঁ, মধ্যে মধ্যে যেতাম তাকে কিছু সাহায্য করতে।

আপনার মা আপনাকে কি বলেছিলেন?

মা বলেছিল, সুহাসের বাবা সমীর চৌধুরী আর আমার জ্যাঠামশাই বিরাজ সান্যাল দুজনে মিলে বর্মায় কাঠের ব্যবসা করেছিলেন—

আপনার মা সেকথা জানতেন ?

না, জানত না। পলই বলেছিল।

তারপর ?

সুহাসের বাবাকে নাকি খুন করে তাঁর সব টাকাকড়ি ও ব্যবসার অংশ জ্যাঠামশাই নিয়ে নেন। সুহাস তাই এতদিন পরে জ্যাঠামশাইয়ের সন্ধান পেয়ে তার বাপের হত্যার ও তাঁর সঙ্গে প্রতারণার প্রতিশোধ নেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে এবং পল ওকে সাহায্য করবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ; কিন্তু মা কথাটা বিশ্বাস করতে পারেনি। তবে আমাকে ডেকে বলেছিল সব কথা এবং বলেছিল পল সাংঘাতিক চরিত্রের লোক—সুহাসের সঙ্গে যখন তার বন্ধুত্ব হয়েছে, সুহাসকেও মা বিশ্বাস করতে পারছিল না। আমি অবিশ্যি প্রথমে মার কথাটাও বিশ্বাস করিনি, কিন্তু বাসবীকে হত্যা করার কয়েক দিন আগে হঠাৎ জানতে পারি—

কি করে জানলেন ?

একদিন সুহাসের বাসায় দুজনে বসে গল্প করছি, ঐ সময় আমার জ্যাঠামশাইয়ের ড্রাইভার এসে একটা খাম সুহাসের হাতে দিল। লোকটা যে জ্যাঠামশাইয়ের ড্রাইভার আগেই সেটা জেনেছিলাম, তাই লোকটা চলে যেতে সুহাসকে যখন দেখলাম খাম থেকে টাকা বের করে গুনছে তখন জিজ্ঞাসা করলাম, কিসের টাকা ? সুহাস আমাকে এড়িয়ে গেল। মনে আমার আরও সন্দেহ হয়। সুহাসকে পরেও নানাভাবে প্রশ্ন করি কিন্তু সে জবাব দেয় না। তখন মাকে জিজ্ঞাসা করি। মা-ই বলে প্রথমে ব্ল্যাকমেইলের কথা। জ্যাঠামশাই নাকি প্রতি মাসে সুহাসকে দু হাজার করে টাকা দিয়ে যাচ্ছেন। ভেবেছিলাম সেকথা বলব পরের দিনই সুহাসকে, কিন্তু চার দিন সুহাস এল না—আর পাঁচদিনের দিন সকালে সংবাদপত্রে বাসবীর মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হল। আমি যেন কেমন ভয় পেয়ে গেলাম—

কেন ?

জানি না। মনে হয়েছিল বাসবীই শেষ নয়, জ্যাঠামশাইয়েরও হয়ত বিপদ মাথার উপরে ঝুলছে। ছুটে গেলাম এক রাত্রে তাঁর কাছে—

তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন আপনি ? কিরীটী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। তাঁকে সব কথা বলি। এবং সেইদিনই আমার অস্তিত্বের কথা প্রথম তিনি জানতে পারেন। তারপর শ্যামা খুন হল। আমি আরও ভীত ও আরও নার্ভাস হয়ে পড়লাম। সুহাসকে বললাম সব কথা। সুহাস বললে, তোমার ভয়টা কি, তোমার গায়ে আঁচড়টিও লাগবে না। শুধালাম, কি করে বুঝলে ? সে বললে, কারণ আমি জানি কে খুনী। বললাম, জান ? কে ?

সে বলে, রঞ্জন—

তারপর ?

সুহাস আমাকে বুঝিয়েছিল, শীঘ্রই পুলিসকে সব কথা সে জানাবে। ঐসময় আপনি এলেন আমার এখানে। আপনারা চলে যাবার পরই সুহাস এল। তাকে

সব বললাম—

তবে সেদিন বলেছিলেন কেন, সুহাসবাবুকে আপনি চেনেন না ?

ভয়ে—ভয়ে মিথ্যা বলেছিলাম ! তাছাড়া—

কি ?

সুহাস আমাকে বুঝিয়েছিল, জ্যাঠামশাইয়ের যদি কোনমতে আমার ওপরে সন্দেহ হয় বাসবীর মৃত্যুর ব্যাপারে, তাহলে তিনি এক কপর্দকও আমাকে দেবেন না, ত্যজ্য করবেন—

তবে যে সেদিন তাঁর অর্থের প্রতি আপনার কোন লোভ নেই বলেছিলেন ?

লুসি মাথা নীচু করে।

যাক, যা বলছিলেন বলুন।

আজ রাত্রে সুহাস প্ল্যান করে, আমাকে পাঠিয়ে রঞ্জনকে এনে পুলিসের হাতে তুলে দেবার। কিন্তু তখন বুঝিনি তার আসল প্ল্যান তাকেও হত্যা করা—

কেন ? রঞ্জনবাবুকে হত্যা করার কি প্রয়োজন হয়েছিল সুহাসবাবুর ? কিরীটী প্রশ্ন করে।

শ্যামা যেমন সেরাত্রে সুহাসকে বাসবীকে হত্যা করে পালিয়ে যাবার সময় দেখে চিনতে পেরেছিল বলে সুহাস তাকে হত্যা করে, তেমনি রঞ্জনবাবুও সুহাসকে বোধ হয় সন্দেহ করেছিল – পরে আমার কথাটা মনে হয়েছে রঞ্জনবাবুকে বাগান-বাড়িতে গুম করে আসবার পর। আপনারা আসার আগে ঐ ব্যাপার নিয়েই আমাদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল।

লুসি থামল। ইতিমধ্যে রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। ভোরের আবছা আলো জানালাপথে দেখা যায়।

॥ চব্বিশ ॥

রথীন পরের দিন কিরীটীর গৃহে বসে জিজ্ঞাসা করে, really কিরীটী, my hats off to you—কিন্তু সুহাসই যে আসল নাটের গুরু বুঝলি কি করে ?

চোখ থাকলে আর মাথার গ্রে সেলগুলোকে একটু সক্রিয় করে তুললে তুইও জানতে পারতিস। মনে পড়ে তোর শ্যামা বলেছিল, দুর্ঘটনার কয়েক দিন আগে এক রাত্রে বাসবী ও বিরাজ যখন বাসবীর ঘরে বসে কথা বলছে, সে সুহাসের নাম শুনেছিল ?

হ্যাঁ।

কেন তোর মনে হয়নি, রঞ্জন ও ব্রজেশের কথা বাদ দিয়ে হঠাৎ সুহাসের কথাই বা আসে কেন ? তারপর সেরাত্রে সিনেমার ব্যাপারটা ভেবে দেখ্ ! রঞ্জনবাবু সুনীলবাবুর পাশেই ছিলেন – কাজেই তাঁর পক্ষে মরফিন সুনীলবাবুর দেহে inject করা সম্ভবপর ছিল না, অথচ সুহাসও সেরাত্রে লবিতে ঐ সময় উপস্থিত

ছিল, বিচিত্র একটা যোগাযোগ নয় কি? প্যাড ও পেনটা—যা বাসবীর ঘরে পড়েই ছিল, সেটা তুই যদি গোড়া থেকেই neglect না করতিস তো সেই অর্ধ-সমাপ্ত চিঠির মধ্যেই দেখতে পেতিস সম্পূর্ণ সত্যটা—আবিষ্কার করতে পারতিস রহস্যটা। এই দেখ্ সে চিঠির copy, পড়ে দেখ্।

বলতে বলতে কিরীটী একটা ভাঁজকরা কাগজ সামনের ফাইল থেকে টেনে বার করল। রথীন পড়ে কাগজটা। অর্ধসমাপ্ত একটা চিঠি।

সুহাস,

তুমি যে এত কুৎসিত এত জঘন্য জানতাম না, আজ জানতে পেরে লজ্জায় মাথা আমার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে। তোমাকে বিয়ে করা তো দূরে থাক, তোমার দিকে তাকাবার কথাও ভাবতে পারছি না আর আমি। তোমার ও থ্রেটনিংকে আমি ভয় করি না জেনো। এখন বুঝতে পারছি, তুমিই কিছুদিন ধরে ছায়ার মত আমার পিছনে পিছনে ঘুরছিলে। তুমি আমাদের বিয়েতে এস না। এলে কিন্তু সবাইকে আমি—

রথীন কাগজটা পড়ে কিরীটীর হাতে ফিরিয়ে দিল।

এখন বুঝতে পারছিস?

হ্যাঁ, I was blind—I was a fool! রথীন বলে।

তারপর আরও ছিল। সুহাসবাবুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসে রাত্রে আমাকে লুসির কথা বলা। একটু ভেবে দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারতিস। আমাদের সন্দেহ তার প্রতি না দানা বেঁধে উঠতে পারে তাই আমাদের চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ অন্য পথে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। সর্বশেষ ও মোক্ষম সন্দেহ তোর সুহাসের উপরই পড়া উচিত ছিল, বর্মা পুলিসের রিপোর্ট পড়ে ও ফটোটা দেখে। ফটোটা ভাল করে দেখলেই বুঝতে পারতিস সমীর চৌধুরীর মুখের সঙ্গে আমাদের সুহাসবাবুর কি অদ্ভুত similarity! সুহাসের প্রতি সন্দেহটা তখনই আমার দৃঢ়বদ্ধ হয়। বুঝতে পারি হত্যাকারী সুহাস ছাড়া আর কেউ নয়।

কিন্তু—

রিপোর্টে একটা জিনিস ছিল, বিরাজ ও সমীর চৌধুরীর মধ্যে কোন নারী-ঘটিত ব্যাপার। হয়ত সেই নারীর জন্যই সমীর চৌধুরীকে প্রাণ দিতে হয়েছিল এবং সেই নারীঘটিত ব্যাপারটাই হয়ত সুহাসকে ইদানীং বিরাজমোহনকে ব্ল্যাক-মেইলিং করতে সাহায্য করেছে।

কিন্তু কে সে নারী?

জানি না। জানতে হয়ত পারাও যাবে না কোন দিন, কারণ যে দুজন জানত তার মধ্যে একজন সুহাস—সে আজ মৃত এবং দ্বিতীয় ঐ বৃদ্ধ পঙ্গু বিরাজমোহন, তাঁকে আর আমার ইচ্ছা নয় নতুন করে হত্যাব্যাপারে নোংরামির মধ্যে টেনে আনা।

ঐ সময় রঞ্জন, সুনীল, ব্রজেশ ও অভিজিৎ এসে ঘরে ঢুকল।

আসুন আসুন রঞ্জনবাবু—কিরীটী বলে ওঠে।

ওরা সোফার ওপরে এসে বসল।

কিরীটী রঞ্জনের মুখের দিকে চেয়ে বলে, আসল credit কিন্তু আপনার—

আমার !

হ্যাঁ, আপনার লেখা সুনীলবাবুকে চিঠিটার মধ্যে যে আপনার সেতারের সুর বেজে উঠেছিল, সেই সুরই আমাকে দুটো কথা জানিয়ে দেয়—এক বাসবী দেবীর প্রতি আপনার গভীর প্রেম—

রঞ্জন মাথাটা নীচু করে।

কিরীটী ওর দিকে তাকিয়ে বলে, ভালবাসার মধ্যে লজ্জা তো কিছু নেই রঞ্জনবাবু। আপনি, ব্রজেশবাবু ও সুনীলবাবু তিনজনেই আপনারা বাসবী দেবীকে ভালবেসেছিলেন। জগতে এমন এক-একজন নারী আছে যাদের প্রতি প্রত্যেক পুরুষই আকৃষ্ট হয়। ভাল না বেসে পারে না। বাসবী দেবীও হয়ত তেমনিই এক নারী ছিলেন। যাক যা বলছিলাম, সেই ভালবাসার ইঙ্গিত থেকেই যেটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেটা হচ্ছে, আপনারা তিন বন্ধুর কেউই বাসবী দেবীকে হত্যা করতে পারেন না। অথচ হত্যার ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে মনে মনে যেটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, বাসবী দেবী তাঁর কোন পরিচিতের হাতেই নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছেন। তাই যদি হয়ে থাকেন তো কে সে—কে সে পরিচিত জন ? আপনারা পাঁচ বন্ধু ও বিরাজ সান্যাল—শেষোক্ত জনকে আগেই বাদ দিয়েছিলাম, বাকি থাকেন আপনারা পাঁচজন—আপনাদের পাঁচজনের মধ্যে অভিজিৎবাবু, সুনীলবাবু, ব্রজেশবাবু ও রঞ্জনবাবুকেও বাদ দিতে হয়েছে আমায়, বাকি তাহলে থাকল একজন—সুহাসবাবু, সমস্ত সন্দেহ তখন আমার সুহাসবাবুকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খেতে থাকে। কিন্তু হত্যার মোটিভ কি হতে পারে ? প্রথমটায় ভেবেছিলাম বোধ হয় ঈর্ষা, সুহাসবাবুও হয়ত বাসবী দেবীকে ভালবেসেছিলেন ! পরে যখন বুঝতে পারলাম তা নয়, তখনই মনে হল—তবে কি অর্থ ? কিন্তু বাসবীর হত্যার সঙ্গে অর্থের কি যোগ থাকতে পারে সুহাসবাবুর ? ঐখানে এসেই আমি হোঁচট খেতে লাগলাম বার বার। তারপর এল বর্মা পুলিসের রিপোর্ট ও ফটো। সব পরিষ্কার হয়ে গেল দিনের আলোর মত। সামান্য একটু বাকি ছিল, লুসি দেবীর statement-এ তাও পরিষ্কার হয়ে গেল গতরাত্রে। অবিশ্যি চিঠির ব্যাপারটা তো আগে থাকতে ছিলই—

কিরীটী থামল একটু, তারপর বললে, কিন্তু একটা অনুরোধ আছে রঞ্জনবাবু আপনার কাছে আমার—

কি বলুন ?

একদিন আপনার সেতার বাজনা শোনাতে হবে।

রঞ্জন প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসল।

ওরা তিনজন

।। এক ।।

প্রমীলা নাকি আত্মহত্যা করেছে। প্রমীলা আত্মহত্যা করেছে কথাটা শিবেনের যেমন অসম্ভব তেমনি যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়। এই তো মাত্র গত পরশুই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে দেখা হয়েছিল প্রমীলার সঙ্গে শিবেনের।

সেই হাসিখুশি কৌতুকপ্রবণ প্রাণোচ্ছল প্রমীলা। কই, সেদিনও তো দু'-ঘণ্টার মধ্যে প্রায় একবারও শিবেনের মনে হয়নি ওর মনের মধ্যে কোথায়ও কোনপ্রকার দুশ্চিন্তা বা দুর্ভাবনা আছে। বরং ওর চিরদিন যেমন বন্ধুবান্ধবদের 'লেগ-পুল' করা অভ্যাস, বিশেষ করে নির্মলের সঙ্গে, সেদিনও সন্ধ্যায় প্রমীলা 'লেগ পুল' করছিল।

নির্মল যত গম্ভীর হয়ে ওঠে, প্রমীলা যেন ততই ওকে বেশী করে জ্বালাতন করছিল—আর নির্মলের বিরক্তিতে ওর চাপা হাসিটা যেন আরও বেশী প্রকট হয়ে উঠছিল।

অবশেষে একসময় হঠাৎ উঠে পড়ে বলেছিল, আমি চললাম শিবেন।

প্রমীলা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল, সে কি! এরই মধ্যে চললে মানে? না না, তা হয় নাকি! এখনও তো সন্ধ্যাই উৎরাল না। বস বস, আর এক কাপ কফি হোক and I shall stand, তারপর এক বাসেই ফেরা যাবে—চাই কি ট্যাক্সিও নিতে পারি।

না, ধন্যবাদ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্মল বললে।

প্রমীলা চাপা হাসি হাসতে হাসতেই বলে ওঠে, আবার ধন্যবাদের কি আছে—after all we are all friends here! Have another cup of coffee—বস বস—

না।

প্রমীলাই তখন বলে উঠেছিল, শিবেন, নির্মল নিশ্চয়ই রাগ করেছে। বলেই আবার সে তার স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকপ্রিয়তায় ফিরে আসে, তা সে তুমি যাই বল নির্মল, ঐ গোলকুমড়োর মত দেখতে মীনাক্ষীর পাশে তোমাকে just like a perpendicular—মনের পাতায় যখনই ছবিটা ভেসে ওঠে—আর বলতে পারেনি প্রমীলা, মুখে হাত চাপা দিয়ে উচ্ছ্বসিত হাসিতে যেন একেবারে ভেঙে পড়েছিল।

প্রমীলা মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসিটা রোধ করার চেষ্টা করছে। মাথাটা একটু কুঁকিয়ে রেখে দু'পাশ দিয়ে নেমে আসা লম্বা বিনুনী দুটো দুলছে থেকে থেকে। আর নির্মল স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে প্রমীলার দিকে।

প্রমীলা আবার বলে ওঠে, তার চাইতে একটা ডানলোপিলো—

নির্মল মৃদু চাপা গলায় বলে ওঠে, Vulgar!

প্রমীলা মুখ তুলে তাকায় নির্মলের দিকে। উচ্ছ্বসিত হাসির বেগটা রোধ করতে করতে বলে, ভালগার—ভালগারের কি আছে! তুমি একটা ডানলোপিলোর

সঙ্গে গদগদ হয়ে প্রেম করতে পার—

আর তুমি তো তন্বী শ্যামা শিখরদশনা—মীনাক্ষী না হয় ডানলোপিলোই হল, তা ছাড়া সবাই তো সমান হয় না। অত অহংকার ভাল নয় প্রমীলা দেবী—চাপা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে নির্মল।

এতক্ষণ শিবেন একটা কথাও বলেনি, বরং ব্যাপারটা সত্যি বলতে কি উপভোগই করছিল। কিন্তু ক্রমশঃ ব্যাপারটা যেন কেমন বাঁকা পথ ধরছে তার মনে হতেই সে প্রমীলাকে বলে ওঠে, আঃ প্রমীলা, থাম তো—এই নির্মল, বোস—বোস—

না—

কথাটা বলে নির্মল আর দাঁড়ায়নি। বেশ একটু দ্রুতপদেই হলঘর থেকে অতঃপর বের হয়ে গিয়েছিল।

শিবেন তখন বলেছিল, সত্যিই নির্মল রেগে গিয়েছিল প্রমীলা। ও আজ সত্যিই বোধ হয় জোকিং মুডে ছিল না।

প্রমীলা তখনও হাসছে।

কিন্তু সত্যিই কি ব্যাপার বল তো প্রমীলা? শিবেন শুধায়।

কিসের কি ব্যাপার?

ঐ মীনাক্ষী সম্পর্কে যা একটু আগে বলছিলে! সত্যিই নাকি ব্যাপারটা?

জানি না, তবে একটু যেন বেশীই ওরা আজকাল মাখামাখি করছে—

প্রেম!

নির্মল করবে প্রেম – তবেই হয়েছে—

কেন? হঠাৎ ও কথা কেন?

তোমরা নির্মলকে কতটা জান জানি না শিবেন। আমার প্রতিবেশী, ওকে আমি খুব ভাল করেই চিনি। কিন্তু আর না শিবেন। চল, ওঠা যাক—

প্রমীলা যেন প্রসঙ্গটার উপর অকস্মাৎ একটা দাঁড়ি টেনে দিয়ে উঠে পড়েছিল। দু'জনে কফি হাউস থেকে বের হয়ে বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে বেশ কিছুক্ষণ বাসের অপেক্ষায় পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল—শিবেন যদিও যাবে উল্টো দিকে।

কিন্তু একটা কথাও আর অতঃপর হয়নি ওদের পরস্পরের মধ্যে, যদিও প্রায় আধ ঘণ্টা ওরা পাশাপাশি বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়েছিল।

প্রমীলাকে কেমন যেন একটু অন্যমনস্কই ওর মনে হয়েছিল সেদিন। আজ কথাটা মনে পড়ছে শিবেনের।

তবু—

তবু মনে হয় শিবেনের, সমস্ত ব্যাপারটাই আগাগোড়া একটা ঠাট্টা বা রসিকতা নয় তো? সত্যি সত্যি একটু আগে নির্মল ফোনে তার সঙ্গে ঠাট্টা বা রসিকতা করল না তো?

কিন্তু আবার মনে হয়, অমন একটা ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা-রসিকতা। তা ছাড়া

নির্মলের অমন প্রকৃতিই তো নয়, বরাবরই একটু সিরিয়াস টাইপের ছেলে।

কিন্তু সত্যি-সত্যি নির্মলেরই ফোন তো?

হ্যাঁ, নির্মলই তাকে ফোন করেছিল—যদিও নির্মল তার নাম বলেনি; সে তো নাম জিজ্ঞাসা করেনি এবং সত্য কথা বলতে কি, কে ফোন করছে তাকে ঐ মুহূর্তে কথাটা তলিয়ে ভাববার মতও বুঝি তার মনের অবস্থা ছিল না।

তা না হোক, গলার স্বরটা নির্মলেরই।

নির্মলদের বাড়িতে ফোন আছে। আগেও অনেকবার নির্মল তাকে ফোন করেছে। নির্মলের ফোনের গলা তার চেনা। ভুল হবার কথাই ওঠে না।

না, নির্মল ছাড়া আর কেউ না—অন্য কেউ হতেই পারে না।

ফোনের শব্দে ঘুমটা ভেঙে যেতেই হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়েছিল শিবেন।

হ্যালো!

অন্য প্রান্ত থেকে প্রশ্ন, শিবেন?

হ্যাঁ, কে?

তারপরই আবার নির্মলের গলা, শুনেছিস প্রমীলা সুইসাইড্ করেছে!

কে—কে সুইসাইড্ করেছে?

প্রমীলা—প্রমীলা চক্রবর্তী!

একটা প্রচণ্ড শব্দের মত যেন 'প্রমীলা' নামটা তার কর্ণপটাহে এসে আছড়ে পড়েছিল।

কয়েকটা বোবা বিহ্বল মুহূর্ত। হাতের মধ্যে ফোনের রিসিভারটা ভরা তখনও। শিবেন যেন একেবারে পাথর।

প্রমীলা সুইসাইড্ করেছে! কে—কে তাকে ফোনে বলল—নির্মল? নির্মলের গলাই যেন মনে হল। ওরা তো এক পাড়াতেই থাকে—খানতিনেক বাড়ির ব্যবধান দু'জনার বাড়ির মধ্যে।

হ্যালো—হ্যালো, নির্মল—এই নির্মল।

বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে উঠে শিবেন ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকে, কিন্তু ফোনের কানেকশান তখন কেটে গিয়েছে।

ডায়েল টোন শোনা যাচ্ছে।

শিবেন ক্ষিপ্রহাতে নির্মলের ফোন নম্বরটা ডায়েল করল।

বেশ কিছুক্ষণ বাজবার পর অপর প্রান্তে নির্মলের গলা শোনা গেল।

হ্যালো!

নির্মল?

হ্যাঁ, কে?

আমি—আমি শিবেন, একটু আগে তুই কি বললি?

আমি!

হ্যাঁ, তুই তো ফোন করছিলি?

আমি ফোন করছিলাম—তোকে ? কই, না তো !

তুই বললি না আমাকে ফোন করে ? এই মাত্র ?

কি বলেছি ?

প্রমীলা—মানে আমাদের প্রমীলা সুসাইড্ করেছে !

Are you mad ! আমি আবার কখন তোকে ফোন করে বলতে গেলাম যে প্রমীলা সুসাইড্ করেছে—আর কোন্ দুঃখেই বা সে সুইসাইড্ করতে যাবে ? স্বপ্ন দেখছিস নাকি ?

তবে কে—কে আমাকে ফোন করল ?

কেউ করেনি—তুই বোধ হয় একটু আগে স্বপ্ন দেখছিলি ! ঘুমোচ্ছিলি নিশ্চয়ই, কারণ সাড়ে সাতটার আগে তুই বিছানা থেকেই উঠিস না। কথার শেষে একটা হাসির শব্দ কানে এল শিবেনের।

শিবেন আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওদিকে ততক্ষণে নির্মল ঠক্ করে ফোনটা রেখে দিয়েছে।

নির্মল সকালবেলা উঠে বাসিমুখেই এক কাপ চা নিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বসেছিল, ঐ সময় শিবেনের ফোন এসেছিল। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে নির্মল আবার এসে চেয়ারে বসে টুলটার উপর থেকে চায়ের কাপটা তুলে নিল।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছটা বাজল।

নির্মল চায়ের কাপে আবার চুমুক দেয়। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। কয়েক চুমুকে চায়ের কাপটা নিঃশেষ করে সিগারেটটা হাতে ঘরের সামনে রাস্তার উপরে খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

নির্মলদের দোতলার বারান্দা থেকে দুটো বাড়ির পরে প্রমীলাদের বাসাবাড়ির দোতলার বারান্দাটা সামান্য দেখা যায়। রেলিঙের কিছুটা অংশ আর জাফরীর সঙ্গে লোহার হুকে ঝোলানো ছোট ছোট মাটির টবে মানি প্ল্যাট ও ফুলের গাছ দেখা যায়।

প্রমীলার বাবা নিরঞ্জন চক্রবর্তী কোন একটা ফার্মে যেন চাকরি করেন, মাইনে বোধ হয় আট-নশো পান। নির্মলরা যখন ক্লাস সেভেনে পড়ে সেই সময় নিরঞ্জনবাবু এ পাড়ায় এসে ঐ বাড়ির দোতলা ও তিনতলাটা ভাড়া নেন। কাজেই প্রমীলারা ঐ বাড়িতে বসবাস করছে তা প্রায় বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল।

আলাপ ছিল না নির্মলের সঙ্গে প্রমীলার। আলাপ হতও না, কারণ চির-দিনই একটু মুখচোরা গোবেচারা টাইপের ছেলে নির্মল মল্লিক। কিন্তু তবুও আলাপ হয়ে গেল একদিন, কয়েক বছর পরে হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করে কলেজে পড়তে গিয়ে।

আলাপ হয়ে গেল শিবেনের মাধ্যমে। শিবেন বলেছিল, এই নিমু, ঐ প্রমীলা চক্রবর্তীকে চিনিস ? ঐ যে মেয়েটি—আমাদের সঙ্গেই এবারে এই কলেজে ঢুকেছে ডিগ্রী কোর্সে, আমাদের সায়েন্স বিভাগেই !

না।

সে কি রে, তোদের পাড়াতেই তো থাকে !

তা হবে—

মিস চক্রবর্তী—এই যে এদিকে ! শিবেনের ডাকে প্রমীলা এগিয়ে এল।

কিছু বলছিলেন শিবেনবাবু ?

হ্যাঁ, এই যে আমার এই বন্ধু—নির্মল মল্লিককে চেনেন ?

প্রমীলা মৃদু হেসে বলেছিল, না, পরিচয় নেই। তবে উনি আমাদের পাড়াতেই থাকেন জানি। উনি তো এবার দুটো লেটার পেয়েছেন—কেমিস্ট্রি আর ম্যাথামেটিক্সে।

ঐ সময় নির্মল বলেছিল, আপনাকে তাই চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল দেখা অবধি। আপনি আমাদের পাড়াতেই থাকেন, না ?

হ্যাঁ, আপনাদের বাড়ির নম্বর ৪৭—আর আমরা যে বাড়িতে ভাড়া থাকি সেটা ৫০ নম্বর।

সেই আলাপের সূত্রপাত। ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা তারপর।

হঠাৎ চমক ভাঙল নির্মলের, একটা কালো রঙের পুলিস ভ্যান প্রমীলাদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে। এ সময়ে ওদের বাড়ির সামনে পুলিস ভ্যান, কি ব্যাপার ! নির্মলের মনের মধ্যে যেন তার অজ্ঞাতেই একটা বিদ্যুৎ-চমক খেলে যায়।

একটু আগে শিবেনের ফোনের কথাগুলো মনে পড়ে গেল, প্রমীলা সুইসাইড্ করেছে !

পুলিস ভ্যানটা থেকে একজন ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিস অফিসার নামলেন। চকিতে সম্ভব অসম্ভব অনেক কথাই মনের মধ্যে আনাগোনা শুরু করে দেয় যেন নির্মলের ততক্ষণে।

প্রমীলা সুইসাইড করেছে ?

প্রমীলাদের বাড়িতে মানুষজন খুব বেশী নেই। প্রমীলার মা বাবা প্রমীলা ও তার দুই ভাই—সুধীরঞ্জন ও প্রিয়রঞ্জন।

সুধী ওর বড়। বি-কম পাস করার পর ওর বাবা নিরঞ্জনবাবুই তাঁর অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। খুব অমায়িক ও রসিক মানুষ সুধীরঞ্জন। আর প্রিয়রঞ্জন এবার হায়ার সেকেণ্ডারী দেবে। প্রমীলাদের বাড়িতে নির্মলের যথেষ্ট যাওয়া-আসা আছে। প্রমীলাও মধ্যে মধ্যে তাদের বাড়িতে আসে।

দোতলা আর তিনতলাটা নিরঞ্জনবাবু ভাড়া নিয়েছেন, আর একতলায় খান-তিনেক দোকানঘর। দোকানগুলো এখনও খোলেনি। আর এত সকালে খোলবার কথাও নয়। কাজেই পুলিস যদি এসে থাকে তো প্রমীলাদের ওখানেই এসেছে !

নির্মল তাড়াতাড়ি একটা শার্ট গায়ে চড়িয়ে পায়জামা পরা অবস্থাতেই পায়ে চপ্পলটা গলিয়ে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

মাত্র দুটো বাড়ির পরে—

রাস্তায় এখনও কোন লোকজন দেখা দেয়নি। একটা রুটির গাড়ি মহাশ্বেতা রেস্টুরেণ্টটার সামনে দাঁড়িয়ে।

॥ দুই ॥

প্রমীলাদের বাড়িতে ঢুকতে গিয়েই বাধা পেল নির্মল।

বাধা দিল একজন পুলিস সার্জেণ্ট।

কাকে চান?

প্রমীলার সঙ্গে একবার দেখা করব—

প্রমীলা!

হ্যাঁ, প্রমীলা চক্রবর্তী। আমরা ইউনিভারসিটিতে একসঙ্গে পড়ি।

একসঙ্গে পড়েন—তা আপনি বুঝি এই পাড়াতেই থাকেন?

হ্যাঁ, এই তো দুটো বাড়ি পর—কিন্তু এ বাড়িতে কি হয়েছে?

একটি মেয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা—সুইসাইড্ করেছে।

সুইসাইড্ করেছে! কে? কে সুইসাইড্ করেছে - প্রমীলা? বিস্ময়ে যেন অভিভূত, প্রশ্নটা আপনা হতেই বের হয়ে আসে নির্মলের কণ্ঠ হতে। এবং সে কিছু বলবার আগেই প্রমীলার বড় ভাই সুধীরঞ্জনের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—দরজার উপরেই দাঁড়িয়ে সুধীরঞ্জন, কেমন যেন বিহ্বল, বিভ্রান্ত।

এই যে নির্মল! প্রমীলা আত্মহত্যা করেছে—

আত্মহত্যা করেছে! কখন—কবে?

কাল রাত্রে। কেন আত্মহত্যা করল জান কিছু তোমরা? তোমরা মানে তার ক্লাসের বন্ধুরা—

সুধীরঞ্জনের কথা শেষ হল না—

ইনি কে?

হঠাৎ ঐ সময় পাশ থেকে থানা-অফিসার চিত্তপ্রিয় মুখার্জীর গলার স্বর শুনে সুধীরঞ্জন ফিরে তাকাল। কখন ইতিমধ্যে চিত্তপ্রিয় মুখার্জী পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছেন জানতেও পারেনি ওরা।

চিত্তপ্রিয় মুখার্জী মাত্র কয়েক মাস হল ঐ এলাকার থানার ইনচার্জ হয়ে এসেছেন। বয়স বেশী নয়—উনত্রিশ-ত্রিশ হবে।

ও মানে – আমার বোন প্রমীলার ক্লাসফ্রেণ্ড নির্মল, এ-পাড়াতেই থাকে।

তখন চিত্তপ্রিয় মুখার্জী নির্মলকে ভিতরে ডাকলেন।

তা কখন জানা গেল যে, প্রমীলা সুইসাইড্ করেছে? সুধীবাবু, আপনি কখন জানতে পারলেন ব্যাপারটা? প্রশ্নটা করে তাকাল নির্মল প্রমীলার দাদার মুখের দিকে।

জবাব দেয় চিত্তপ্রিয়। বলল, ব্যাপারটা একটু peculiar নির্মলবাবু।

Peculiar! কি রকম?

কোন বিষের ক্রিয়াতেই মৃত্যু হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। তবে এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ আত্মহত্যার আগে চিঠিপত্র লিখে যায়, সেরকম কিছুই পাওয়া যায়নি।

কোন চিঠিপত্র প্রমীলা লিখে যায়নি ?

না। আর তার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল না, ভেজানো ছিল মাত্র।

কখন জানা গেল ব্যাপারটা ?

কথা বলল এবারে আবার সুধীরঞ্জনই। বলল, সবার আগে বাড়িতে ওই বরাবর ওঠে। তারপর চা তৈরী করে নিজে খায় ও আমাকে দেয় এক কাপ। আমি শেষরাত্রের দিকে উঠে সামনের পার্কটায় দৌড়তে যাই। ফিরে আসি পাঁচটা নাগাদ। এসে দেখি ওর চা তৈরী হতে আর বেশী দেরি নেই। প্রতিদিনই। কিন্তু আজ ফিরে এসে দেখি ওর ঘরের দরজা তখনও বন্ধ। সাড়ে পাঁচটায়ও যখন উঠল না, তখন ওকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকি, ভেবেছিলাম হয়ত এখনও ঘুম ভাঙেনি। কয়েকবার ডাকি নাম ধরে ওর, কিন্তু সাড়া পেলাম না, তখন দরজায় ধাক্কা দিতে গিয়েই দরজা খুলে গেল।

ঘরের দরজা ধাক্কা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খুলে যেতে সুধীরঞ্জন যেন একটু বিস্মিতই হয়, কারণ প্রমীলা কখনও তার ঘরের দরজা খুলে শোয় না। ভাল করে তখনও ভোরের আলো ফোটেনি, ঘরের জানালাপথে ঝাপসা ঝাপসা আলো আসছে। সেই ঝাপসা আলোয় সুধীরঞ্জন দেখল, প্রমীলা খাটের উপর পড়ে আছে কেমন ত্যারছা ভাবে। মাথাটা ঝুলছে খাটের ধার থেকে, একটা হাতও ঝুলছে, বেণীটা গলার পাশ দিয়ে নেমে এসে ঝুলছে। বিশেষ ঐ ভঙ্গিটাই প্রমীলার সুধীরঞ্জনকে যেন চমকে দেয়। সে থমকে দাঁড়ায়।

তার মন যেন সঙ্গে সঙ্গে বলছিল কিছু একটা ঘটেছে। কিছু একটা অমঙ্গল ঘটেছে মন বললেও, মানুষের স্বভাবগত ধর্ম সেখানে প্রথমটায় অস্বীকার করবারই চেষ্টা করে। তাই সুধীরঞ্জন আরও দু'পা এগিয়ে গিয়ে ডাকে, এই প্রমী, অমন করে পড়ে আছিস কেন রে ?

কিন্তু প্রমীলার দিক থেকে কোন সাড়া পায় না।

সুধীরঞ্জন এবারে এগিয়ে গিয়ে বোনের মাথাটা তুলতে গিয়ে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেয়। সুধীরঞ্জনের আর ঘরে থাকতে সাহস হয় না। ঘর থেকে বের হয়ে আসে। নিজের ঘরে এসে কয়েকটা মুহূর্ত কেমন বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপরই সে তার ডাক্তার বন্ধু অমিতাভকে ফোন করে। অমিতাভ ফোন পেয়েই আসে এবং প্রমীলাকে পরীক্ষা করে বলে, Sorry, she is dead !

Dead—মানে মারা গেছে ?

হ্যাঁ, মনে হচ্ছে, a case of poisoning—আত্মহত্যা !

আত্মহত্যা ! প্রমীলা আত্মহত্যা করেছে ? সুধীরঞ্জন যেম কেমন বোকার মতই প্রশ্নটা করে।

হ্যাঁ সুধী, তুমি বরং এক কাজ কর—থানায় একটা ফোন করে দাও।

কেন, থানায় ফোন করব কেন ?

বুঝতে পারছ না, a case of suicide—পুলিসকে না জানিয়ে মৃতদেহের তো কোন ব্যবস্থা করতে পারবে না ! তাছাড়া কোন ডাক্তারই তোমাকে death

certificate দেবে না !

অমিতাভই থানায় ফোন করে। থানা অফিসার চিত্তপ্রিয় মুখার্জী সঙ্গে সঙ্গে চলে আসেন। থানা বেশী দূরে নয়।

তিনি এসে সব শুনে মৃতদেহ পরীক্ষা করে ডাক্তারদের সঙ্গে একমত হন।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে যায় সকাল ছটার মধ্যেই।

নির্মল সব শুনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কিন্তু সে যে ফোনে প্রমীলার মৃত্যুসংবাদটা পেয়েছে ইতিপূর্বেই সে কথা বললে না।

চিত্তপ্রিয় মুখার্জী দু-চারটে মামুলী প্রশ্ন করলেন, তারপর তাকে মুক্তি দিলেন।

নির্মল ওখান থেকে বের হয়ে এল, কিন্তু বাড়িতে গেল না। পকেটে পার্সটা আছে দেখে নিল। তারপর সোজা বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল।

শিবেন—শিবেনের সঙ্গে দেখা হওয়া এখুনি তার একান্ত প্রয়োজন।

দক্ষিণমুখো একটা ট্রামে উঠে বসল নির্মল। শিবেন থাকে কাঁকুলিয়াতে।

এদিকে চিত্তপ্রিয় মুখার্জী মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করবার জন্য তৎপর হলেন।

সুধীরঞ্জন তার ঘরের মধ্যে একটা চেয়ারে মুহ্যমানের মত বসেছিল।

কি করবে—এখন তার কি কত ব্য কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারে না।

মা-বাবা ও ছোট ভাই পুরীতে বেড়াতে গিয়েছে। সে আর পুরাতন ভৃত্য বামাচরণ বাড়িতে। বামাচরণ ওদের বাড়িতে অনেক বছর আছে। সে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

নিরঞ্জনবাবু ছেলের কাছ থেকে ট্রাংক কল পেয়ে ভুবনেশ্বরের প্লেন ধরে পরের দিনই কলকাতায় চলে এলেন। নিরঞ্জনবাবুর স্ত্রী সবিতা দেবী ঘন ঘন মূর্ছা যেতে লাগলেন।

দুই ছেলে এক মেয়ে—বিশেষ করে মেয়ে জন্মাবার পরই অফিসে পদোন্নতি হওয়ায় প্রমীলাকে সন্তানদের মধ্যে বোধ হয় একটু বেশীই ভালবাসতেন নিরঞ্জনবাবু।

তা ছাড়া সন্তানদের মধ্যে লেখায়-পড়ায় প্রমীলা বেশী ভাল ছিল বলে তার প্রতি নিরঞ্জনবাবুর একটু বেশী পক্ষপাতিত্বও ছিল বোধ হয়। প্রমীলার কখনও কোন দোষই তাঁর চোখে পড়ত না। প্রমীলার সাত বছরের ছোট ভাই প্রিয়রঞ্জন তো দিদির একজন অন্ধ ভক্ত ছিল। তার যত আদর-আবদার ছিল ঐ দিদির কাছে। দুইজনের মধ্যে যেমন ছিল ভাব তেমনি ভালবাসা।

বছর চোদ্দ বয়স প্রিয়রঞ্জনের। সামনের বার হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দেবে। প্রিয়রঞ্জন দিদির আত্মহত্যার সংবাদে একেবারে যেন গুম হয়ে গিয়েছিল।

সমস্ত দিনটা সে বাড়ি থেকেই বেরুল না।

মৃতদেহ মগ থেকে সকালে পাওয়া গিয়েছিল। সুধীরঞ্জনই তার বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে শেষ কাজটুকু করার জন্য শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল। প্রিয়কেও যেতে বলা হয়েছিল, কিন্তু সে যায়নি। সে ঘরের মধ্যে খিল দিয়ে বসেছিল।

সন্ধ্যার দিকে ঘর থেকে বেরুল প্রিয়রঞ্জন। তারপর বাড়ি থেকে বের হয়ে অন্যমনস্ক ভাবে রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একজনের কথা তার মনে হল, কিরীটী রায়।

কিরীটী রায় ঐ সময় ওদের পাড়াতেই থাকত। তখনও গড়িয়াহাটায় বাড়ি করে কিরীটী উঠে যায়নি।

কিশোর বয়েসের কৌতূহলে সে নিজে যেচে গিয়ে কিরীটীর সঙ্গে আলাপ করেছিল এবং প্রায়ই কিরীটীর ওখানে সে যেত।

বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণোচ্ছল ঐ কিশোরটিকে কিরীটীর খুব ভাল লাগত। এবং প্রিয় তার বাড়িতে গেলে কিরীটী বসে বসে গল্প করত প্রিয়রঞ্জনের সঙ্গে।

কিরীটীর কথা মনে হতেই প্রিয়রঞ্জন কিরীটীর বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। সবে তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে।

গ্রীষ্মকাল। সারাটা দিন অসহ্য গরম গিয়েছে। কিরীটী দোতলায় নিজের বসবার ঘরে বসে কৃষ্ণার সঙ্গে গল্প করছিল। প্রিয়রঞ্জন এসে ঘরে ঢুকল।

কিরীটী ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে বলে ওঠে, এই যে প্রিয়বাবু, কটা দিন দেখিনি যে! কিন্তু কিরীটীর কথা শেষ হল না, সে প্রিয়রঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললে, কি ব্যাপার প্রিয়বাবু, তোমাকে যেন একটু চিন্তিত ও অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে—এতদিন আসোও নি!

আমি এখানে ছিলাম না কিরীটীবাবু—

কোথায় গিয়েছিলে?

পুরী। তারপরই একটু থেমে বললে, জানেন কিরীটীবাবু, দিদি মারা গেছে—

কৃষ্ণা বললে, মারা গেছে! কবে? কি হয়েছিল?

গতকাল। পুলিস বলছে আত্মহত্যা, কিন্তু—

কিন্তু কি প্রিয়বাবু? কিরীটী শুধাল।

আমার মনে হয় আত্মহত্যা নয়, দিদি আত্মহত্যা করেনি—

তবে?

কেউ তাকে হত্যা করেছে বিষ দিয়ে—

বিষ দিয়ে হত্যা করেছে!

নিশ্চয়ই তাই। নচেৎ দিদি কি একটা চিঠিও অন্ততঃ লিখে রেখে যেত না যে সে আত্মহত্যা করছে! আর দিদি আত্মহত্যা করবে আমি ভাবতেই পারি না!

কেন? কিরীটী প্রশ্নটা করে প্রিয়রঞ্জনের মুখের দিকে তাকাল।

কেন করবে বলুন! আপনিই তো কত সময় বলেছেন, বিনা কারণে কেউ কখনও আত্মহত্যা করে না!

॥ তিন ॥

কিরীটী বললে, তা তো ঠিকই—কিন্তু—

কি ?

হয়তো এমন কোন কিছু ঘটেছিল, যাতে তোমার দিদি—

না কিরীটীবাবু, দিদি এতটুকু খেয়ালী বা ভাবপ্রবণ ছিল না। তা ছাড়া দিদি বলত, ভীরু আর দুর্বলেরাই আত্মহত্যা করে। আর কিছু ঘটার কথা বলছেন, কি এমন তার ঘটতে পারে—হাসিখুশি, কৌতুকপ্রিয়, আমুদে—পড়াশুনা নিয়ে সর্বদা থাকত দিদি, আপনি তো জানেন।

ব্যাপারটা আসলে সব খুলে বল তো প্রিয়বাবু—

প্রিয়রঞ্জন যা ভাবছিল সব বলে গেল অতঃপর কিরীটীকে।

সব শুনে কিরীটী বললে, তোমার কথাই যদি সত্য বলে মেনে নিই প্রিয়বাবু যে তোমার দিদি আত্মহত্যা করেনি, কেউ তাকে কৌশলে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছে, তাহলে অনেকগুলো প্রশ্ন আমাদের সামনে দেখা দেয়—

কি প্রশ্ন ?

প্রথমতঃ এই, যদি কেউ তাকে বিষ দিয়ে হত্যাই করে থাকে, সে বিষ তার প্রতি প্রয়োগ করা হল কি করে ? একজন মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা সজ্ঞানে তো আর বিষপ্রয়োগ করা চলে না !

তা যায় না, তবে যদি সে না জেনে সে বিষ খেয়ে থাকে—

ঠিক। তা হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে কিছু পানীয় বা খাদ্যবস্তুর সঙ্গে নিশ্চয়ই সেই মারাত্মক বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং সেই খাদ্যবস্তু বা পানীয় প্রমীলা দেবী না জেনে খেয়েছিলেন ! কিন্তু সেক্ষেত্রেও একটা ভাববার আছে—

কি ?

যে সেই বিষ খাদ্যবস্তু বা পানীয়ের সঙ্গে দিয়েছিল, সেই ব্যক্তি তোমার দিদির নিশ্চয়ই পরিচিত একজন কেউ ছিল !

কি বলতে চান আপনি ?

আচ্ছা প্রিয়বাবু—

বলুন !

তোমার দিদির ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা বান্ধবীদের মধ্যে সকলকেই হয়ত তুমি চেন, তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই তাহলে এমন কেউ ছিল যার প্রয়োজন হয়েছিল তার পথ থেকে তোমার দিদিকে সরানো বা কেউ তাদের মধ্যে বিদ্বেষের বশে ঐভাবে তোমার দিদিকে হত্যা করেছে—যদি অবশ্য হত্যাই হয়ে থাকে, মানে তোমার কথাটা সত্য বলে মেনে নেওয়া হয় যদি—

দিদির বন্ধু-বান্ধবীদের সকলকে আমি চিনি না, তবে কয়েকজনকে জানি যারা আমাদের বাসায় আসত মধ্যে মধ্যে—

প্রশ্নটা আমি করেছি কেন জান ?

কেন ?

কারণ তোমার কথাই যদি সত্য হয়, তোমার দিদির অজ্ঞাতেই কেউ তাকে বিষপ্রয়োগ করে থাকে, তা হলে সে ব্যক্তির যে কেবল তোমার দিদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাই ছিল তাই নয়, তোমাদের ওখানে তার আসা-যাওয়া তো ছিলই, উপরন্তু চট্ করে তার উপরে সন্দেহ পড়বারও কথা নয়—

কিরীটীবাবু, আমিও ঐ দুর্ঘটনার পর থেকে ঐ কথাটাই ভাবছি। আর সেই কারণেই আপনার কাছে আমি এসেছি। আমার মন বলছে, দিদিকে কেউ হত্যাই করেছে এবং দিদির হত্যাকারীকে যদি কেউ খুঁজে বের করতে পারে তো সে একমাত্র আপনিই। কিরীটীবাবু, আপনি একটু চেষ্টা করলেই জানতে পারা যাবে সত্যি ব্যাপারটা !

ঠিক আছে প্রিয়বাবু, তুমি কাল এস। আজকের রাতটা আমাকে একটু ভাবতে দাও।

প্রিয়রঞ্জন চলে যেতে কৃষ্ণা বললে, আহা বেচারী ! দিদিকে ও খুব ভালবাসতো, বড্ড মুষড়ে পড়েছে।

কিরীটী বললে, খুবই স্বাভাবিক কৃষ্ণা। কথাটা বলে কিরীটী পাশ থেকে পাইপটা তুলে নিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করলে।

কৃষ্ণা উঠে পড়ল। রাতের রান্নার সব ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে ঘরে এসে ঢুকে দেখে সোফাটার উপরে হেলান দিয়ে চোখ বুজে আছে কিরীটী। ঘর অন্ধকার।

ঘরের আলোটা সুইচ টিপে জেবলে দিয়ে স্বামীকে ঐ অবস্থায় চোখ বুজে একান্ত নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকতে দেখে কৃষ্ণা বললে, কি ব্যাপার, আলোটা জ্বালাওনি ? অমন চুপচাপ বসে আছ ?

কে, কৃষ্ণা ! বসো—

মনে হচ্ছে যেন কিছু ভাবছ ! প্রিয়বাবুর কথাই ভাবছিলে নাকি ?

কারো কোন ভালবাসার ও প্রিয়জনের দুর্ঘটনা ঘটলে, তার অজ্ঞাতেই তার মনের মধ্যে অনেক সময় সত্য এসে উঁকি দেয় কৃষ্ণা ! তাই ভাবছিলাম—

কি ?

প্রিয়বাবুর মনের মধ্যে যে সন্দেহটা উঁকি দিচ্ছে সেটা হয়ত মিথ্যা নয়—কিরীটীর কথা শেষ হল না, ঘরের কোণে ফোনটা বেজে উঠল।

কিরীটী উঠে গিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল, কিরীটী রায়—

আমি চিত্তপ্রিয়। মিঃ রায়, টালীগঞ্জ থানা থেকে বলছি।

কি ব্যাপার, মুখার্জী ?

আপনি নিরঞ্জনবাবুর ছোট ছেলে প্রিয়রঞ্জনকে চেনেন ?

হ্যাঁ, ছেলেটি আমার এখানে প্রায়ই আসা-যাওয়া করে। কেন, কি ব্যাপার বল তো ?

একটু আগে সে এসেছিল থানায়—

কেন ?

আপনি তো শুনেছেন ওর মুখেই, গত পরশু ওর দিদি প্রমীলা সুইসাইড্ করেছে বিষ খেয়ে, স্টমাক কণ্টেণ্টের রিপোর্টও আজ পেয়েছি—হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড্ বিষ পাওয়া গিয়েছে। তা প্রিয়রঞ্জন আমাকে বলছিল, এটা নাকি আত্ম-হত্যা নয়—মার্ডার, আপনাকেও নাকি সেকথা সে বলেছে—

তাই বলছিল—

পাগল ! A simple case of suicide—

মুখার্জী ?

বলুন !

তোমার casereport আর postmortem reportটা আমাকে একবার দেখাবে ?

কেন দেখাব না ? আপনি দেখতে চান কি—কিন্তু সত্যিই কি ব্যাপার বলুন তো ?

ব্যাপারটায় আমি যেন একটু interest পাচ্ছি—তুমি কি এখন থানায় থাকো, গেলে দেখা হবে ?

হ্যাঁ আছি, আসুন না।

ঐ এলাকার থানা-অফিসার হয়ে আসার পরই চিত্তপ্রিয় কতকটা যেচে গিয়ে কিরীটীর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন এবং আলাপ করে খুশিই হয়েছিলেন। আলাপ হবার পর মধ্যে মধ্যে পরামর্শের জন্যও চিত্তপ্রিয় কিরীটীর ওখানে গিয়েছেন।

আধঘণ্টার মধ্যেই কিরীটী থানায় এল।

সম্পূর্ণ কেসের fileটা চিত্তপ্রিয় কিরীটীর সামনে ধরে দিলেন।

চিত্তপ্রিয় মুখার্জী খুব methodical officer। কোন কিছুর তদন্তে গেলে খুব খুঁটিয়ে তদন্ত করাই তাঁর অভ্যাস।

প্রমীলা চক্রবর্তীর মৃত্যুর তদন্ত করতে গিয়েও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

মৃতদেহ ও অকুস্থানের খুঁটিনাটি বর্ণনা, কিছুই তাঁর রিপোর্টে বাদ যায়নি। মৃতদেহের গোটাকয়েক বিভিন্ন অ্যাংগেল থেকে ফটোও তুলে নিয়েছেন।

ফটোগুলো দেখতে দেখতে একসময় কিরীটী বললে, মুখার্জী, হঠাৎ তুমি মৃতদেহের এই ফটোগুলো তুলতে গেলে কেন ? তোমার মনেও কি তাহলে সন্দেহ-টা কোন সময় জেগেছিল যে কেসটা suicide না হয়ে homicideও হতে পারে ?

মিথ্যা বলব না মিঃ রায়, তা জেগেছিল—

কেন বল তো ? মৃতদেহের position দেখেই কি ?

মৃতদেহের position দেখে তো বটেই, তাছাড়াও আরও ছিল কিছু মিঃ রায়, যেমন ঐ সময় ঐ বাড়িতে প্রমীলা, তার বড় ভাই সুধীরঞ্জনবাবু ও পুরনো চাকর প্রৌঢ় বামাচরণ ছাড়া আর কেউ ছিল না, ঐ ঘটনার দিন বিকেল চারটে নাগাদ সে যখন বাড়ি আসে। সুধীরবাবু পরদিন ভোর চারটে নাগাদ দৌড়তে যাবার

সময় সদর দরজাটা খোলাই দেখতে পায়, যদিও রাত সাড়ে এগারটা নাগাদ সে বাড়ি এলে ঐ বামাচরণই তাকে দরজা খুলে দেয় ও পরে বন্ধ করে দেয়। বিশেষ করে প্রমীলার ঘরের দরজাটা ও সদর দরজাটা খোলা থাকা—এই দুটোই আমার মনে কিছুটা সংশয় জাগিয়েছিল।

আর কিছু অসঙ্গতি তোমার মনে হয়নি, মুখার্জী?

না। কিন্তু কেন বলুন তো?

মানে পরের দিন সকালে সুধীরঞ্জন তার বোনকে ডাকতে গিয়ে দেখে তার ঘরের দরজাটা খোলা—ভেজানো রয়েছে! অথচ দরজা বন্ধ করে শোবারই তার অভ্যাস ছিল শুনলাম!

এমনও তো হতে পারে সেরাত্রে প্রমীলা ঘরের দরজাটা কোন কারণে বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল শোবার আগে—

না মুখার্জী, তা নয়। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতাই বলে, কেউ আত্মহত্যা করবার decision একবার নিলে, সে বাকি কাজটুকু ধীরেসুস্থে করে। মানে শেষ কাজটুকু সে তখন একটা যেন trance-এর মধ্যেই করে যায়। কাজেই দরজা বন্ধ করবার কথাটা ভুলে যাওয়া প্রমীলার পক্ষে ঠিক যেন গ্রহণীয় মনে হচ্ছে না—

তবে কি—

কি তবে?

মানে বলছিলাম, ব্যাপারটা কি তবে আত্মহত্যা নয় বলেই আপনার মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ মুখার্জী, যত ব্যাপারটা আমি ভাবছি আমার মনে হচ্ছে যেন it was not a case of suicide!

মানে মার্ডার—কেউ তাকে হত্যা করেছে বিষপ্রয়োগে?

হ্যাঁ, কিন্তু—

কিন্তু?

জানি তুমি হয়ত বলবে, কিভাবে কখন তাহলে তাকে বিষপ্রয়োগ করা হয়েছিল, অবশ্যই সেটা হয়ত তোমরা জানতে পারবে আরও অনুসন্ধান চালালে, তবে একটা কাজ তুমি ভাল করেছ—পরিবারের খুঁটিনাটি নোট করে, মৃতের বিভিন্ন অ্যাংগেল থেকে কয়েকটা ফটো তুলে রেখে। শোন মুখার্জী, তোমার কেস-রিপোর্টটা একবার রাত্রির মত আমি নিয়ে যেতে চাই, তোমার কোন আপত্তি নেই তো?

না, আপত্তি কিসের! নিয়ে যান।

।। চার ।।

রাত্রে আহারাদির পর কিরীটী তার বসবার ঘরে একটা সোফার উপরে বসে প্রমীলার কেস-রিপোর্টটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছিল দ্বিতীয়বার। প্রথম দফায় থানায় বসে কিছুটা আলগাভাবেই কেস-রিপোর্টটা পড়ে মনে হয়েছিল, প্রিয়রঞ্জনের সন্দেহটা হয়ত অমূলক নয়—প্রমীলা আত্মহত্যা করেনি, তাকে সম্ভবতঃ হত্যাই করা হয়েছে তীব্র হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বিষপ্রয়োগে এবং কথাটা মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটীর সত্যানুসন্ধান শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রমীলার স্টমাক কণ্টেণ্ট অ্যানালিসিস্ করে নাকি হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বিষ পাওয়া গিয়েছে—

প্রমীলা ইউনিভারসিটির ছাত্রী ছিল। কেমিস্ট্রিতে এম. এস-সি পড়ছিল। এবং কিছু তার ছেলেবন্ধু ছিল। বিশেষ করে প্রমীলার দাদা সুধীরঞ্জনের জবানবন্দি থেকে তার যে তিনজন বন্ধুর নাম পাওয়া গিয়েছে—যেমন শিবেন, নির্মল ও তপনজ্যোতি—তারাও এম. এস-সির ছাত্র কেমিস্ট্রিতে।

প্রথমতঃ এ তিনজন প্রমীলার অনেক বছরের সহপাঠী। সেই সূত্রেই হয়ত ওদের পরস্পরের মধ্যে ভাব ও ঘনিষ্ঠতা কিছুটা গড়ে উঠেছিল। এমনও তো হতে পারে, কিরীটীর মনে হয়, ঐ তিনজনের কারও সঙ্গে প্রমীলার ঘনিষ্ঠতা বিশেষ একটা পর্যায়ে পেঁছেছিল। মৃত্যুর কোন সূত্র হয়ত সেখানেও জট পাকিয়ে থাকতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ওদের তিনজনেরই প্রমীলাদের গৃহে গতিবিধি ছিল। সেদিক দিয়ে মধ্যে মধ্যে ওরা প্রমীলার গৃহে যাতায়াত করলে কোনরকম সন্দেহ সেখানে সহজে না আসারই কথা কারো মনে।

তৃতীয়তঃ প্রমীলার মত মেয়ের মনের মধ্যে যদি কোনরকম দ্বন্দ্ব জেগেই থাকত ওদের কাউকে ঘিরে (এবং যেটা এক্ষেত্রে জানা একান্ত প্রয়োজন), তাই হলেই বা প্রমীলা হঠাৎ আত্মহত্যা করতে যাবে কেন? বিশেষ করে প্রিয়রঞ্জন তার দিদি সম্পর্কে যা বলেছে তাকে, তাতে করে ব্যাপারটার সম্ভাবনা খুবই কম।

চতুর্থতঃ মৃতদেহের পজিশন—খোলা ঘরের দরজা ও পরের দিন সকালে খোলা সদর দরজাটা, বাড়িতে মাত্র তিনজনের উপস্থিতি—সমগ্র ব্যাপারটা যেন হত্যার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।

পরের দিন সকালেই কিরীটী রিপোর্টটা জংলীর হাত দিয়ে থানায় চিত্তপ্রিয়র কাছে পাঠিয়ে দিল। কোথাও বের হল না সারাটা দিন। সন্ধ্যার মুখে প্রিয়রঞ্জন এল।

এস প্রিয়বাবু!

আপনি বলেছিলেন আজ আসতে—

হ্যাঁ, বস। তুমি ঠিকই বলেছিলে প্রিয়বাবু, ব্যাপারটা মনে হচ্ছে আত্মহত্যা নয়—

আপনি—মানে আপনারও তাহলে ধারণা যে আমার দিদিকে হত্যাই করা

হয়েছে!

হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে আমিও একমত।

কৃষ্ণা ঘরে এল ঐ সময়, তার দু'হাতে কাঁচের গ্লাসে ঠাণ্ডা বেলের সরবৎ। হঠাৎ ঐ সময় প্রিয়রঞ্জন গ্লাসে বেলের সরবৎ দেখে বলে উঠল, কিরীটীবাবু, আপনাকে একটা কথা বোধ হয় আমার বলা প্রয়োজন—

কিরীটী গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বললে, নাও বেলের সরবৎটা আগে খেয়ে নাও, তারপর কথা হবে।

কৃষ্ণার হাত থেকে সরবতের গ্লাসটা নিয়েও চুমুক দিল না প্রিয়রঞ্জন, সেটা সামনের টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললে, দিদি যেদিন মারা যায়, অর্থাৎ সেই দুর্ঘটনার দিন দিদি চারটের সময় বাড়ি আসার ঘণ্টাখানেক পরে নির্মলদা আমাদের বাড়িতে আসে—

জানলে কি করে কথাটা? কিরীটীর প্রশ্ন।

আমাদের বাড়ির যে পুরানো চাকর—বামাচরণদা, সে-ই গতকাল রাত্রে আমাকে বলছিল। কেবল নির্মলদাই নয়, দিদির কাছে আরও একজন এসেছিল সেরাত্রে—

কে সে?

বিকেল থেকে বামাচরণদার জ্বর-জ্বর হয়েছিল বলে নীচে নিজের ঘরে শুয়েছিল। তখন কত রাত ঠিক বামাচরণদা বলতে পারল না, কলিং বেল বাজতে সে উঠে গিয়ে সদর খুলে দেয় এবং সিঁড়ির প্যাসেজের আলোটা আগের দিন রাত্রে যে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তা সে জানত না, কাজেই অন্ধকারে কে এল তাকে স্পষ্ট দেখতে পায়নি, তবে তার গলার স্বর শুনে ওর মনে হয়েছিল তপনদা—দিদির আর একজন বন্ধু তপনদা উপরে চলে যায়।

তারপর?

নির্মলদা বোধ হয় রাত দশটা নাগাদ চলে যান। বামাচরণদা টের পেয়েছিল, কারণ দিদি এসেছিল নীচে দরজা বন্ধ করে দিতে।

আর তপনবাবু, তিনি কখন যান?

বামাচরণদা বলতে পারে না—

আচ্ছা সেরাত্রে তোমার দাদা সুধীবাবু কখন বাড়ি ফেরেন প্রিয়বাবু?

দাদা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ফিরে আসে।

তাকে কে দরজা খুলে দিয়েছিল?

বামাচরণদা।

পরের দিন যে সকালবেলা সদর দরজাটা খোলা ছিল সে সম্পর্কে বামাচরণ কিছু জানে?

বামাচরণদা তো কিছু বলেনি সে সম্পর্কে!

বামাচরণ কিছু বলেনি?

না। আমিও জিজ্ঞাসা করিনি—

প্রিয়বাবু !

বলুন ?

বামাচরণ এখন কি করছে ?

জ্বর হয়েছে, শুয়ে আছে। জানেন কিরীটীবাবু, আপনার এখানে যখন আসছি, পথে নির্মলদার সঙ্গে দেখা। নির্মলদা আমাকে দেখতে পেয়ে, কেমন যেন আমার মনে হয়, পালিয়ে গেল।

কেন, পালিয়ে যাবে কেন ?

মনে হল তাই বললাম—

নির্মলবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার, হয়ত অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য তিনি আমাদের দিতে পারবেন !

যাবেন—দেখা করবেন ? নির্মলদাকেও দেখে এলাম বাড়িতেই ঢুকলেন, এখন হয়ত বাড়িতেই আছেন, যাবেন তাঁর বাড়িতে ?

চল। একবার দেখাই যাক—যদি দেখাটা হয়ে যায়, কিছু জানতে পারা যায় !

নির্মলদের বাড়ির নীচের বৈঠকখানায় বসতে বলেছিল প্রিয়রঞ্জন, কিন্তু কিরীটী বললে, না, আমি নীচের রাস্তায় অপেক্ষা করছি, তুমি যাও। পার তো নির্মল-বাবুকে নিয়ে এস।

প্রিয়রঞ্জন দোতলায় নির্মলের ঘরে গিয়ে কিরীটীর কথা বলতেই সে বললে, সে কি, রাস্তায় তাঁকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছ কেন ? নীচের বৈঠকখানায় বসাতে পারলে না !

বলেছিলাম কিন্তু এলেন না, রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিন্তু কি ব্যাপার বল তো প্রিয়, উনি হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা করতে চান কেন ?

তা তো জানি না। আজই বলছিলেন আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চান। তাই নিয়ে এসেছি।

হুঁ। আচ্ছা চল। নির্মল একটা শার্ট গায়ে চাপিয়ে স্যাণ্ডেলে পা গলিয়ে নীচে নেমে এল।

রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়েছিল কিরীটী। নির্মল বললে, শুনলাম প্রিয়র কাছে আপনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান, আসুন বাড়ির মধ্যে।

না নির্মলবাবু, বরং আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো চলুন না বড় রাস্তার ধারে পার্কটায় গিয়ে বসা যাক।

পার্কে ? বেশ, চলুন।

তিনজনে পার্কে এসে একটা বেঞ্চিতে বসল।

রাত প্রায় পৌনে আটটা হবে। গ্রীষ্মের রাত্রির পৌনে আটটা—সন্ধ্যা বললেও চলে। পার্কে তখনও অনেক লোক। যে বেঞ্চটায় ওরা বসল সে

জায়গাটা একটু অন্ধকার।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর নির্মলই বললে, কি বিষয়ে আপনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান বলুন তো কিরীটীবাবু? নির্মলের কণ্ঠস্বরে খানিকটা দ্বিধা ও খানিকটা উৎকণ্ঠা যেন প্রকাশ পায়।

আচ্ছা নির্মলবাবু, প্রিয়রঞ্জনের দিদি প্রমীলা দেবী তো আপনার সহপাঠী ও বিশেষ পরিচিত ছিলেন?

হ্যাঁ, কিন্তু সেকথা কেন?

আচ্ছা তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারটা আপনার কি মনে হয়?

নিশ্চয় শুনেছেন, প্রমীলা আত্মহত্যা করেছে—

পুলিসের কিন্তু ধারণা তা নয়—

তাই নাকি?

হ্যাঁ। তাদের ধারণা কেসটা সুইসাইড নয়—হোমিসাইড। হত্যা করা হয়েছে তাঁকে।

সে কি! এ আপনি কি বলছেন কিরীটীবাবু?

শুধু পুলিসের নয়, আমাদের—এই প্রিয়বাবু ও আমারও ধারণা তাই, তাঁকে brutally murder করা হয়েছে!

না না—absurd! হতেই পারে না। তাকে কে আবার হত্যা করতে যাবে? আর কেনই বা হত্যা করবে? It is fantastic!

কে হত্যা করতে পারে তাঁকে আর কেনই বা হত্যা করেছে সেটা যদিও অবিশ্যি এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি, তাহলেও হত্যাকারীকে ধরা দিতেই হবে। যাক সেকথা, আপনার সঙ্গে তো তাঁর পরিচয় ও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল—আর শুধু তাই নয়, পুলিস জানতে পেরেছে দুর্ঘটনার রাত্রে আপনি তাঁর ওখানে রাত দশটা পর্যন্ত ছিলেন—

কে—কে বললে সেকথা? কার কাছ থেকে পুলিস কথাটা জানল?

তারা জেনেছে। আর কথাটা যে মিথ্যা নয় সে তো আপনিও স্বীকার করলেন!

নির্মল একেবারে চুপ। কয়েকটা মুহূর্তের জন্য একটা স্তব্ধতা।

নির্মলবাবু! কিরীটী তার প্রশ্নটার আবার পুনরাবৃত্তি করল, বেলা পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আপনি প্রমীলার বাড়ি যান, তাই না?

হ্যাঁ।

কতক্ষণ ছিলেন?

রাত সাড়ে দশটার কিছু পরে চলে যাই—

সেরাত্রে আর কেউ প্রমীলার ওখানে গিয়েছিল কি?

হ্যাঁ, তপনজ্যোতি। সে রাত সাতটা নাগাদ এসেছিল—

তপনবাবু কখন চলে যান?

রাত দশটা নাগাদ।

তারপর তাহলে আপনি যান—

হ্যাঁ।

দরজা বন্ধ করতে প্রমীলা কি আপনার সঙ্গে নীচে এসেছিলেন ?

না—না তো !

তবে কে দরজা বন্ধ করল ?

প্রমীলা বলেছিল সে-ই একটু পরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবে—

কেন—বামাচরণকে বললেন না কেন সদর দরজাটা বন্ধ করে দিতে ?

তার জ্বর হয়েছিল। সে ঘরে শুয়েছিল—

বাড়ির সদর দরজাটা অত রাত্রে অমন অরক্ষিতভাবে রেখে চলে গেলেন ?

প্রমীলাকে কথাটা বলেছিলাম, কিন্তু সে বললে কোন ক্ষতি হবে না।

আপনি যখন চলে আসেন, তখন প্রমীলা কি করছিলেন ?

সে রাত্রে স্নান করত, বাথরুমে স্নান করতে ঢুকেছিল তখন।

Was she expecting someone else that night ?

অত রাত্রে কাকে আবার সে expect করবে ! বোধ হয় তখনও তার দাদা সুধীবাবু ফেরেননি, তাই দরজাটা সঙ্গে সঙ্গে নীচে গিয়ে বন্ধ করেনি—

নির্মলবাবু, একটা কথা—প্রমীলার উপরে আপনার কোন দুর্বলতা, মানে—

ভালবাসতাম কিনা তাই জিজ্ঞেস করছেন তো ?

হ্যাঁ।

না। আমার কোন দুর্বলতাই তার প্রতি ছিল না।

আপনাদের আর দুই সহপাঠী—শিবেনবাবু ও তপনজ্যোতিবাবু ?

বলতে পারব না—

আচ্ছা প্রমীলা দেবীর হত্যার ব্যাপারে কাউকে আপনি সন্দেহ করেন ?

না, তা ছাড়া তাকে হত্যা করা হয়েছে কথাটা এখনও আমার কাছে রীতিমত অবিশ্বাস্য বলেই মনে হচ্ছে।

আর একটা কথা, সেদিন অত সকালে হঠাৎ আপনি প্রমীলাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন কেন ?

একটু যেন চুপ করে থেকে নির্মল বললে, ব্যাপারটা rather একটু funny—

কি রকম ?

সকালবেলা হঠাৎ শিবেন আমাকে ফোন করে বলে, তাকে নাকি একটু আগে আমি ফোন করে বলেছি প্রমীলা আত্মহত্যা করেছে। অথচ আমি সকালে কাউকে ফোনই করিনি।

তা কি জবাব দিলেন তাঁকে ?

ঐ কথাই বললাম। বললাম ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু ফোন ছেড়ে দেওয়ার পরও কথাটা যেন আমি ভুলতে পারলাম না, আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল—

তারপর ?

ঐ সময় বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই নজরে পড়ল প্রমীলাদের বাড়ির

সামনে একটা কালো পুলিস ভ্যান দাঁড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই যেন আমার একটু শিবেনের ফোনের কথাটা মনে পড়ল। প্রমীলা সুইসাইড করেছে! আমার মনের মধ্যে কি রকম একটা আশঙ্কা জাগে। আমি তক্ষুনি জামাটা গায়ে দিয়ে বের হয়ে পড়ি।

তারপর যা যা ঘটেছিল নির্মল বলে গেল কিরীটীকে।

ধন্যবাদ নির্মলবাবু, আপাতত আর আমার কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। চলুন ওঠা যাক।

কিরীটীবাবু!

বলুন?

আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে প্রমীলাকে—নির্মল কথাটা বলতে বলতে থেমে যায়।

হ্যাঁ নির্মলবাবু, তাঁকে কেউ হত্যাই করেছে। একটা কথা নির্মলবাবু—

বলুন?

শিবেনবাবু ও তপনজ্যোতিবাবুর সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই, একটু ব্যবস্থা করতে পারবেন?

কেন পারব না—কবে দেখা করতে চান বলুন?

এক কাজ করুন না, কাল বাদে পরশু একটিবার আসুন না তিন বন্ধুতে আমার বাড়িতে বিকেলে। একত্রে চা-পান করতে করতে আলাপ-আলোচনা করা যাবে। কি, অসুবিধা আছে কিছু?

না, অসুবিধা আর কি!

নির্মল পার্ক থেকে বের হয়ে অন্যদিকে হাঁটতে শুরু করল।

প্রিয়বাবু, তোমার দাদা এখন বাড়িতে আছেন বোধ হয়?

হ্যাঁ, দাদা বাড়িতেই আছে। দিদির মৃত্যুর পর দাদা খুব গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। আগে আগে ফিরত রাত দশটা সাড়ে দশটায়, এ কদিন দেখছি সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসে—

তাহলে চল, রাত এখনও খুব বেশি হয়নি—তোমার দাদার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

চলুন না!

॥ পাঁচ ॥

প্রিয়রঞ্জন মিথ্যা বলেনি। প্রমীলার আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারটা প্রিয়দের বাড়িতে সত্যিই যেন প্রত্যেকের মনে একটা প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। এবং আঘাতটা যেন সকলকে কেমন একেবারে বিমূঢ় করে দিয়েছিল। প্রমীলা যেন সংসারটার মধ্যে একটা আনন্দের মণি ছিল। তার সদাচঞ্চল হাস্যমুখর স্বভাবটার জন্য বাড়ির

প্রত্যেকেই তাকে সত্যিই ভালবাসত।

কিরীটীর সঙ্গে আলাপপ্রসঙ্গে সুধীরঞ্জন সেই কথাগুলোই বলতে বলতে এক-সময় বললে, আমি এখনও ভাবতে পারছি না কিরীটীবাবু, প্রমীলা আত্মহত্যা করল কেন—

সুধীবাবু, কথাটা আপনাকে না বললে অন্যায় হবে তাই বলছি—আমার এবং পুলিসেরও ধারণা, আপনার বোন প্রমীলা দেবী আত্মহত্যা করেননি। তাঁকে কেউ হত্যা করেছে—

কি বলছেন আপনি? না না, তা কি করে হবে? প্রমীলাকে কেউ হত্যা করেছে—

হ্যাঁ, নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে—

কিন্তু কে—কে হত্যা করবে তাকে আর কেনই বা হত্যা করবে?

সে কথাটা নিশ্চয়ই জানা যাবে- জানতে আমরা পারব। আর সেই কারণেই কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে আমি করতে চাই।

সুধীরঞ্জন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। একসময় ধীরে ধীরে বললে, বেশ। প্রিয়, তুই এ ঘর থেকে যা—

না সুধীবাবু ওর যাওয়ার দরকার নেই, ও এ ঘরেই থাকুক।

কিন্তু—

ও সব জানে সুধীবাবু। আর তা ছাড়া প্রমীলা দেবীকে যে হত্যা করা হয়েছে, কথাটা ওরই কিশোর মনে প্রথম জাগে এবং ও আমার কাছে গিয়ে সব কথা বলায় আমার মনের মধ্যেও একটা সন্দেহ দেখা দেয়, আমি ভাবতে শুরু করি—

প্রিয়—প্রিয় আপনাকে বলেছে যে প্রমীলা আত্মহত্যা করেনি—তাকে কেউ হত্যা করেছে?

হ্যাঁ। যাক আমার যা জিজ্ঞাস্য তা এবার বলি, সেরাত্রে আপনি কখন বাড়ি ফিরে আসেন?

রাত সাড়ে এগারটা নাগাদ—

কি করে বুঝলেন যে তখন রাত সাড়ে এগারটা?

উপরে এসে যখন জামাকাপড় ছাড়ছি হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখি রাত সাড়ে এগারটা—

রাত্রে কে আপনাকে দরজা খুলে দিয়েছিল?

বামাচরণদা—

আপনার ফিরতে অত রাত হয়েছিল যে সেদিন?

এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল, বামাচরণ আর প্রমীলা দুজনকেইআগে বলে গিয়েছিলাম যে ফিরতে রাত হবে আমার।

আপনি তো তিনতলার ঘরে থাকেন, সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই বাঁ-হাতি দোতলায় প্রমীলা দেবীর ঘর—সে ঘরের দরজাটা তখন খোলা ছিল না বন্ধ ছিল, মনে আছে নিশ্চয়ই আপনার!

মনে আছে বৈকি, ঘরের দরজা বন্ধ ছিল—তবে জানালা-পথে আলো দেখা

যাচ্ছিল, তাতেই ভেবেছিলাম প্রমীলা হয়ত তখনও জেগেই আছে—

ডাকেননি বোনকে বা সাড়া দেননি ?

না। অত রাত্রে আমি আর তাকে ডিস্টার্ব করিনি। কারণ ইদানীং তো পরীক্ষার জন্য রাত জেগে পড়াশুনা করত—

পরের দিন সকালে কখন ওঠেন আপনি ?

বরাবরের মত ভোর চারটেয়। উঠে দৌড়তে যাই পার্কে।

এবার মনে করে বলুন তো, ভোররাত্রে যখন পার্কে দৌড়তে যান তখন আপনার বোনের ঘরের দরজা বন্ধ ছিল কিনা ?

তাকাইনি দরজার দিকে—

জানলা-পথে রাত্রের মত আলো দেখতে পেয়েছিলেন ?

ঠিক বলতে পারব না, কারণ বোধ হয় জানলার দিকে তাকাইনি—

এবার বলুন, নীচের দরজাটা হা-হা করে খোলা ছিল, না ভেজানো ছিল ?

খোলা এবং ভেজানো ছিল।

ভেজানো ছিল !

হ্যাঁ।

তা দরজাটা খোলা আছে কেন কিছু মনে হয়নি আপনার ?

না, ভেবেছিলাম গতরাত্রে হয়ত আমি আসার পর বামাচরণদা দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছে ঘুমের ঘোরে। কারণ ও বরাবরই একটু বেশী ঘুম-কাতুরে—

তা আপনি যে অত সকালে বের হয়ে যেতেন, দরজাটা কে বন্ধ করত ?

আমিই বাইরে থেকে একটা তালা লাগিয়ে যাই বরাবর।

হুঁ। দরজাটা তাহলে আপনি ভেজানোই দেখেছিলেন ?

হ্যাঁ।

আর সকালে পার্ক থেকে ফিরে এসে প্রমীলা দেবী চা আনছেন না বলে তাঁকে ডাকতে গিয়ে দেখেছিলেন তাঁর ঘরের দরজাটা খোলা, কেবলমাত্র ভেজানো ছিল—তাই না ?

হ্যাঁ।

তাহলে প্রমীলা দেবীর শোবার ঘরের দরজা ও সদর দরজাটা—দুটোই খোলা ছিল ! নির্মলবাবু রাত সাড়ে দশটা নাগাদ চলে গিয়েছিলেন, অবিশ্যি যদি তিনি সত্য বলে থাকেন—

নির্মল ! নির্মল সেরাত্রে এসেছিল নাকি ? কই সেরকম কিছু তো সেদিন সে বললে না ! সুধীরঞ্জন বললে।

পুলিসের ভয়েই বোধ হয় বলেননি। তা ছাড়া কেবল নির্মলই নয়, আরও একজন সেরাত্রে এসেছিলেন। বামাচরণ তাঁকে দরজা খুলে দিয়েছিল—

কে সে ?

বামাচরণও অবশ্য সেকথা পুলিসের কাছে বলেনি, পরে বলেছে প্রিয়বাবুকে, সে নাকি প্রমীলা দেবীর আর এক বন্ধু, তপনজ্যোতি—

কিরীটী একটু থেমে আবার বললে, বামাচরণের সেদিন জ্বর হয়েছিল, তাই

নির্মলবাবু যখন সেরাত্রে এখান থেকে চলে যান, আপনার বোনই নীচে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কথা হচ্ছে এখন তাহলে সেরাত্রে তপনবাবু কখন চলে গিয়েছিলেন? আপনার রাত্রি সাড়ে এগারটায় ফিরবার আগে না পরে? তা ছাড়া এর মধ্যে আরও একটা কথা আছে সুধীবাবু—

কি? সুধীরঞ্জন কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

প্রমীলা দেবী রাত্রে যখন নীচে দরজা বন্ধ করতে আসেন, তখন দুজনের কথা-বার্তা বামাচরণের কানে গিয়েছিল। তাতে করে তার মনে হয়েছিল, প্রমীলার সঙ্গে সে-সময় নির্মলবাবুই ছিলেন। শুধু গলাটাই শুনেছে—চোখে দেখেনি, তিনি যে নির্মলবাবুই, অন্য কেউ নয়, তারও অকাট্য প্রমাণ আমাদের হাতে কিছু নেই।

প্রিয়রঞ্জন ঐ সময় বললে, কিন্তু নির্মলদা তো বলছিলেন যে তিনিই—

ঠিকই প্রিয়বাবু, কিন্তু নির্মলবাবুর কথাটা যে সত্যিই তারই বা প্রমাণ কি?

প্রিয়রঞ্জন বললে, কিন্তু মিথ্যে সে বলবে কেন?

নিজেকে বাঁচাতে!

তবে—তবে কিরীটীবাবু, আপনি কি মনে করেন—

প্রিয়রঞ্জনকে বাধা দিয়ে কিরীটী বললে, সেদিন রাত্রে তোমার দিদির কাছে দুজন ছিলেন প্রিয়বাবু—একজন বিকেল পাঁচটায় এসেছিলেন, তিনি নির্মলবাবু, আর দ্বিতীয়জন—তপনদা!

হতেও পারে, নাও হতে পারে—

মানে?

মানে তিনি তপনজ্যোতিবাবুও হতে পারেন বা অন্য কেউও হতে পারেন প্রিয়বাবু!

কিন্তু নির্মলদা তো বললেন যে তপনদা—

তাঁর কথা অকাট্য সত্য বলেই বা মেনে নেব কি করে? তবে এটা ঠিক, ঐ দুজনের মধ্যেই একজন তোমার দিদিকে হত্যা করেছে বিষপ্রয়োগে—

না না, কি বলছেন আপনি কিরীটীবাবু?

প্রিয়বাবু, এখনও তুমি ছেলেমানুষ—তুমি বুঝবে না, যাক সেকথা, বামাচরণকে একবার ডাক তো এ ঘরে প্রিয়বাবু!

একটু পরে বামাচরণকে প্রিয়রঞ্জন ডেকে নিয়ে এল ঘরে।

রোগা ঢ্যাঙা লোকটা। গায়ের রং মিশমিশে কালো। মাথার চুলের প্রায় দু'তিন অংশ পাকা। বয়স ষাট থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে হবে বলেই মনে হয়।

সুধীরঞ্জন বললে, বামাচরণদা, উনি যা জিজ্ঞাসা করেন তার জবাব দাও।

বামাচরণ নিঃশব্দে একবার ভীত চোখে কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

তোমার নাম বামাচরণ? কিরীটীর প্রশ্ন।

আজ্ঞে কর্তা, বামাচরণ পাড়ুই।

এ বাড়িতে তো তুমি অনেক দিন আছ?

তা কর্তা, চল্লিশ বছরেরও বেশী—

আচ্ছা বামাচরণ, যে রাত্রে তোমার দিদিমণি মারা যায়, সে রাত্রে তোমার তো জ্বর-জ্বর ভাব ছিল ?

আজ্ঞে। আগের দুদিন থেকেই শরীরটা কর্তা আমার ভাল যাচ্ছিল না, জ্বর-জ্বর ভাব একটা—

ঐদিন বিকেলের দিকে এ পাড়ার নির্মলবাবু তোমার দিদিমণির কাছে এসেছিলেন ?

হ্যাঁ।

আর কে এসেছিলেন সন্ধ্যার পর ?

দিদিমণির আর এক বন্ধু, তপনবাবু—

ঠিক তুমি চিনতে পেরেছিলে তাঁকে ? কারণ প্যাসেজের আলোটা ফিউজ হয়ে যাওয়াতে প্যাসেজে আলো ছিল না, অন্ধকারে চিনলে কি করে ? ভাল ভাবে তো তাঁকে দেখতেও পাওনি—

না, মানে মনে হয়েছিল তপনবাবুই—

মনে হয়েছিল ? তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলে ?

না।

কথাও বলোনি ?

না।

কেন ?

দিদিমণি বলেছিল, তপনবাবুর আসবার কথা আছে, তিনি এলে তাঁকে যেন উপরে পাঠিয়ে দিই। আমি ভেবেছিলাম তপনবাবুই বুঝি এসেছেন, তাঁকে আমি উপরে চলে যেতে বলি। তিনিও সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যান। আমি তখন আবার দরজাটা বন্ধ করে নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ি।

আচ্ছা বামাচরণ, তোমার দিদিমণি যখন আবার রাত্রে নীচে এসেছিলেন তপনবাবু চলে যাবার সময়, তখন তুমি তোমার দিদিমণি ও তপনবাবুরই গলা শুনেছিলে, তাই না ?

হ্যাঁ।

মানে গলা শুনে মনে হয়েছিল তোমার তপনবাবু, তাই তো ?

হ্যাঁ।

এবার বল তো, তপনবাবু কখন আসেন ? রাত তখন কটা হবে ?

নির্মলবাবু আসার বোধ হয় ঘণ্টা দুই পরে—

অত রাত্রে তপনবাবু এসেছিলেন ?

হ্যাঁ।

আর তোমার বড় দাদাবাবু ?

তারও প্রায় ঘণ্টা দেড়েক-দুয়েক পরে বাড়ি ফিরেছেন—

হুঁ। তা নির্মলবাবু তখন ছিলেন ?

ছিলেন কিনা জানি না, কারণ নির্মলবাবু সেরাত্রে কখন যান আমি জানি না —টের পাইনি, ঘুমিয়ে ছিলাম। দাদাবাবুর ডাকে ঘুম ভাঙে—

কিরীটী যেন কতকটা স্বগতোক্তির মতই বলে, তাহলে দেখা যাচ্ছে রাত সাতটা থেকে আটটার মধ্যে কোন এক সময়েই তপনবাবু এসেছিলেন এ বাড়িতে। এখন কথা হচ্ছে তিনি কখন চলে গেলেন? সে যা বলেছে সেই সময়েই, না আরও পরে—সুধীবাবু আসার পরে?

কি বলছেন কিরীটীবাবু? সুধীরঞ্জন প্রশ্ন করল।

ভাবছি নির্মলবাবু আপনার আসার আগেই চলে গিয়েছিলেন সেরাত্রে, না আপনি আসার পরে? আগে যদি গিয়ে থাকেন তো কে সদর দরজাটা সেরাত্রে বন্ধ করেছিল? একমাত্র হতে পারে প্রমীলা দেবীই, আর তা যদি না হয়ে থাকে তো ঠিক আছে—বামাচরণ, তুমি যেতে পার!

বামাচরণ চলে গেল।

কিরীটীও সেরাত্রের মত বিদায় নিল।

।। ছয় ।।

সেই রাত্রেই আহারাদির পর বাইরের ঘরে পাইপ টানতে টানতে অন্যমনস্ক হয়ে একটা সোফায় বসে কিরীটী, আর তার মুখোমুখি অন্য সোফাটায় বসে কৃষ্ণা।

কৃষ্ণাই একসময় প্রশ্ন করে, তখন থেকে কি এত ভাবছ?

ভাবছি কৃষ্ণা, সেদিন নির্মল ও তপন কেন এসেছিল প্রমীলার ওখানে!

হয়ত ভালবাসার টানে—

ভালবাসার টানে কথাটা যে আমার মনে হয়নি কৃষ্ণা তা নয়, কিন্তু তাতে করে ব্যাপারটা বেশ একটু জটিল হয়ে দাঁড়ায়—

ভালবাসার ব্যাপারটা যে অনেক সময় সত্যিই জটিল হয়, তা তো তুমি জান।

জানি, কিন্তু এক্ষেত্রে তাহলে ত্রিকোণ টানা-পোড়েন—তপনজ্যোতি, নির্মলচন্দ্র ও শিবেন্দ্রকুমার—তিনজনেই মনে হচ্ছে তাহলে ভালবাসত প্রিয়বাবুর দিদিটিকে! নচেৎ অত রাত্রে যাতায়াত সম্ভব নয়।

শিবেনবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

না। আর একটা কথা ভাবছি—

কি?

আচ্ছা নির্মলবাবুকে ফোন করে বললে কেমন হয় যে, তাঁরা তিন বন্ধু যেন কাল সন্ধ্যার পর আমার এখানে আসার ব্যবস্থা করে—তাতে করে আলোচনাটা সামনাসামনিই হতে পারে, তিন বন্ধুর উপস্থিতিতেই—

একটা ফয়সালা করতে চাও?

না, না—ফয়সালা না হলেও কিছু আলোকসম্পাতও তো ব্যাপারটার উপরে

হতে পারে !

বেশ তো, চেষ্টা করে দেখো। কিন্তু সত্যিই কি মনে করছ ওদের তিনজনের মধ্যেই কেউ একজন প্রমীলার হত্যাকারী ?

এতটা এই মুহূর্তে না ভাবলেও ওরা তিনজন আমার মনের মাঝখানে যেন সর্বক্ষণ ঘোরাফেরা করছে। তা ছাড়া কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ কারণে প্রিয়বাবুর দিদিকে হয়ত প্রাণটা দিতে হয়েছে—

যাক গে, রাত অনেক হয়েছে—এবারে শোবে চল। কৃষ্ণা বললে।

তুমি যাও, আমি আসছি।

কৃষ্ণা আর দাঁড়াল না।

কিরীটী একটু পরে উঠে এসে খোলা জানলাটার সামনে দাঁড়াল।

প্রমীলাকে যে-ই হত্যা করে থাকুক বিষপ্রয়োগে, হত্যার কোন বিশেষ কারণ সে সত্যিই খুঁজে পাচ্ছে না। প্রমীলা সম্পর্কে যতটুকু জানা গিয়েছে, মেয়েটি হাসিখুশি ও যাকে বলে আনন্দময়ী ছিল।

যদি ঐ তিনজনের কারও সঙ্গে ভালবাসায় পড়েই থাকে বা ওরা তিনজনই যদি ঐ মেয়েটিকে ভালবেসে থাকে, তার মধ্যে নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক কিছু নেই।

তা ছাড়া নির্মলের সঙ্গে দেখাও হয়েছে, আর কথাও হয়েছে, কিন্তু তার কথাবার্তা থেকে এমন কিছু পাওয়া যায়নি যাতে তার থেকে প্রমাণ হতে পারে যে নির্মল প্রমীলাকে ভালবাসত, অবিশ্যি কিরীটীও সে ধরনের প্রশ্ন তাকে করেনি।

কাল যদি ওদের তিনজনকে একত্রে পাওয়া যায় তো কৌশলে সে কথাটা জানবার চেষ্টা করতে পারে।

কিন্তু তা কি সম্ভব হবে ?

নির্মলের কথায় ওরা কি এখানে আসবে ?

তার চাইতে নির্মলের কাছ থেকে তপন ও শিবেনের ঠিকানা যোগাড় করে কাল সকালে তাদের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে দেখা করাই বোধ হয় যুক্তি-সঙ্গত হবে।

।। সাত ।।

নির্মলের কাছ থেকে পরের দিন ঠিকানা সংগ্রহ করে নিল কিরীটী সকালেই ফোন করে।

একজন থাকে দেওদার স্ট্রীটে। অন্যজন তালতলায়।

প্রথমে কিরীটী সকাল নটা নাগাদ তপনের ওখানেই গেল দেওদার স্ট্রীটে। একটা পাঁচতলা ফ্ল্যাটবাড়ির দোতলার একটা ফ্ল্যাট। তপন তার মামা-মামীর কাছে থেকে পড়াশুনা করে। বরাবর ব্রিলিয়াণ্ট রেজাল্ট।

বি. এস-সি তে ফার্স্টক্লাস সেকেণ্ড হয়েছিল এবং শুধু পড়াশুনাতেই নয়—

খেলাধুলাতেও সে একজন চৌকস। নির্মলের কাছ থেকেই তার বন্ধু তপনের মোটামুটি পরিচয় পেয়েছিল কিরীটী।

তখন বাড়িতেই ছিল এবং কলিং বেলের শব্দে সে-ই দরজা খুলে দেয়।

আপনি কাকে চান?

তপনবাবুকে। কিরীটী বললে।

আমারই নাম তপন চ্যাটার্জী। কিন্তু আপনাকে চিনতে না পারলেও মনে হচ্ছে চেনা-চেনা—

সে হতে পারে, আমার ছবি দেখেছেন তাই—কিরীটী মৃদু হেসে বললে।

ছবি?

আমার নাম কিরীটী রায়।

কি আশ্চর্য, নমস্কার! আসুন আসুন, কি সৌভাগ্য আমার! আসুন, ভিতরে আসুন—বলতে বলতে দরজার কপাট দুটো একেবারে টান-টান করে খুলে দিয়ে সাদর আহ্বান জানাল।

কিরীটী দেখছিল তপনজ্যোতিকে। তেইশ-চব্বিশের মধ্যে বয়েস হবে। নির্মল তার পরিচয় দিতে সামান্য অত্যুক্তিও করেনি। লম্বায় খুব বেশী না হলেও তার সুগঠিত পেশল দেহ সত্যিই যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রথম দর্শনেই। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম। মাথায় কোঁকড়ানো চুল, কিছুটা এলোমেলো। যেমন সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত বড় বড় দুটি চোখ, তেমনি ললাট ও দৃঢ়বদ্ধ চিবুক। চোখে কালো মোটা সেলুলয়েড ফ্রেমের চশমা।

পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি। ঘরটা বোধ হয় ড্রয়িংরুম হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। সোফা সেট পাতা। এক কোণে একটা রেডিওগ্রাম—রেডিওতে তখন কার যেন সেতারবাদন চলছিল।

আসুন, বসুন মিঃ রায়। আমার মামীমা থাকলে আপনাকে দেখে খুব খুশী হতেন। কিন্তু আজ শনিবার—মামীমা কালীঘাটে পুজো দিতে গেছেন। আনন্দে অনর্গল কথা বলে যায় তপন।

কিরীটী একটা সোফায় উপবেশন করার পর তপনজ্যোতি বললে, তারপর বলুন তো, হঠাৎ আমার কাছে কেন মিঃ রায়?

কিছু খবরাখবর নেওয়ার জন্যই আপনার কাছে এসেছি তপনবাবু। কিরীটী বললে।

খবরাখবর! কি ব্যাপার?

আপনার সহপাঠিনী ও দীর্ঘদিনের পরিচিত প্রমীলা দেবী—

প্রমীলা! সে—সে তো সুইসাইড করেছে!

হ্যাঁ। তাঁর মৃত্যুর সংবাদটা আমার অজানা নয়।

চোখেমুখে খানিকটা বিস্ময় ও উদ্বেগ নিয়ে তখন চেয়ে আছে তপন কিরীটীর মুখের দিকে।

কিরীটী বললে, আপনি বোধ হয় এখনও জানেন না তপনবাবু, প্রমীলার

মৃত্যুর ব্যাপারটা পুলিস ঠিক আত্মহত্যা বলে মনে করছে না—

তবে কি ?

তাঁকে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে।

হত্যা !

হ্যাঁ, তাঁকে খুন করা হয়েছে।

কিন্তু তা কি করে হবে ? কে তাকে হত্যা করবে ?

সেই ব্যাপারের অনুসন্ধানের জন্যই আপনার কাছে আমি এসেছি—

আমি ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না মিঃ রায় !

বললাম তো আপনাকে এইমাত্র, পুলিসের ধারণা হয়েছে যে প্রমীলা দেবীকে কেউ হত্যা করেছে—

তা যদি হয়ই তো, আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন ?

এসেছি যে আপনি হয়ত প্রমীলার মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে আমাকে কিছু সাহায্য করতে পারেন—

তপনজ্যোতি কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে কিরীটী বললে, প্রথমত আপনি যে কেবল তাঁর সহপাঠীই ছিলেন তাই নয়, আপনাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতাও ছিল। আর দুর্ঘটনার রাত্রে আপনি প্রমীলাদের বাসায় গিয়েছিলেন—

কে বললে সে কথা ?

নির্মলবাবু—আপনাদেরই আর এক সহপাঠী ও বন্ধু !

তপনজ্যোতি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, হ্যাঁ, আমি গিয়েছিলাম সেখানে—

কখন গিয়েছিলেন এবং কখনই বা চলে এসেছিলেন ?

গিয়েছিলাম সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ, আর চলে আসি বোধ করি রাত তখন দশটা হবে।

আপনি যখন চলে আসেন, নির্মলবাবু কি তখনও সেখানে ছিলেন ?

হ্যাঁ, সে ছিল।

আচ্ছা আপনি কি জানতেন যে ঐ সময় প্রমীলার মা-বাবা কলকাতায় ছিলেন না ?

জানতাম। তাঁরা পুরী গিয়েছেন বেড়াতে—

তা হঠাৎ সেরাত্রে প্রমীলাদের ওখানে গিয়েছিলেন কেন ?

প্রমীলাই যেতে বলেছিল আগের দিন—

কেন ?

কতকগুলো অঙ্ক বুঝে নেওয়ার জন্য। নির্মল আর প্রমীলাকে আমি অঙ্ক-গুলো বুঝিয়ে দিয়ে চলে আসি।

আপনাকে সেরাত্রে বামাচরণ দরজা খুলে দিয়েছিল, তাই না ?

হ্যাঁ।

দরজা বন্ধ করেছিল কে, রাত দশটায় যখন আপনি চলে আসেন ?

প্রমীলা। সে-ই নীচে আমাকে পেঁছে দিতে এসেছিল।

আপনি মধ্যে মধ্যে প্রমীলার ওখানে যেতেন—ও'দের বাড়ির সকলের কাছে আপনি পরিচিত, না ?

হ্যাঁ, যেতাম মাঝে মাঝে।

আচ্ছা প্রমীলার মৃত্যুসংবাদটা আপনি কার কাছ থেকে পান এবং কখন ?

পরের দিন সকাল সাতটা নাগাদ নির্মল আমাকে ফোন করে কথাটা জানায়। বলে, প্রমীলা সুইসাইড করেছে।

আচ্ছা প্রমীলার সঙ্গে আপনার তো বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল ?

সহপাঠী হিসাবে যতটুকু সাধারণত থাকে তার বেশী কিছু নয়—

প্রমীলার আপনার প্রতি মনোভাব কি রকম ছিল ?

বলতে পারব না।

প্রমীলা কাউকে ভালবাসতেন বলে আপনি কিছু জানেন ?

বোধ হয় প্রমীলায় মনে শিবেনের প্রতি কিছুটা দুর্বলতা ছিল। শিবেন প্রমীলাকে ভালবাসত।

নির্মলবাবু ? তাঁর কোন দুর্বলতা ছিল প্রমীলার প্রতি ?

ঠিক জানি না—তবে মনে হয় ছিল।

কিরীটী আবার কি প্রশ্ন করতে উদ্যত হয়েছিল কিন্তু করা হল না, কলিং বেলের শব্দ শোনা গেল।

তপনজ্যোতি এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের যুবক ঘরে এসে ঢুকল।

দেখ তপন—, যুবকটি থেমে গেল হঠাৎ ঘরে কিরীটীকে দেখে।

কিরীটী তাকিয়েছিল আগন্তুকের মুখের দিকে।

রোগা পাতলা চেহারা। লম্বায় প্রায় ছয় ফুটের কাছাকাছি। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল এলোমেলো। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, পায়ে চপ্পল। গাত্রবর্ণ কালোই বলা চলে। কালো হলেও বেশ সুশ্রী।

শিবেন, তুই এসেছিস ভালই হয়েছে। আয় আলাপ করিয়ে দিই—ইনি সত্যসন্ধানী কিরীটী রায়, আর কিরীটীবাবু, আমাদের একটু আগে যার কথা হচ্ছিল এই সেই শিবেন নন্দী।

ওরা পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার করে।

তার পরই আবার তপন বললে শিবেন, উনি কি বলছেন জানিস ?

কি ?

প্রমীলা নাকি সুইসাইড করেনি, কেউ তাকে বিষ দিয়ে হত্যা করেছে!

প্রমীলাকে হত্যা করা হয়েছে বিষ দিয়ে ? কি বলছিস তুই ? না না, it is absurd!

না না, শিবেনবাবু, কিরীটী বললে, it's a fact—

কিন্তু কেন—কেন তাকে কেউ হত্যা করতে যাবে? শিবেন বললে।

সে প্রশ্নে আমরা পরে আসছি শিবেনবাবু, তার আগে আপনি যদি আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেন।

কি প্রশ্ন?

আপনি ভালবাসতেন প্রমীলাকে?

প্রমীলাকে আমি ভালবাসতাম। হঠাৎ ঐ conclusion-এ আপনি এলেন কি করে? না কেউ এ কথাটা বলেছে?

ভালবাসতেন না?

না, কোন দিনও না।

আপনার কোনরকম দুর্বলতা তাঁর প্রতি ছিল না?

না।

আর প্রমীলার?

না, তার যদি কোন দুর্বলতা ছিল তো সেটা বোধ হয় ঐ তপনের পরেই—

কি বলছিস তুই শিবেন! আমার প্রতি তার কোন দুর্বলতাই কোনদিন ছিল না, বরং তোরই প্রতি তার দুর্বলতা ছিল—

বাজে বকিস না তপন—

আর তুই অস্বীকার যতই কর, তোরও দুর্বলতা ছিল তার প্রতি। তুই মনে মনে তাকে ভালবাসতিস।

Don't talk nonsense! ওর মত একটা ফ্লার্ট টাইপের মেয়েকে কোন্ দুঃখে আমি ভালবাসতে যাব? চঞ্চল অস্থিরচিত্তের একটা মেয়ে—, শেষের দিকে শিবেনের কণ্ঠ হতে যেন কিছুটা আক্রোশ ঝরে পড়ে।

শিবেনবাবু! হঠাৎ কিরীটীর ডাকে দুই বন্ধুই ওর দিকে তাকাল। কিরীটী বললে, আচ্ছা সেদিন আপনিই তো ফোন করে নির্মলবাবুকে সংবাদ দেন?

ঠিক উল্টো—it was নির্মল, সে-ই আমাকে ফোনে সংবাদটা দেয় প্রথমে!

কিন্তু নির্মলবাবু দেননি, আমি জানি। কিরীটী শান্ত গলায় বললে।

নির্মল এখন যতই অস্বীকার করুক, I know—তার গলা আমার যথেষ্ট চেনা—it was নির্মল। মাত্র দুখানা বাড়ির পরেই থাকে প্রমীলাদের—তাছাড়া পরে এও জেনেছি, সেরাত্রে নির্মল প্রমীলাদের ওখানে অনেকক্ষণ ছিল, তাই না তপন?

তপন মৃদু গলায় বললে, হ্যাঁ।

আপনিও তো গিয়েছিলেন সেরাত্রে প্রমীলার ওখানে! হঠাৎ কিরীটী বললে।

কে বলেছে? গত এক মাস তার ওখানে আমি যাইনি! শিবেন বললে।

যাননি?

না।

শিবেনবাবু, কাল একবার সন্ধ্যার দিকে আমার বাসায় আসবেন?

কেন?

আসুন না। কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে।

বেশ, যাব। আচ্ছা চলি রে তপন।

শিবেন বের হয়ে গেল যেন অনেকটা তাড়াহুড়া করেই।

।। আট ।।

প্রমীলার ঘরটা তালা দেওয়াই ছিল। প্রমীলার মৃত্যুর পর সুধীরঞ্জনই ঘরের দরজায় একটা তালা লাগিয়ে দিয়েছিল। বাড়ির কেউই অবিশ্যি ঘরটার মধ্যে ঢুকত না একমাত্র প্রিয়রঞ্জন ছাড়া। সে প্রায়ই ঐ ঘরটার মধ্যে ঢুকে চুপচাপ ভূতের মত বসে থাকত। প্রিয়রঞ্জন যে তার দিদিকে কত ভালবাসত, কারোরই তা অজানা ছিল না। তাই বিশেষ করে সুধীরঞ্জন দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছিল।

অফিস থেকে ফিরে সুধীরঞ্জন তার ঘরের মধ্যে বসেছিল, একটু আগে সন্ধ্যা হয়েছে, প্রিয় এসে ঘরে ঢুকল, দাদা!

কি রে?

কিরীটীবাবু দিদির ঘরটা একবার দেখতে চান, চাবিটা দাও।

ড্রয়ার থেকে চাবিটা নিয়ে সুধীরঞ্জন বললে, চল্, খুলে দিচ্ছি।

দরজা খুলে তিনজন ঘরে প্রবেশ করল। ঘরটা অন্ধকার। প্রিয়ই সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জেলে দিল। পুলিস মৃতদেহ নিয়ে যাবার পর আর কেউ এই চারদিনে এ ঘরের কোন কিছুতে হাত দেয়নি। যেখানকার যা ঠিক তেমনিই আছে। কিরীটী একবার ঘরের চারিদিকে তাকাল। একটা সিঙ্গল খাট। বিছানার চাদরটা এলোমেলো হয়ে আছে। মাথার বালিশ দুটোও যথাস্থানে নেই। এক কোণে একটা কাঁচের পাল্লাওয়ালা আলমারি। ছোট একটা ড্রেসিং টেবিল, তার উপরে কিছু সাধারণ প্রসাধনের টুকিটাকি জিনিস। ছোট একটা টুল, আর এক কোণে একটি পড়ার টেবিল। বই-খাতাপত্র চমৎকারভাবে গুছানো। ছোট একটা কাঠের সেল্‌ফ্—বইতে ঠাসা।

টেবিলের উপরের বই ও খাতাপত্রগুলো অনেকক্ষণ ধরে নেড়েচেড়ে উল্টেপাল্টে দেখল কিরীটী। তারপর খাটটার সামনে এসে দাঁড়াল। চোখের উপর যেন ভেসে ওঠে চিত্তপ্রিয়র তোলা ফটোর দৃশ্যটা। মৃতদেহের ভঙ্গিটা।

বিছানার চাদর ও বালিশ-তোষক উল্টে উল্টে দেখল কিরীটী। বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে থেকে একটা ছোট শিশি পাওয়া গেল। শিশির মধ্যে কি একটা সাদামতো সামান্য লেগে আছে। শিশিটা কিরীটী পকেটে রেখে দিল। ব্যাপারটা কিন্তু দুই ভায়ের কারোর চোখে পড়ে না।

প্রিয়বাবু!

প্রিয়রঞ্জন কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

বামাচরণকে একবার ডাকতে পার ?

ডাকছি এখুনি। প্রিয়রঞ্জন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এই যে বামাচরণ। সেরাত্রে তুমি তোমার দিদিমণি ও নির্মলবাবুকে ঠাণ্ডা বেলের পানা দিয়েছিলে, না ?

আজ্ঞে—

তাঁরা দুজনেই বেলের পানা খেয়েছিলেন ?

নির্মলবাবু তখুনি এক চুমুকে খেয়ে গ্লাসটা আমার হাতে ফেরত দিয়েছিলেন।

আর দিদিমণি ?

দিদিমণি খুব ভালবাসত ঠাণ্ডা বেলের পানা—বরফের, অনেকক্ষণ ধরে একটু একটু করে খেত।

সেদিন তুমি তাঁর গ্লাসটা নিয়ে যাওনি ?

আজ্ঞে না।

পুলিস বোধ হয় নিয়ে যায় !

আজ্ঞে না। পরের দিন আমার স্পষ্ট মনে আছে, সকালে এই ঘরে ঢুকে গ্লাসটা আর দেখতে পাইনি।

গ্লাসটা দেখনি ?

না।

আচ্ছা বামাচরণ, সেরাত্রে নির্মলবাবু ও তপনবাবু ছাড়া আর কাউকে এ বাড়িতে আসতে দেখনি বা শোননি !

না, আজ্ঞে।

শিবেনবাবুর গলা তুমি চেনো ?

আজ্ঞে যে তিনজন—ঐ শিবেনবাবু, নির্মলবাবু আর তপনবাবু এখানে আসতেন, তাঁদের প্রত্যেকের গলার শব্দই আমার চেনা—

আচ্ছা এমনও তো হতে পারে বামাচরণ, শিবেনবাবুর গলাটাই তুমি তপনবাবুর গলা বলে ভুল করেছিলে ! তাছাড়া তোমারও তখন জ্বর—মাথায় যন্ত্রণা

আজ্ঞে না, তবে—

কি তবে ?

সেদিন একটা কথা বলতে আপনাকে ভুল হয়ে গিয়েছে, ছোট দাদাবাবুকেও বলিনি—

কি বল তো ?

বড়দাদা ফিরে আসার পর আমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লেও মাথার যন্ত্রণার জন্য ঘুম অ্যাসেনি ভাল তখনও। আমার বেশ মনে হয়েছিল, কেউ দরজা খুলে বের হয়ে গেল। জুতোর শব্দ যেন একটা শুনেছিলাম—

ঠিক বামাচরণ, দরজাটা পরের দিন সকালে সুধীবাবু যে খোলা দেখেছিলেন, সেটা যেন আমি কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না। এখন তোমার

কথা শুনে বুঝতে পারছি, তৃতীয় আরও একজন কেউ সেরাত্রে এসেছিল যে সবার পরে এই বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় কিংবা যারা চলে গিয়েছিল তাদেরই মধ্যে কেউ আবার সেরাত্রে ফিরে এসেছিল—তৃতীয় কেউ হোক বা তাদেরই একজন হোক। সে তাহলে কখন এসেছিল?

কিরীটী কতকটা যেন আত্মগতভাবেই শেষের কথাগুলো বলে।

পরের দিন সন্ধ্যায়। কিরীটীর বাড়ির বসবার ঘরে।

কিরীটী, তপনজ্যোতি, নির্মল, শিবেন, প্রিয়রঞ্জন ও সুধীরঞ্জন। কথা বলছিল কিরীটীই, তপনবাবু, আপনি সেরাত্রে প্রমীলার ওখান থেকে বের হয়ে কোথায় যান?

কেন, আমার বাড়িতে!

কখন পেঁছান বাড়িতে?

রাত এগারটা নাগাদ হবে—

কিসে গিয়েছিলেন, ট্যাক্সিতে না হেঁটে?

হেঁটেই গিয়েছি।

দরজা খুলে দিয়েছিলেন আপনার মামা, রমেনবাবু?

হ্যাঁ।

তিনি কিন্তু অন্যরকম বলেছেন আমার কাছে—

কি বলেছেন?

আপনার সেরাত্রে ফিরতে অনেক দেরি হয়েছিল, রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ আপনি বাড়ি ফিরে যান—

বলেছে মামা ঐ কথা বলেছে!

হ্যাঁ।

বাজে কথা। মামা মিথ্যে বলেছে।

মিথ্যা বলবেন কেন?

কারণ সে চায় না আমি তার ওখানে আর থাকি—

কেন?

আমারই বয়সী তার ছেলেটি লেখাপড়া কিছু শিখল না, কারখানায় সামান্য কাজ করে—আর আমি দুদিন বাদে এম. এস-সি পাস করব, সহ্য করতে পারছে না সে—

কিরীটী মৃদু হাসল। তারপর নির্মলের দিকে তাকিয়ে বললে, নির্মলবাবু, আপনিও আমাকে সেদিন মিথ্যে বলেছেন—

মিথ্যে বলেছি! কি মিথ্যে বলেছি আপনাকে?

মিথ্যে বলেছেন এই যে, হয় সেরাত্রে আপনি চলে যাচ্ছেন বলে আদৌ যাননি তখন—গিয়েছেন সুধীবাবু ফিরে আসবার পর কোন এক সময়—

মোটেই না। আমি তক্ষুনি সোজা বাড়ি চলে যাই।

হুঁ, আপনি তাহলে হলফ করে বলছেন যে সদর দরজাটা আপনি খুলে রেখেই চলে গিয়েছিলেন সেরাত্রে ?

হ্যাঁ। তারপর হয়ত প্রমীলাই স্নান সেরে নীচে এসে দরজা বন্ধ করে দেয় কোন এক সময়।

না, প্রমীলা যে তা দেয়নি সেটা আমিও কিন্তু হলফ করেই বলতে পারি নির্মলবাবু—

তবে হয়ত বামাচরণই—

না, সেও নয়। আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয়, হত্যাকারীই সেরাত্রে আপনার চলে যাবার পর (যদি সত্যিই রাত সাড়ে দশটা নাগাদ আপনি চলে গিয়ে থাকেন) দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল—

হত্যাকারী !

তিন বন্ধুই একসঙ্গে প্রশ্নটা করল।

হ্যাঁ হত্যাকারী। তপনবাবু, শিবেনবাবু ও নির্মলবাবু আপনাদের মধ্যে একজন অন্ততঃ জানেন সেই হত্যাকারী কে !

আমরা একজন জানি ! তপন কথাটা বলে অন্য দুই বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ, জানেন। বলুন, কে ? শুনুন, পুলিস কিন্তু জানতে পেরেছে সে কে—

কে—কে—কে—? তিনজনেরই প্রশ্ন।

শুনুন তাহলে ব্যাপারটা কি হয়েছিল, আমার যা অনুমান এবার আমি বলি। কিরীটী বলতে লাগল, প্রমীলা সেদিন ফিরে আসে বাড়িতে বেলা চারটে নাগাদ। তারপর পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আসেন নির্মলবাবু প্রমীলার ওখানে—এবং সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে আসেন তপনবাবু এই পর্যন্ত সব ঠিক আছে—

কিরীটী একটু থেমে আবার বলতে লাগল, তপনবাবু বলেছেন সেদিন নাকি প্রমীলার ডাকেই তিনি তাঁর ওখানে যান। তাঁকে ও নির্মলবাবুকে কতকগুলো অংক বুঝিয়ে দিতে। এবং অংক বুঝিয়ে দেবার পর রাত দশটায় তিনি চলে আসেন (তপনবাবুর জবানবন্দি), এবং নির্মলবাবু তারও আধঘণ্টা পরে আসেন (নির্মলবাবুর জবানবন্দি)। উভয়ের উক্তি যদি সত্য বলে মেনে নিই, তাহলে ঐ আধঘণ্টা সময় প্রমীলার ঘরের মধ্যে ওঁরা দুজনই অর্থাৎ প্রমীলা ও তপনবাবু ছিলেন। তখনও সুধীবাবু ফেরেননি। কথা হচ্ছে ঐ সময় বামাচরণ যে এক গ্লাস বেলের পানা প্রমীলার জন্য রেখে গিয়েছিল, সেই পানাটা প্রমীলার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল কিনা। অর্থাৎ গ্লাসটা শেষ হয়েছিল কিনা। একমাত্র বলতে পারেন আমাদের নির্মলবাবুই। কি নির্মলবাবু, বেলের পানাটা কি প্রমীলা খেয়ে ফেলেছিল ?

হ্যাঁ, মানে তপন চলে আসার পর কিছুক্ষণ বাদেই বেলের পানাটা শেষ করে সে বাথরুমে যায় স্নান করবার জন্য আর আমি উঠে চলে আসি তাকে বলে—

কিন্তু আমি যদি বলি নির্মলবাবু, আপনি মিথ্যে বলছেন ?

মিথ্যে !

হ্যাঁ মিথ্যে, তখনও গ্লাসটা নিঃশেষ করেনি প্রমীলা, ভেবেছিল হয়ত স্নান করে এসে শেষ করবে—

আমার সামনে সে গ্লাসটা শেষ করেছিল—

নির্মলবাবু, এই শিশিটা চিনতে পারেন ? বলে কিরীটী ছোট একটা শিশি পকেট থেকে বের করে ওদের সামনে তুলে ধরল, এটা প্রমীলার বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে—

কিসের শিশি ওটা ? তপন ও শিবেন শুধাল।

এটার গায়েই কিন্তু হত্যাকারীর আঙুলের ছাপ রয়ে গিয়েছে। এটার মধ্যেই ছিল তীব্র বিষ হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড।

হঠাৎ যেন ঘরের মধ্যে একটা বরফের মতই ঠাণ্ডা স্তব্ধতা।

সবাই যেন বোবা একেবারে।

কিরীটী একটু থেমে শান্ত ঋজু গলায় বললে, এটাই হত্যাকারীকে চিহ্নিত করে দেবে কে সেরাত্রে প্রমীলার বেলের পানার গ্লাসে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল তাকে হত্যা করবার জন্য। শুনুন আপনারা, এই শিশির গায়ের আঙুলের ছাপ ফরেনসিক ডিপার্টমেণ্ট তুলে নিয়েছে যেমন, তেমনি নেওয়া হয়েছে কৌশলে আপনাদের আঙুলের ছাপ এবং কার আঙুলের ছাপের সঙ্গে ঐ শিশির গায়ের আঙুলের ছাপ মিল আছে, জানেন কি আপনারা ?

বোবা। সবাই চুপ।

কিরীটী শান্ত গলায় পূর্ববৎ বললে, শিবেনবাবু, আপনার আঙুলের ছাপ—it was you !

তাই বুঝি ? হেসে ওঠে শিবেন, তা আমি তো সেরাত্রে প্রমীলাদের বাড়ির ধারেকাছেও যাইনি—

গিয়েছেন। আর কখন গিয়েছিলেন জানেন, নির্মলবাবু চলে আসার পরই। সাড়ে দশ ৷ থেকে পৌনে এগারটার মধ্যে কোন এক সময় আপনার পায়ের শব্দ বামাচরণ পেয়েছিল।

চমৎকার ! একবারে টাইম পর্যন্ত আপনি বের করে ফেলেছেন ! তা প্রমীলা তো দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল নির্মল চলে আসার পর, আমি ঢুকলাম কি করে ?

প্রমীলা আদৌ দরজা বন্ধ করেনি। আপনিই দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং পালাবার সময় পাননি, কারণ আপনাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল প্রমীলার বিষপানের পর মৃত্যু পর্যন্ত—

শুনুন শিবেনবাবু, আপনি যে যাবেন তা প্রমীলা জানত না ঠিকই, কিন্তু অত রাত্রে হঠাৎ আপনাকে দেখে সে বরং খুশিই হয়েছিল, যেহেতু একটা ভুল-বোঝাবুঝির জন্য হয়ত আপনাদের উভয়ের মধ্যে মন-কষাকষি চলছিল। অবিশ্যি এটাও আমার অনুমান। আপনি যখন ঘরে গিয়ে ঢোকেন, নির্মলবাবু বের হয়ে যাবার পরই, প্রমীলা সম্ভবতঃ তখন বাথরুমেই ছিল। সেই ফাঁকে আপনি কাজ

সেরে বের হয়ে আসার আগেই প্রমীলা বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে। বেচারী জানতেও পারেনি, তার জন্য তীব্র বিষ গ্লাসের পানীয়ের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে আছে এবং সে বিষ ঢেলে দিয়েছে গ্লাসে তারই দয়িত আপনি। ভুল—মহা ভুল করেছেন আপনি শিবেনবাবু, প্রমীলা ভালবাসত আপনাকেই, নির্মলবাবুকে নয়—

না, না। চিৎকার করে ওঠে হঠাৎ শিবেন, সে নির্মলকেই ভালবাসত।

না, আপনাকে। প্রমীলার মত মেয়েকেও আপনি চিনতে পারলেন না শিবেন-বাবু!

হঠাৎ ঐ মুহূর্তে শিবেন পকেট থেকে কি বের করে মুখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঢলে পড়ে গেল।

কিরীটী তাড়াতাড়ি উঠে ছুটে গেল শিবেনের সামনে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাকে পরীক্ষা করে বললে, সব শেষ। বেচারী!

পরের দিন প্রিয়রঞ্জনের প্রশ্নের উত্তরে কিরীটী বলছিল, প্রথমটায় নির্মলকেই আমি সন্দেহ করেছিলাম প্রিয়বাবু। পরে টেলিফোনের ব্যাপারটা ও শিশিটাই আমাকে হত্যাকারীর দিকে আঙুল তুলে দেখায় এবং ঐ দুটো মারাত্মক ভুল না করলে তাকে ধরাও যেত না এত তাড়াতাড়ি।

ভুল কেন বলছেন কিরীটীবাবু?

ভুলই তো! প্রমীলার মৃত্যু-সংবাদটা প্রথমতঃ সবাই তো জানতে পারত একটু পরে। সাততাড়াতাড়ি তবু শিবেন ফোন করেছিল নির্মলকে—নিজের দিক থেকে একটা আত্মতৃপ্তি পাবার জন্যে, যেহেতু তার ধারণা হয়েছিল প্রমীলা নির্মলকেই ভালবাসে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাপারটাকে একটা আত্মহত্যার ব্যাপার বলে দাঁড় করাবার জন্যে সে যদি শিশিটা বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে না আসত। কেউ কি আত্মহত্যা করতে গিয়ে আত্মহত্যা করবার বিষটা বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে প্রিয়বাবু! সেই কারণেই ঐ শিশির গায়ের ছাপ নেবার আমি ব্যবস্থা করি। ওদের তিনজনের আঙুলের ছাপও কৌশলে সংগ্রহ করে নিই। এবং শিবেনের আঙুলের ছাপের সঙ্গে শিশির গায়ের আঙুলের ছাপটা মিলে যাওয়ায় প্রমাণ করে দিল আমার অনুমান সত্য।

কাজ শেষ করার পর সম্ভবতঃ শিবেন যখন বের হয়ে আসছে, সে সুধীবাবুর জুতোর শব্দ শুনতে পায়। প্রমীলার ঘরের দরজাটা সে আটকে দেয়, কিন্তু তাড়াতাড়ি আলোটা নেভাতে ভুলে যায়। সুধীবাবু তাই প্রমীলার ঘরের দরজা বন্ধ দেখলেও জানলাপথে আলো দেখতে পান এবং সুধীবাবু তাঁর ঘরে ঢুকবার পর নিঃশব্দে শিবেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে দরজা খুলে বের হয়ে যায়। দরজাটা খোলাই থাকে।

কিরীটী থামল।

প্রিয়রঞ্জনের চোখে জল।

ছোরা

॥ এক ॥

কাল রাতে কখন যে বৃষ্টি নেমেছিল সমীর জানে না।

অনেক রাত্রে বোধ হয়।

মাঝরাত্রে একবার ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল, খোলা জানালাটা দিয়ে জোলো ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ছিটে গায়ে এসে লাগতেই বোধ হয় ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল সমীরের।

বুঝতে পেরেছিল বাইরে বৃষ্টি নেমেছে।

নামুক।

উঠে জানালাটা বন্ধ করে দেবে তাও ইচ্ছা হয়নি। খোলা জানালাটা দিয়ে খানিকটা বৃষ্টির ছাট আসবে, বিছানাটা ভিজিয়ে দেবে—তা দিক। বিছানাটার যা অবস্থা হয়েছে তা ভিজেই বা কি শুকনোই বা কি!

ডানলোপিলোর উপরে পুরু মোটা তোশক, তার উপরে মসৃণ বম্বে ডাইংয়ের চাদর তো নয়—ব্যবহারে ব্যবহারে ছিঁড়ে গিয়েছে এখানে ওখানে, গুটলি পাকিয়ে শক্ত যেন ইট হয়ে গিয়েছে তোশকের তুলোগুলো।

তার উপরে ময়লা একটা সুজনি বিছানো।

কেমন যেন একটা ভ্যাপসা সোঁদা গন্ধ বের হয় বিছানাটায় শুলেই।

তবু তো ওরই উপরে পড়ে পড়ে ঘুমোয় সমীর রাতের পর রাত।

শীত-শীত করছিল, শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে হাতের কাছে কিছু না পেয়ে অন্ধকারে ময়লা সুজনিটাই বিছানা থেকে তুলে বেশ করে গা-টা ঢেকে নিয়েছিল।

আঃ, আরাম!

তারপরই দিব্যি ঘুম।

ইউনিয়ন অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে রাত এগারটা বেজে গিয়েছিল।

ঘুমের ব্যাঘাত হয় না বড় একটা সমীরের কখনও।

আর যতটুকু সময় ঘুমানো যায় ততটুকু সময়ই তো চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি। নচেৎ সর্বক্ষণই তো টাকা টাকা আর টাকার চিন্তা।

আজ চার মাস কারখানায় লক আউট চলেছে।

প্রথম কটা দিন বন্ধ গেটের সামনে লাল সালুর উপর নানা স্লোগান লিখে, মধ্যে মধ্যে চিৎকার করে নিজেদের দাবি জানাবার চেষ্টা করত।

তারপর অনশন ধর্মঘট।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি।

মালিকপক্ষ সম্পূর্ণ নির্বিকার।

দরজায় তালা দিয়ে, পুলিস প্রহরী গেটে বসিয়ে, তারা বোধ হয় নিশ্চিন্তে কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে বসে আছে।

তাদের তো আর কোন দুশ্চিন্তা নেই প্রাত্যহিক জীবনযাপনের।

জোরে বৃষ্টি নামতেই সকালের দিকে সমীরের বোধ হয় ঘুমটা পাতলা হয়ে ভাঙো-ভাঙো হয়ে এসেছিল।

ঘুম-ঘুম আর জাগার মধ্যে একটা নিষ্ক্রিয়তা।

শুনতে পাচ্ছে অথচ ঠিক শুনতে যেন পাচ্ছে না।

অবলুপ্তির বাইরে জগৎটা যেন অর্ধসচেতন মনটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কানে এল লতার কণ্ঠস্বর, দাদা, তোর চা!

উঁ—

এই দাদা ওঠ্—চা নে! কি রে, ওঠ্! চা জুড়িয়ে গেল, দাদা, এই—

নাঃ, জ্বালালে! উঠতেই হল সমীরকে।

হাত বাড়াল, দে!

বোনের হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে এক চুমুক দিয়েই মুখটা বিকৃত করে বললে, এ কি চা করেছিস রে! না চিনি, না দুধ—

লতা ভাইয়ের কথার কোন জবাব দেয় না, চলে যাচ্ছিল ঘর থেকে। সমীর ডাকল, এই লতা!

কি? ফিরে দাঁড়াল লতা।

ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাল।

বোনের পরনে একটা তাঁতের শাড়ি। নেহাৎ কম দামের নয় দেখলেই বোঝা যায়। মাথার চুল বিনুনী করা।

চোখে-মুখে এখনও গত সন্ধ্যার প্রসাধনের কিছু কিছু চিহ্ন তাকালেই চোখে পড়ে।

লতা!

কি বলছিস?

পাঁচটা টাকা হবে?

না। লতার কণ্ঠস্বর উদাস নিস্পৃহ।

দে না বাবা, টাকা পেলেই টু-দি-পাই তোর সব দেনা মিটিয়ে দেব—

টাকা নেই।

কেন মিথ্যে কথা বলছিস! তোর আবার টাকা নেই হাতে—শালা আর যেই বিশ্বাস করুক আমি করি না। দে না বাবা পাঁচটা টাকা!

বললাম তো নেই।

বেশ, তবে না হয় গোটা-তিনেক টাকাই দে!

নেই।

দুটো?

না।

দিবি না?

না। যা হাতে আছে তাতে আজ র‍্যাশন আনতে হবে।

লতা আর দাঁড়াল না। ঘর ছেড়ে চলে গেল।

দাঁতে দাঁত চেপে বললে সমীর অস্ফুট কণ্ঠে, শালী—হারামজাদী!

লতা হয়ত বড় ভাইয়ের কথাগুলো শুনতে পায়নি, আর শুনলেও তার কিছু এসে যেত না।

ওসবে লতা অভ্যস্ত।

নেহাৎ বেকায়দায় পড়েছে সমীর।

কারখানা বন্ধ।

একটা পয়সা রোজগার নেই।

মনটা যেন হঠাৎ বেদম খিঁচড়ে যায় সমীরের। শালার সমস্ত দুনিয়াটার উপরে যেন খিঁচড়ে যায়। মনে হয় সব শালাকে যদি খুন করে ফেলা যেত, তবে বোধ হয় দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত আক্রোশের কিছুটা কমতি হত।

শালার কারখানা যে অদূর ভবিষ্যতে খুলবে, তারও কোন ক্ষীণতম আশাও কোথাও দেখতে পাচ্ছে না সমীর।

আর শালার বৃষ্টি দেখ না—ঝরছে তো ঝরছেই!

বালিশের তলা থেকে একটা চার্মিনারের প্যাকেট ও দেশলাইটা বের করল সমীর। গোটাতিনেক সিগারেট বোধ হয় অবশিষ্ট ছিল প্যাকেটটার মধ্যে, চেপটে গিয়েছে।

তারই একটা বের করে ধরাল সমীর।

নেতিয়ে গিয়েছে।

জোরে জোরে টানতে গিয়ে ধোঁয়া তো বেরই হয় না, উল্টে গলাটা তেতো হয়ে যায়।

ইউনিয়নের লিডার দেবেনবাবু তো রোজই লম্বা লম্বা বুলি ঝাড়ছেন। শালার যেমন পোশাকের বাহার তেমনি তেল-চকচকে চেহারা।

শেষ পর্যন্ত সমীর ঐ শালাকেই দেবে ফাঁসিয়ে!

গোবর্ধন, বিলাস আর জামাল ওরা আজকাল ট্রেনের আর বাসের যাত্রীদের পকেট কাটতে শুরু করেছে।

সমীরকেও ওদের দলে ভিড়তে বলেছিল কিন্তু সমীর বলেছে, না বাবা, কাজ নেই, ধরা পড়লে ধোলাই যখন দেবে!

গোবর্ধন খ্যাক্‌খ্যাক্‌ করে হাসতে হাসতে বলেছে, ধরা অমনি পড়লেই হল? আর ধরতে এলে দেব না সঙ্গে সঙ্গে চাকু চালিয়ে?

ড্রেন-পাইপ প্যাণ্টের পকেটে থাকে সব দাই গোবর্ধনের একটা চক্‌চকে ধারালো ছুরি—আর পারবেও ও।

দুর্জয় সাহস যেমন, তেমনি শালা বেপরোয়া।

কথাটা বলতে বলতে প্যাণ্টের পকেট থেকে ছুরিটা বের করে কি এক অদৃশ্য কায়দায় বাঁটের গোড়ায় চাপ দিতেই ছুরির ইস্পাতের ধারালো তীক্ষ্ণ ফলাটা সুড়ুৎ করে যেন বের হয়ে এসেছিল চক্ষের পলকে।

গড়িয়াহাটার মোড়ে একটা আলোঝলমল জুয়েলারী শপের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দুজনে কথা বলছিল।

সমীর কি এক আতংকে যেন এক পা চকিতে পিছিয়ে এসেছিল। বলেছিল, এই শালা, আমাকেই মারবি নাকি?

ধুস শালা! তুই না আমার দোস্ত! দাঁত বের করে হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিল গোবর্ধন। ছুরিটা ততক্ষণে আবার হিপ-পকেটে চালান করে দিয়েছে সে।

বুঝলি সমীর, ঐ চাকুটা না থাকলে আজ শালা আমাকে উপোস দিয়ে থাকতে হত!

তুই কি—

কথাটা শেষ করতে দেয়নি গোবর্ধন, বলেছিল, নিশ্চয়, চার মাস শালা কারখানার ঝাঁপ বন্ধ, উপোস করব নাকি? একা আমি কেন, বিরাট ফিল্ড—বিলাস জামালও নেমে পড়েছে শালা ময়দানে। ও শালা লাল শালুর ঝাণ্ডা আর ব্যানার দেখিয়ে কিছু হবে না। শুধু গলাবাজি আর সময় নষ্ট!

কিন্তু এসব কি ভাল হচ্ছে গোবর্ধন?

দেখ্ বাবা, আর লেকচার ঝাড়িস্ না। ওসব লেকচার অনেক শুনেছি। তবে হ্যাঁ, যাই বইকি—ফাঁকতালে একবার ওদিকে যাই, বারকয়েক চেঁচিয়ে আসি—মানতে হবে, আমাদের দাবি মানতে হবে! পরশু সন্ধ্যায় এক দিদিমণিকে চাকু দেখিয়ে তার বিরাট ওয়াচটা—বলতে বলতে হ্যা-হ্যা করে হাসতে থাকে গোবর্ধন।

চল্ চল্—চা খাবি?

চা?

হ্যাঁ, চল না নিরালা রেস্টুরেণ্টে, দিব্বি মাংসের দোপেঁয়াজী বানায় শালারা—।

তুই খাওয়াবি?

হ্যাঁ—হ্যাঁ, চল্।

পেটে সেই সকাল থেকে এক কাপ চায়ের বেশী কিছু পড়েনি সমীরের। গোবর্ধনের সঙ্গে গিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকেছিল।

পেট ভরে খেয়েছিল।

পয়সা দেবার সময় সমীর দেখেছিল ওর পকেটভর্তি টাকা—নোট খুচরা পয়সা!

কথাগুলো তেতো গলায় ভাবতে ভাবতেই একসময় শরীরটা সমীরের যেন কেমন গরম হয়ে ওঠে।

॥ দুই ॥

সমীর বিছানার ময়লা তোশকটা উল্টে একটা ছুরি বের করে।

ছুরিটা ও একদিন কলেজের স্পোর্টসে ফোর-ফরটিতে প্রথম হয়ে পুরস্কার

পেয়েছিল।

আলমারিতেই তোলা ছিল।

গত পরশু এটাকে বের করে নিয়েছে।

ঐ পথই ও নেবে।

বাঁচতে তো হবে।

কেন মরবে? কেন মরবে ও না খেয়ে?

ওর বাপ সজনীকান্ত একটা কারখানার হেড অফিসে চাকরি করত, স্ট্রোকে একটা অঙ্গ প্যারালিসিস্ হওয়ায় চাকরি থেকে অবসর নিতে বাধ্য হয়।

সংসারে পাঁচ-সাতটি প্রাণী।

আর বোন লতাই সবার বড়।

কাজেই বাধ্য হয়ে সংসারের কথা ভেবে হাল ধরতে হয়েছিল ওকে।

ফার্স্ট ইয়ারে সায়েন্স পড়ছিল। থ্রি-ইয়ার্স ডিগ্রী কোর্স—বি. এস-সি পড়া ছেড়ে দিল সমীর।

মাস-দুই তারপর ঘুরতে ঘুরতে সিং অ্যান্ড কোম্পানীর কারখানার চাকরিটা পেয়েছিল খিদিরপুরে।

তাও তার বাপ ঐ কারখানায় হেড্ অফিসে চাকরি করত একসময় বলে।

বলবীর সিং ম্যানেজিং ডাইরেকটার দয়াপরবশ হয়ে তাঁর কারখানায় চাকরিটা দিয়েছিলেন।

দুটো বছর চলছিল একরকম।

তারপর হঠাৎ এই দশ দফা দাবিতে স্ট্রাইক। শেষ পর্যন্ত এক মাসের মাথায় লক আউট।

ভাগ্যে লতাটা ছিল!

ঐ এখন সংসারটা চালায়।

ওর তো কেবল সকাল থেকে রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত টো টো করে ঘুরে বেড়ানো।

কোন দিন জুটলে খায়—কোন দিন না জুটলে খায় না।

কিন্তু ঐ লতা!

লতা যে কি ভাবে রোজগার করে সংসারটা চালাচ্ছে সমীর কি জানে?

সব জানে ও, সব বোঝে।

বিকেল হলেই সেজেগুজে হ্যান্ডব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে বের হয়ে পড়ে।

বলে, চাকরি করতে যায়।

লতাও স্কুলের পাট চুকিয়ে দিয়েছে।

নচেৎ ওরও সামনের বার হায়ার সেকেন্ডারি দেবার কথা।

প্রথম প্রথম সমীর ভেবেছে, সত্যিই হয়ত সন্ধ্যার দিকে কোথাও পার্ট-টাইম একটা চাকরি যোগাড় করে নিয়েছে।

মেয়েছেলে তো, পেয়ে গিয়েছে একটা চাকরি।

তারপরই এক সন্ধ্যারাত্রে—

ধর্মতলার মোড়ে একটা দোকানের সামনে একটা লাইট-পোস্টের নীচে লতাকে এক সুটপরিহিত সুবেশধারী ভদ্রলোকের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে দেখে সমীর যেন একটু চমকে উঠেছিল।

লতা ও কার সঙ্গে কথা বলছে?

হাবভাব দুজনেরই যেন কেমন কেমন!

একটু পরেই একটা চলতি ট্যাক্সিকে দাঁড় করিয়ে দুজনে উঠে বসল।

ট্যাক্সিটা ধাঁ করে চলে গেল।

দিন-দুই পরে সকালে চা দিতে এলে সমীর শুধিয়েছিল, লোকটা কে রে লতা?

লোকটা! কোন্ লোকটা?

ঐ যে যার সঙ্গে সেদিন তুই রাত সাতটা নাগাদ ধর্মতলার দিকে কথা বলতে বলতে একটা ট্যাক্সিতে চেপে দুজনে পশ্চিম দিকে চলে গেলি?

যাঃ, কি দেখতে কি দেখেছিস—কাকে না কাকে দেখেছিস! কথাগুলো লতা নেহাৎ তরল পরিহাসের সঙ্গে বললেও সমীরের মনে হয়েছিল লতার গলার স্বরটা যেন কাঁপছে।

কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত, মিনমিনে।

লতা তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

সমীরের মনে কিন্তু খটকা লেগেছিল একটা।

পর পর দুটো দিন তারপর সন্ধ্যার পর বাড়ির আশেপাশে ঘাপটি মেরে থেকে ও বেরুলেই ছায়ার মত ওকে অনুসরণ করেছে।

বুঝতে সমীরের বাকি থাকেনি অতঃপর, লতা কোথায় কি চাকরি করে!

কোথা থেকে টাকা আসছে!

কেমন করে ইদানীং সংসারটা চলেছে!

নিরুপায় একটা আক্রোশে দুটো দিন নিজের ভেতরেই যেন ছটফট করেছে সমীর, তারপর একসময় ধীরে ধীরে—আশ্চর্য, মনটা কেমন যেন শান্ত হয়ে এসেছে।

আক্রোশটা নিভে গিয়েছে।

তবু তো ও চালাচ্ছে!

সংসারটা চলেছে আজও!

ক্ষুধার সময় দুটি ভাত মুখে ওঠে—

আর সব চাইতে বড় কথা, আজকের দিনে রোয়াবী করে শালা লাভ কি!

কিসের শালা প্রেসটিজ্ আর ক্যারেকটার!

সমীর যেন কতকটা নিশ্চিন্তও বোধ করেছে।

কিন্তু আজ যেন সমীরের এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে—

ও একটা গদভ, নিরেট বুদ্ধু!

এভাবে চার-চারটে মাস শালা হাত-পা গুটিয়ে থাকার কোন মানে হয়?

তলে তলে চাকরির চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু দেখেছে ছোটখাটো বড়সড় অনেক

কারখানাতেই শ্রমিক-অসন্তোষ।

স্ট্রাইক—লাগাতার ধর্মঘট।

দেখেছে ওর মত শালা হাজারে হাজারে বেকার সর্বত্র এই শহরে।

এক-একবার ভেবেছে, হল কি এ শালা কলকাতা শহরের!

হয় লাগাতার ধর্মঘট, নয় লক-আউট!

আবার কোন কোন কারখানা এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে অন্যত্র গিয়ে দিব্যি নাকি ব্যবসা জাঁকিয়ে বসেছে।

কলকাতা থেকে জামসেদপুর, চাইবাসা, পাটনা গিয়েও চাকরির চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেখানে বাঙালী শুনেই তারা মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

শালারা সব সাপের পাঁচ পা দেখেছে যেন!

বাঙালীকে হেনস্থা করে।

আরে শালা, এই বাঙালীই একদিন কি না করেছে?

বাবার মুখেই তো ছোটবেলা শুনেছে কতবার, What Bengal thinks to-day, whole of India thinks it to-morrow!

আচ্ছা শালা—

বাঙালীকে চেন না!

দেখিয়ে দেবে আবার একদিন!

সমীর আর একটা সিগারেট ধরাল।

বাইরে বৃষ্টি থামার নামগন্ধও নেই যেন।

ঝরছে তো ঝরছেই।

কি বিশ্রী তেতো হয়ে গেছে গলাটা!

সেই বিশ্রী আক্রোশটা সব কিছুর প্রতি। দেহের শিরায় শিরায় বইতে শুরু করেছে।

হাত-পাগুলো নিশপিশ করছে।

জামাটা গায়ে চড়িয়ে নিল সমীর।

কি গন্ধ ঘামের বেরুচ্ছে যে বাবা জামাটা থেকে!

একটা শার্টের দরকার।

একটা প্যাণ্টের।

একজোড়া চপ্পলেরও।

মাথার চুল যে কতদিন কাটা হয়নি!

শালা দাড়িটাও বেড়ে যেত—ভাগ্যে বাবার ক্ষুরটা ছিল, গালে হাত বুলালো সমীর।

খোঁচা খোঁচা দাড়ি মনে করিয়ে দিল দুদিন গালে ক্ষুর পড়েনি।

আজ একবার সেভ্ করতে হবে।

এই বিল্লী—বিল্লী!

হাঁক দিল সমীর।

ছোট বোন বিল্লী এসে ঘরে ঢুকল।

আমায় ডাকছিলে দাদাভাই ?

বিল্লীর গায়ে একটা নতুন ফ্রক।

চেয়ে থাকে জামাটার দিকে সমীর।

এ ফ্রকটা কোথায় পেলি রে বিল্লী ?

কাল দিদিভাই কিনে এনেছে।

লতা দিয়েছে ?

হ্যাঁ। মার শাড়ি, বাবার ধুতি, আমার ফ্রক, নান্টুর প্যান্ট-শার্ট।

সমীর শোনে বিল্লীর কথাগুলো।

কোন জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে।

লতার রোজগার তাহলে আজকাল ভালই !

আমাকে ডাকছিলে কেন দাদাভাই ?

বাবার ক্ষুরটা নিয়ে আয় তো !

বিল্লী চলে গেল।

একটু পরে ক্ষুরটা এনে দিল।

দাদাভাই !

কি রে ?

মা বললে, এখন বের হয়ো না—

কেন ?

বাজারে যেতে হবে, আর র‍্যাশন আনতে হবে।

পারব না, যা এখান থেকে।

॥ তিন ॥

বিল্লী থতমত খেয়ে পালিয়ে গেল।

জল দিয়ে দাড়িটা ভিজিয়ে ক্ষুর টানতে গিয়ে তিন-চার জায়গায় গালটা কেটে গেল। রক্ত পড়ে। জ্বালা করে।

সমীর যেন ভ্রূক্ষেপও করে না।

ঠিক করে ফেলে মনে মনে সমীর, ঐ গোবর্ধন বিলাস আর জামালের পথই নেবে।

গোবর্ধন বলেছিল, বুঝলি রে—ইজি মানি—

কোনদিন ধরা পড়লে তখন শালা বুঝবি !

যা রে—গোবর্ধন শিকদারকে ধরবে এমন শালা এখনও মায়ের গর্ভে !

পুলিস ?

ছোঃ ! ও শালাদের প্রাণের ভয় নেই ? তাছাড়া—

তাছাড়া ?

না, বলব না। ওসব টপ সিক্রেট্ এ লাইনের। শালা লাইনে আয়—সব জানতে পারবি।

সেই ভাল। ওদের লাইনই ধরবে সমীর।

এভাবে শালা বেঁচে থাকা ?

ধুস্ ! এর নাম বেঁচে থাকা ?

সমীর বৃষ্টির মধ্যেই বের হয়ে পড়ল।

গড়িয়াহাটার মোড়ে পেঁছে একটা চায়ের দোকান থেকে পকেটের শেষ আধুলিটা ভাঙিয়ে এক কাপ চা খেল।

গোটা-দুই সিগারেট কিনল মোড়ের পানের দোকান থেকে।

গোবর্ধন বলেছিল, ব্যাপারটা সব চাইতে সুবিধা ট্রেনে, ট্রামে, বাসে ভিড়ের সময়টায়।

অফিস-টাইম। ভিড় বাড়ছে।

অফিসের বাবুদের ভিড় বাড়ছে।

উঠে পড়ল তড়াক করে একটা ডালহাউসি-গামী বাসে ভিড় ঠেলে কোনমতে সমীর। বুকটার মধ্যে কিন্তু ধড়াস ধড়াস করে।

গলাটা তেতো হয়ে শুকিয়ে ওঠে।

পারল না—সুবিধে করতে পারল না।

নেমে পড়ল জগুবাবুর বাজারের কাছে।

অন্য একটা বাস ধরল।

লাকটা ভাল বলতে হবে—

একটা ব্যাগ হাতিয়ে চৌরঙ্গীর কাছে চলন্ত বাস থেকে নেমে পড়ল সমীর লাফ দিয়ে।

বুকটার মধ্যে তখনও ধড়াস ধড়াস করছে।

সোজা এ-রাস্তা ও-রাস্তা দিয়ে একেবারে হাঁটতে হাঁটতে হরিশ পার্কে গিয়ে ঢুকল।

একটা বেঞ্চির উপর বসে ব্যাগটা খুলল।

খুচরো নোটে মিলিয়ে মাত্র বারোটা টাকা !

তা হোক। এই আজ সমীরের কাছে রাজার ঐশ্বর্য।

একটা পয়সা ছিল না পকেটে—বারো-বারোটা টাকা !

ব্যাগটা একটা ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

আঃ, এখন অনেকটা হাল্কা বোধ হচ্ছে।

শালা এমন কি কঠিন কাজ !

সত্যিই ইজি মানি !

শালা ইডিয়ট ও, এতকাল বনের মোষ তাড়িয়েছে আর নিজের হাত নিজে কামড়েছে। পেটে যেন শালা ইঁদুরে ডন দিচ্ছে।

হাজরার মোড়ে একটা রেস্তোরাঁতে ঢুকে পেটভরে খেল। প্রায় পাঁচ টাকা।

এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট কিনল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে এগুতে লাগল।

বসুশ্রীর বিরাট ব্যানারটা চোখে পড়ল।

গ্যামলার।

দেবানন্দ।

বিরাট্ লাইন পড়েছে।

লাইনে গিয়ে দাঁড়াল সমীর।

ম্যাটিনি শোতে সিনেমা দেখে যখন হল থেকে বেরুল, চারিদিকে আলো জ্বলে উঠেছে।

আঃ!

কলকাতা শহরটা আজ বেশ লাগছে!

আলো, রঙ-বেরঙের মানুষজন আর মেয়েগুলোর কি বাহারি বেশভূষা!

বুক ভরে যেন নিঃশ্বাস নেয় সমীর।

শালা, এ না হলে লাইফ্!

গোবর্ধনদের কারও সঙ্গে দেখা হলে বেশ হত।

দিন পনেরোর মধ্যেই সমীর বেশ পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে।

গায়ে নতুন টেরিলিনের হাওয়াই-শার্ট, নর্দমা-প্যান্ট, পায়ে নতুন চপ্পল। পকেটে কাঁচির প্যাকেট।

অর্ধেক গাল পর্যন্ত জুলপি।

পকেটে সেই ছুরিটা।

পথ চলতে চলতে মধ্যে মধ্যে ছুরিটা হাত দিয়ে চেপে ধরে, আর আপন মনেই নিঃশব্দে হাসে দাঁত বের করে।

মা রাধারাণী একদিন বললেন, কি রে, কিছু চাকরি-বাকরি পেয়েছিস?

তবে! চিরকালটা শালা বসে থাকব নাকি?

বলতে বলতে পকেট থেকে ত্রিশটা টাকা বের করে মাকে দিয়েছিল।

মা ভারি খুশী।

মুখভরা হাসি।

লতাকেও আজকাল যেন সমীরের ভারি ভাল লাগে।

শালা দুনিয়াটাই যেন বদলে গিয়েছে!

উঃ, কি ইডিয়টই ছিল সমীর!

সেদিন সারাটা সকাল ও দুপুরে ঘুরে ঘুরে বাসে-ট্রামে মাত্র দশটা টাকা রোজগার হয়েছে।

মন-মেজাজ খিঁচড়ে যায় সমীরের।

হঠাৎ এক সময় মনে হল, শালা সন্ধ্যার অন্ধকারে ময়দানে একটা ট্রায়াল

দিলে কেমন হয় ?

বাবুরা সব মেয়েমানুষ নিয়ে যখন ফুর্তি করতে আসে ?

নিজের গাড়িতে চেপে, কখনও কখনও ট্যাক্সিতে ?

সমীর চলে গেল ময়দানের দিকে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত।

কটাই বা হবে ? রাত সওয়া আটটা কি বড়জোর সাড়ে আটটা !

দূরে আকাশের বুকে ফুল ফুটিয়ে তুলেছে যেন রাতের নানা রঙের নিওন আলোগুলো।

যেন মরশুমী নানা বর্ণ ফুলের আসর বসেছে।

অন্যমনস্ক ভাবে কিছুটা এগুতেই সহসা সমীরের শিকারী-দৃষ্টিতে নজর পড়ল একটা বেঞ্চের উপরে অন্ধকারে বসা ঝাপ্‌সা দুটো মূর্তি।

সজাগ হয়ে ওঠে মুহূর্তে সমীরের শিকারীর দৃষ্টি। এই রকম নির্জন মাঠে-ময়দানে নির্জন অন্ধকারে ওই ধরনের মিথুনরত মূর্তি আরও এক-আধবার সমীরের এখানে রাতের অন্ধকারে এলে নজরে পড়েছে।

থানার ও. সি. রথীন শিকদার থামলেন।

কিরীটী নিজের বসবার ঘরে একটা আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে পাইপটা মুখে দিয়ে চোখ বুজে শুনছিল শিকদারের বর্ণিত কাহিনী।

বললে, তার পর ?

রথীন বললে, বাড়ির সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যতটুকু জানতে পেরেছি তাই বললাম।

কিরীটী বললে, লতার দাদা সমীর তাদের কিছু বলে নি ?

না।

কিরীটী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, লতার রক্তাক্ত ছোরাবিদ্ধ ডেড্ বডিটা ময়দানেই পেয়েছো, তাই না ?

হ্যাঁ।

সমীর তাহলে বলতে চায়—ঝাপসা-ঝাপসা অন্ধকারেও সে তার বোন লতাকে অন্য এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ময়দানে আলিঙ্গনাবদ্ধ দেখে চিনতে পেরেই কাল এসেছিল শেষ পর্যন্ত ?

হ্যাঁ, তাই সে বলেছে। বোন লতার হত্যার ব্যাপারে সে কিছুই জানে না।

আমার কি মনে হয় জানো রথীন ?

কি ?

ব্যাপারটা খুবই সিম্পল। এবং সমীর যতটুকু বলেছে তাই যথেষ্ট এবং তা থেকেই জানা যায় লতার হত্যাকারী কে !

কে লতার হত্যাকারী ?

তার ভাই সমীরই।

বল কি ?

হ্যাঁ।

কিন্তু কিরীটী, ভাই হয়ে বোনকে অমন নৃশংস ভাবে—

হ্যাঁ, হত্যা করেছে—এবং সেটা সে করেছে লতাকে না চিনতে পেরেই। সমীর মিথ্যে বলেছে যে সে লতাকে চিনতে পেরেছিল সেরাত্রে—

মিথ্যে বলেছে !

হ্যাঁ, হয়ত এমন হয়েছিল—

কি ?

ছোরা দেখিয়ে সেই ভদ্রলোক—যিনি লতাকে নিয়ে মত্ত ছিলেন—তাঁর কাছ থেকে ছিনতাই করবার জন্য সমীর এগিয়ে গিয়েছিল—মাঝখানে লতা বাধা দেয়, অবিশ্যি সবটাই আমার অনুমান, বা এমন ও হতে পারে—লতার হাত থেকে টাকাটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করায় সে বাধা দেয়, তখন সমীর ছোরা বসিয়ে দেয় লতার পেটে। অবশ্যই তাকে চিনতে না পেরে—জেনেশুনে সে বোনকে হত্যা করেনি।

সত্যি বলছো কিরীটী ?

বললাম তো, আমার অনুমান সবটাই। শোনো রথীন, এক কাজ করতে পারো ?

কি ?

সমীরকে একবার আমার কাছে আনতে পারো ?

কেন পারবো না ?

পরের দিনই সমীরকে নিয়ে এসেছিল রথীন কিরীটীর ওখানে।

ঘণ্টা দেড়েক সমীরকে নানা প্রশ্ন করে কিরীটী।

এবং শেষ পর্যন্ত সমীর যা বলেছিল—

ওসব দিকে সমীর বড় একটা দৃষ্টি দেয়নি।

কিন্তু আজ সারাটা দিন ট্রামে-বাসে ঘুরে ঘুরেও তার পকেট খালি, কিছুই রোজগার হয়নি।

কেমন হয় ছোরা দেখিয়ে কিছু ওদের কাছ থেকে আদায় করতে পারলে !

যেমন ভাবা তেমনি কাজ।

সমীর নিঃশব্দে একটা শিকারী বেড়ালের মত ঘাসের উপর পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যায়।

ওদের পশ্চাতে গিয়ে প্রায় কাছকাছি দাঁড়াতেই মূর্তি দুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পর থেকে উঠে দাঁড়াল। ওরা কিন্তু ঠিক ওদের পশ্চাতে দণ্ডায়মান সমীরকে দেখতে পায় না।

ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা অন্ধকারে নজরে পড়ে সমীরের, সুট-পরিহিত একটি ভদ্রলোক প্যাণ্টটা টেনে সোজা করতে থাকে আর একটি মেয়ে তার বেশবাস গুছিয়ে নিচ্ছে।

পকেট থেকে ছোরাটা বের করে নিঃশব্দে সমীর, শক্ত মুঠিতে ধারালো ছোরার বাঁটটা চেপে ধরে।

ভদ্রলোকটি পকেট থেকে কয়েকখানা নোট বার করে মেয়েটির দিকে এগিয়ে দেয়, মেয়েটি হাত বাড়ায়।

সঙ্গে সঙ্গে সমীর তার ছোরাসমেত হাতটা ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে ধরতেই মেয়েটি চকিতে সরে দাঁড়ায় ভদ্রলোকের হাত থেকে নোটগুলো ছিনিয়ে নিয়ে।

সমীর তখন মরীয়া হয়ে উঠেছে যেন। বাঘের মত সে লাফিয়ে পড়ে মেয়েটির উপরে। মেয়েটি ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে পালাবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না, সমীরের হাতের তীক্ষ্ন ধারালো ছোরাটা মেয়েটির তলপেটে ঢুকে যায়।

আঃ—একটা অস্ফুট যন্ত্রণাকাতর চিৎকার করে মেয়েটি টলে পড়ে।

ভদ্রলোকটি ততক্ষণে প্রাণপণে দৌড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছে।

আজ পর্যন্ত এ কাজ করেনি সমীর।

মেয়েটি মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় গোঙাচেছ, তার বাঁ-হাতের নোটগুলো তখনও তার হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা।

নীচু হয়ে নোটগুলো মেয়েটির হাত থেকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করে সমীর। মেয়েটি আর্তনাদ করে ওঠে যন্ত্রণায়, না না, নিও না—নিও না আমার টাকা!

কার—কার গলা?

আঃ, মাগো!

চিনতে পেরেছে—সমীর চিনতে পেরেছে গলার স্বরটা।

সমীর দাঁড়িয়ে গিয়েছে যেন পাথরের মত।

অস্ফুটে তার গলা দিয়ে একটি মাত্রই শব্দ বের হয়ে এল, লতা!

কে? কে? মেয়েটিও যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে ওঠে।

সমীর ধপ করে বসে পড়েছে তখন মেয়েটির পাশে, লতা!

দাদাভাই, তুই?

সমীর লতাকে দু হাতে মাটি থেকে তোলবার চেষ্টা করে।

না না, পালা দাদাভাই।

লতা!

চলে যা—এখান থেকে চলে যা দাদাভাই। এখুনি পুলিস এসে পড়লে—

আমার হাতটা ধর লতা।

না না না—

লতা!

যা—যা, পালা এখান থেকে। আঃ—

অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখতে পায় যেন সমীর, লতার সাদা শাড়িটা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। মুখটা সে মাটিতে ঘষছে।

দূরে কাদের যেন ঐদিকেই আসতে দেখা গেল।

বাঁচবার একটা প্রচণ্ড তাগিদ যেন সমীরকে ধাক্কা দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়।

সমীর ছুটে পালায়।

দৌড়—দৌড় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে সমীর যেদিকে দু চোখ যায়।

আশ্চর্য! দরজাটা খোলাই ছিল, বোধ হয় লতার অপেক্ষাতেই মা দরজাটা খুলে রেখেছিলেন।

সমীর সোজা গিয়ে তার ঘরে ঢুকল।

ঘরের আলোটা জ্বালাতে সাহস হয় না সমীরের।

চুপচাপ শ্বাস রোধ করে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে সমীর।

কে, সমীর এলি? লতা তো এখনও ফেরেনি!

মার গলা।

সঙ্গে সঙ্গে খুট্ করে সুইচের শব্দ। আলোটা জ্বলে উঠল ঘরের।

সমীর—, কিন্তু হঠাৎ যেন মা থেমে গেলেন, এ কি, তোর জামাকাপড়ে এত রক্ত কিসের সমীর?

রক্ত!

হ্যাঁ, সারাগায়ে যে তোর রক্ত—এত রক্ত কোথা থেকে এল? সমীর, কথা বলছিস না কেন?

মা—

কিন্তু আর কোন শব্দ বের হল না সমীরের গলা থেকে। গলাটা যেন আটকে গেল—শ্বাস রুদ্ধ করে ধরল কে তার।

চোখের সামনে একটা রক্তের সমুদ্র যেন। আথালিপাথালি করছে।

রক্ত আর রক্ত!

॥ অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

কিরীটী অমনিবাস